ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি
সমস্যা ও সমাধান

মূল

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

জগদ্বিখ্যাত আলেমে দ্বীন, দাঈ, বহু কালজয়ী গ্রন্থের রচয়ীতা
ভাইস প্রেসিডেন্ট : ইসলামী ফিকহ্ একাডেমী, জেদ্দা, সৌদী আরব
শাইখুল হাদীস ও নায়েবে মুহতামিম : দারুল উলূম, করাচী

অনুবাদ

মুফতী মুহাম্মাদ জাবের হোসাইন

শিক্ষক, জামিআ কারীমিয়া আরাবিয়া, রামপুরা, ঢাকা

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাকতাবাতুল আশরাফ

কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

ফুরাত নদীর তীরে
মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
মূল্য ঃ ৯০.০০ টাকা মাত্র

উহুদ থেকে কাসিয়ুন
মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
মূল্য ঃ ৮০.০০ টাকা মাত্র

হারানো ঐতিহ্যের দেশে
মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
মূল্য ঃ ৯০.০০ টাকা মাত্র

অমুসলিম দেশে মুসলিম পর্যটক
মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
মূল্য ঃ ৯০.০০ টাকা মাত্র

গোনাহ ও তাওবা অভিশাপ ও রহমত
মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
মূল্য ঃ ৭০.০০ টাকা মাত্র

দুনিয়ার ওপারে
মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা মাত্র

জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ
মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
মূল্য ঃ ৪০.০০ টাকা মাত্র

আপন ঘর বাঁচান
মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা মাত্র

প্রকাশকের কথা

জগত বিখ্যাত আলেমে দ্বীন, যাঁর ইলমী ব্যক্তিত্বের ফয়েয ও বরকত হতে সমকালীন পাক ভারত ও বাংলা উপমহাদেশের সচেতন কোন আলেমই বঞ্চিত নয়, বরং সত্যিকথা হলো, সমগ্র দুনিয়ার মুসলিম জাতিই কোন না কোনভাবে তাঁর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। তিনি হলেন হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী (দামাত বারাকাতুহুম)

১৯৯৪ ঈসায়ীর জানুয়ারী মাসে করাচীর দারুল উলূমে অনুষ্ঠিত পনের দিন ব্যাপী اسلام اور جدید معیشت وتجارت (ইসলাম ও আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থব্যবস্থা) শীর্ষক কোর্সে অংশ গ্রহণের পূর্বে হযরতওয়ালা সম্পর্কে আমার ধারনা ছিল তিনি হাদীস ও ফিক্হ সম্পর্কে অভিজ্ঞ একজন ব্যক্তি। কিন্তু উপরোক্ত কোর্সে অংশ গ্রহণ করার পর আমার মনে হলো, ছোট শিশু যেমন তার দুর্বল দৃষ্টির শেষ সীমাকে জমিন ও আসমানের শেষ 'ডডসীমা মনে করে ভাবে- সমগ্র পৃথিবীর পরিধি এতটুকুই। আমিও হযরত সম্পর্কে সেইরূপ সংকীর্ণ ধারনারই শিকার ছিলাম। কোর্স শেষে মনে হলো, আল্লাহপাক ইলমে দ্বীনের সাথে সাথে দুনিয়ায় প্রচলিত সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কেও হযরতকে পূর্ণাঙ্গ ধারনা দান করে সেগুলোর ভেতরে লুকিয়ে থাকা কুফর, শিরক ও ধোঁকা-প্রতারণার মুখোশ উম্মোচন করে তদস্থলে ইসলামের সাম্য ও শান্তির বিধানের উপযুক্ততা প্রমাণ ও তার বাস্তব প্রতিষ্ঠার সংস্কারমূলক খেদমত নেওয়ার ব্যবস্থা হযরতের মাধ্যমে করেছেন। আল্লাহপাক হযরতের ছায়াকে আমাদের উপর দীর্ঘায়িত করুন। আমীন।

ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি একেবারে দৃষ্টিকটুভাবেই ধরা পড়ে। একশ্রেনীর লোক যারা বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শরয়ী বোর্ডের সদস্য, তারা যেন অনেকাংশে সে সকল প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনের মডেল। তাদের দেওয়া দিক নিদের্শনার বাস্তবায়নে পরিচালনা বোর্ড বাধ্য নয়, বিধায় অনেক ক্ষেত্রেই তাদের পরামর্শগুলো ফাইলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে কিন্তু বাস্তবতার মুখ দেখতে সক্ষম হয় না।

অপর একটি শ্রেনী ঢালাওভাবে ইসলামী ব্যাংকসমূহকে অন্যান্য সুদী

ব্যাংকের চেয়েও খারাপ আখ্যা দিয়ে থাকে। অথচ দুটি গ্রুপই বাড়াবাড়ির শিকার। আসল কথা হলো, ইসলামী ব্যাংক ও অর্থসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠানের সকল কর্ম-কাণ্ড যেমন ইসলাম বিরোধী নয় তদ্রূপ তাদের সকল লেন-দেন কাজ-কারবার ইসলাম সম্মতও নয়।

আমাদের বক্ষমান গ্রন্থ "ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতিঃ সমস্যা ও সমাধান" পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকিংয়ের স্বপ্নদ্রষ্টা ও এ যুগের ইসলামী অর্থনীতি ও বাণিজ্য নীতির মুজাদ্দিদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমের ইংরেজী রচনা ISLAMIC FINANCE যার উর্দূ তরজমা اسلامی بنکاری کی بنیادیں -এর অনুবাদ। বইটি পাঠ করলে এ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ হবে এবং সকলে উপরোক্ত ভুল বুঝাবুঝি ও বাড়াবাড়ির হাত থেকে রেহাই পেয়ে নিজেদের সংশোধন করার সুযোগ পাবেন ইনশা আল্লাহ্।

অনুবাদক মুফতী মুহাম্মাদ জাবের হোসাইন যদিও অনুবাদ জগতে নবীন কিন্তু তার অনুবাদ কোন কোন প্রবীণ অনুবাদকের চেয়েও বলিষ্ঠ, সাবলিল ও যথার্থ। আল্লাহ্ পাক তাঁকে এ জাতীয় খেদমতের জন্য কবুল করুন। আমীন।

আমরা বইটির বিষয় বস্তু ও প্রয়োজনীয়তার দিক লক্ষ্য করে সেভাবেই এর সম্পাদনা ও অঙ্গসজ্জার ব্যবস্থা নিয়েছি। এক্ষেত্রে আমাদের মুখলিস বন্ধুবর জনাব শামছুল আরেফীন খালেদ অতি ব্যস্ততা সত্ত্বেও বইটি আদ্যো প্রান্ত দেখে সংশোধন করে দিয়েছেন। আল্লাহ্পাক তাকে জাযায়ে খাইর দান করুন। আমীন।

আমরা আমাদের সাধ্য মত বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো দৃষ্টিতে কোন ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়ে, তাহলে আমাদের অবগত করলে পরবর্তি সংস্করনে সংশোধন করে দিবো– ইনশাআল্লাহ। আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে ইসলামী শরী'অত মুতাবিক ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং ও অর্থায়ন করে রিযিক হালাল রাখার তাওফীক দান করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

তারিখ ঃ ২৪শে শাবান ১৪২৬ হিজরী
২৮শে সেপ্টম্বর ২০০৫ ঈসায়ী

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
আজীমপুর, ঢাকা

অনুবাদকের কথা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলামী বিধি-বিধান কোন প্রকার ধোঁকা, প্রতারণা, প্রতিশোধ কিংবা প্রতিক্রিয়া ভিত্তিক নয়। বরং নাম ও তাৎপর্যগত উভয়দিক থেকেই ইসলাম মানব সমাজের জন্য একটি কল্যাণকর সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা। মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক প্রয়োজনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের রয়েছে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক আদর্শ। তাই তার অর্থায়ন পদ্ধতিতেও নিন্দিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যেমন অবকাশ নেই তদ্রূপ সমাজতন্ত্রের শোষনমূলক অর্থব্যবস্থারও কোন স্থান নেই। ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতির আদর্শিক রূপ হচ্ছে মুশারাকা এবং মুদারাবা। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মুরাবাহা, ইজারা, সালাম এবং ইসতিসনা পদ্ধতিতেও সমকালীন বিদগ্ধ গবেষক আলিমগণ অর্থায়নের অনুমতি দিয়েছেন।

ইসলামী অর্থায়নে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে পারস্পারিক সহযোগিতা। আর বর্তমানে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা হচ্ছে আধুনিক যুগের পারস্পারিক অর্থায়ন সহযোগিতার উন্নত পদ্ধতি। ইসলাম পারস্পারিক সহযোগিতামূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মতৎপরতাকে অবৈধ করেনি।

সুদের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হয়ে যেসব আর্থিক প্রতিষ্ঠান বৈধ ও সুষ্ঠু পদ্ধতিতে নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করে ইসলাম তাকে উৎসাহিত করে। ব্যাংক নিশ্চয়ই কল্যাণকর ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বর্তমান প্রচলিত সূদভীত্তিক ব্যাংক হলো পুঁজিপতিদের জন্য, গরীবদের জন্য নয়। কারণ এটা হলো সম্পদ বাড়ানোর ও সম্পদশালীদের স্বার্থ রক্ষার প্রতিষ্ঠান এবং গরীবদের শবদেহের উপর পুঁজির গগনচুম্বি অট্টালিকা তৈরি করার উত্তম হাতিয়ার। তবে অর্থায়ন পদ্ধতির যে চিত্র ইসলাম পেশ করেছে তা পৃথিবীতে যদি বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করে সমাজের পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে।

সুদবিহীন ব্যাংক এক সময় ছিল অকল্পনীয় এখন তা বাস্তব। পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা সঠিক হলে সুদী ব্যাংক থেকে ইসলামী ব্যাংক অধিকতর সফল।

বাংলা ভাষায় ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রামাণ্য গ্রন্থের

একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও ইসলামী ব্যাংকিংয়ের রূপকার জাষ্টিজ ও যুগ সচেতন মুফতী শাইখুল ইসলাম আল্লামা ত্বাকী উসমানী রচিত 'ইসলামিক ফাইন্যান্স' শীর্ষক ইংরেজী ভাষার গবেষনামূলক গ্রন্থ যুগ সচেতন ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও উলামায়ে কেরামের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। উর্দূভাষীদের সুবিধার্থে পাকিস্তানের মাওলানা মুহাম্মাদ যাহিদ 'ইসলামী ব্যাংকারী কী বুনিয়াদে' নামে গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় রূপান্তরিত করেন। 'ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি সমস্যা ও সমাধান' তারই বাংলা অনুবাদ। গ্রন্থকার তার এ গ্রন্থে ইসলামী অর্থায়ন সম্পর্কিত মৌলনীতিসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিভিন্ন প্রশ্ন ও সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করে এ গ্রন্থের মাধ্যমে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন।

গ্রন্থটি অনুবাদের জন্য শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মুফতী মীযানুর রহমান ছাহেব আমার হাতে তুলে দেন। অনুবাদ শেষে মাকতাবাতুল আশরাফের স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর মুফতী হাবীবুর রহমান খানকে পাড়ুলিপিটি দেখালে তিনি আগ্রহের সাথে তা প্রকাশের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। গ্রন্থটি নির্ভূল অনুবাদে চেষ্টার ত্রুটি করিনি। এরপরও জ্ঞানের অপরিপক্কতার কারণে ভুলভ্রান্তি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। বিজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টিতে কোন ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করনে তা সংশোধন করে দেয়ার প্রত্যাশা ও অঙ্গীকার রইল। পাঠক-পাঠিকাগণ গ্রন্থটি দ্বারা সামান্য উপকৃত হলেও আমি আমার দীর্ঘ শ্রমকে সার্থক মনে করবো। উস্তাদে মুহতারাম যিনি গ্রন্থটি অনুবাদের জন্য হাতে তুলে দিয়েছেন এবং যিনি প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আরো যারা বিভিন্নভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ্ তাআলা সকলকে স্বীয় ভূমিকা অনুযায়ী সর্বোচ্চ বিনিময় দান করুন। পরিশেষে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে বিনীত প্রার্থনা, তিনি যেন গ্রন্থটি কবুল করেন এবং তা থেকে পাঠক মন্ডলীকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন! ছুম্মা আমীন!!

মুহাম্মাদ জাবের হোসাইন
জামিয়া কারীমিয়া আরাবিয়া
রামপুরা-ঢাকা।

তারিখঃ- ১৪.০৬.২০০৫ইং

সূচী পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

بسم الله الرحمنرحيم

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ، وَعَلٰى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ :

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি জগৎসমূহের মালিক। দরূদ ও সালাম তাঁর প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবার পরিজন, সাহাবায়ে কিরাম ও ক্বিয়ামত পর্যন্ত যাঁরা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করবেন তাঁদের প্রতি।

বিগত কয়েক দশক যাবৎ মুসলমানগণ তাঁদের জীবনকে ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে নতুন করে বিনির্মাণের প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। মুসলমানগণ প্রচন্ড ভাবে এ কথা অনুধাবন করতে পেরেছে যে, বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আগ্রাসন তাদেরকে বিশেষভাবে আর্থ-সামাজিক (Socio-Economic) ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন-ব্যবস্থার উপর আমল করা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। ফলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিম জনগণ তাদের জীবনকে ইসলামী শিক্ষার আলোকে সাজানোর লক্ষ্যে নিজেদের ইসলামী স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তাকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

অর্থনৈতিক অঙ্গনে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে শরীয়াহ মুতাবেক পরিচালনা করার লক্ষ্যে সেগুলোতে সংস্কার সাধন করা মুসলমানদের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। বিশেষত এমন এক পরিবেশে যার গোটা অর্থ ব্যবস্থা সুদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে সে পরিবেশে আর্থিক

প্রতিষ্ঠানসমূহকে সূদ বিহীন (Interest-Free) ভিত্তির উপর পুনর্গঠন করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ।

যেসব লোক শরীয়তের মূলনীতি, আদর্শ এবং তার অর্থনৈতিক দর্শন সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল নন, তারা কখনও কখনও মনে করে থাকেন যে, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সুদমুক্ত করলে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো আর ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থাকবে না বরং সেগুলো সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত রূপান্তরিত হয়ে যাবে। যার উদ্দেশ্য হবে বিনা লাভে আর্থিক সেবা (Financial Service) প্রদান করা।

প্রকৃতপক্ষে এ ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। শরীয়তের দৃষ্টিতে সুদবিহীন ঋণ একটি নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলের জন্য; ব্যাপকভাবে ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য নয়। বরং তা পারস্পারিক সহযোগিতা এবং কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডের জন্য হয়ে থাকে। তবে যেখানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পুঁজি সরবরাহের (Commercial Financing) প্রশ্ন জড়িত সেখানে ইসলামী শরীয়তের নিজস্ব এক স্বয়ংসম্পূর্ণ দিক নির্দেশনা (Set-up) বা নীতিমালা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি হলো, যে ব্যক্তি অপরকে ঋণ প্রদান করছেন তাকে প্রথমে এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তিনি কি এ ঋণ দ্বারা শুধু দ্বিতীয় পক্ষকে সাহায্য করতে চান, নাকি তার মুনাফায় অংশীদার হতে চান? যদি তিনি এ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতাকে কেবল সাহায্য করতে চান তাহলে ঋণগ্রহীতা থেকে ঋণের পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত দাবী করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তার মূল পুঁজি নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকবে (অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষের ক্ষতি বা লোকসান হলেও ঋণদাতার মূলধন ফেরৎ পাওয়ার অধিকার সংরক্ষিত থাকবে)। কিন্তু মূল পুঁজির অতিরিক্ত কোন মুনাফার হকদার তিনি হবেন না। আর তিনি যদি অন্যকে এই উদ্দেশ্যে পুঁজি সরবরাহ করেন যে, তার ব্যবসায় অর্জিত মুনাফায় অংশ নিবেন এমতাবস্থায় তিনি অর্জিত মুনাফায় পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আনুপাতিক হারে মুনাফা দাবী করতে পারবেন। তবে, এ ক্ষেত্রে যদি লোকসান হয়ে যায় তাহলে তাকে উক্ত লোকসানেরও দায় বহন করতে হবে।

সুতরাং এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে সুদের পরিসমাপ্তির অর্থ এই নয় যে, পুঁজির যোগানদাতা (Financier) কোন মুনাফা অর্জন করতে পারবে না। বরং যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে পুঁজির যোগান দেওয়া হয়, তাহলে লাভ- লোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এ লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে। এ জন্যই ইসলামী বাণিজ্য আইনের শুরুতেই মুশারাকা এবং মুদারাবা পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে।

তবে এমন কিছু ক্ষেত্র আছে যে সকল ক্ষেত্রে কোনভাবেই মুশারাকা এবং মুদারাবা পদ্ধতিতে অর্থায়ন করা যায় না, সেসব ক্ষেত্রে অর্থায়নের জন্য সমকালীন আলিমগণ অন্যান্য কিছু প্রক্রিয়াও উদ্ভাবন করেছেন, যেগুলো অর্থায়নের লক্ষ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন- মুরাবাহা, ইজারা, সালাম এবং ইসতিসনা'।

বিগত দু'দশক যাবৎ ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে অর্থায়নের ইসলামী পদ্ধতিসমূহ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে তা পরিপূর্ণভাবে সুদী অর্থায়নের বিকল্প নয়। আবার এ ধারনাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যে, ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতিসমূহ হুবহু সুদী অর্থায়ন পদ্ধতির ন্যায় ব্যবহার করা যায়। বরং ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতিসমূহের রয়েছে নিজস্ব মূলনীতি, দর্শন এবং শর্তাবলী। যেগুলো ব্যতীত সে পদ্ধতিসমূহকে শরীয়তের দৃষ্টিতে অর্থায়ন পদ্ধতি (Modes of Financing) হিসেবে ব্যবহার করা বৈধ হবে না। সুতরাং এ পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে মৌলিক ধারণার অভাব এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞতা ইসলামী অর্থায়নকে সুদভিত্তিক প্রচলিত অর্থায়নের সাথে খলত-মলত ও জগাখিচুড়ি করে ফেলার কারণ হয়ে যেতে পারে।

আমার বক্ষমান এ গ্রন্থটি বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত। যার উদ্দেশ্য ইসলামী অর্থায়নের মূলনীতি এবং তার নিয়মাবলী সম্পর্কে মৌলিক ধারণা দেয়া। বিশেষ করে অর্থায়নের যে পদ্ধতিসমূহ ইসলামী ব্যাংক এবং অন্যান্য নন-ব্যাংকিং অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান (Non-Banking Financial Institutions)-এ ব্যবহৃত হচ্ছে সেসব অর্থায়ন পদ্ধতির গভীরে বিদ্যমান মূলনীতিসমূহ শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণীয় হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী এবং সেগুলো

বাস্তবায়নের পদ্ধতিসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করার প্রয়াস পেয়েছি। সাথে সাথে ঐ পদ্ধতিসমূহ বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে উদ্ভুত বাস্তব সমস্যাবলী এবং শরীয়তের আলোকে সেগুলোর সম্ভাব্য সমাধানের উপরও আলোকপাত করেছি।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কয়েকটি ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ সুপারভাইজারী বোর্ডের সদস্য বা চেয়ারম্যান হওয়ার সুবাদে আমার কাছে তাদের কর্মপদ্ধতি যথেষ্ট দুর্বল হিসেবে পরিলক্ষিত হয়েছে। যার মৌলিক কারণ হল, শরীয়তের সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী সম্পর্কিত মূলনীতি ও নিয়ম-কানুন সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকা। এ বাস্তব অভিজ্ঞতা বক্ষমান গ্রন্থটি পাঠকদের খেদমতে উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয়তার অনুভূতিকে শাণিত করেছে। গ্রন্থটিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর আমি সহজবোধ্য ও সাবলীলভাবে আলোকপাত করেছি যেন সাধারণ পাঠকবৃন্দ- যাদের ইসলামী অর্থায়নের নীতিমালা গভীরভাবে অধ্যয়নের সুযোগ হয়নি তারাও সহজে অনুধাবন করতে পারেন।

আশাকরি আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ইসলামী অর্থায়নের নীতিমালা এবং ইসলামী ব্যাংকিং ও প্রচলিত ব্যাংকিং-এর মধ্যকার পার্থক্য সহজভাবে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার দরবারে বিনীত প্রার্থনা, তিনি যেন গ্রন্থটি কবুল করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের ওসীলা বানিয়ে দেন এবং তা থেকে পাঠকমণ্ডলীকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করেন। ওয়ামা তাওফীক্বী ইল্লা বিল্লাহ।

মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
করাচী, পাকিস্তান
০৪.০৩.১৪১৯ হিজরী
২৯.০৬.১৯৯৮ ঈসায়ী

কয়েকটি মৌলিক সূক্ষ্ম বিষয়

ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি সমূহ (Modes of Financing) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে মৌলিক নীতিমালা সম্পর্কিত কয়েকটি সূক্ষ্ম বিষয়কে সুস্পষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন মনে করি, যে বিষয়সমূহ ইসলামী জীবন বিধানের গোটা অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে।

(১) আসমানী হেদায়াতের উপর বিশ্বাস স্থাপন

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাথমিক অত্যাবশ্যকীয় আক্বীদা, যাকে কেন্দ্রে করে সকল ইসলামী ভাবধারা গড়ে ওঠে তা হলো এ বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা এবং তা তাঁর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি বানিয়েছেন। যেন তারা আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান পালনের মাধ্যমে বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ পূর্ণ করে। আল্লাহ তা'আলার এই বিধানাবলী এবং ইবাদাতসমূহ কিছু ধর্মীয় রসম-রেওয়াজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা আমাদের জীবনের প্রায় প্রতিটি বিষয়ের এক বিরাট অংশ জুড়ে আবর্তিত। ঐ বিধানাবলীতে খুঁটিনাটি ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে এত চুলচেরা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেন নি যে, এর ফলে মানবিক কর্মকাণ্ড একটি সংকীর্ণ গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ হয়ে যায় এবং মানুষের চিন্তা-ভাবনার কোন অবকাশই অবশিষ্ট না থাকে। আবার এ বিধানাবলী এত সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্টও রাখেন নি যে, জীবনের প্রতিটি অধ্যায় মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বরং এ উভয় প্রান্তসীমা থেকে দূরে অবস্থান করে ইসলাম মানব জীবন-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান উপস্থাপন করেছে। ইসলাম একদিকে যেমন মানবিক কর্মকাণ্ডের একটি বড় অংশ মানুষের স্বীয় বিবেক-বুদ্ধির সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দিয়েছে। যেখানে সে স্বীয় চিন্তা-ভাবনা, মাছলিহাত ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে

নিজেই ফয়সালা করতে পারে।[১] অপরদিকে ইসলাম মানুষের কর্মকাণ্ডকে এমন কতগুলো মূলনীতির অধীনে রেখেছে, যেগুলো সকল যুগে প্রযোজ্য। মানুষের ধারনা প্রসূত কল্যাণের অপরিপক্ক দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ প্রদত্ত এসব নিয়মনীতির বিরুদ্ধাচরণ করা যাবে না।

অবস্থার আল্লাহ প্রদত্ত বিধানাবলীর এ ধারণার পিছনে কার্যকর মূল রহস্য এই যে, মানুষের বিবেক-বুদ্ধি যথেষ্ট পূর্ণতা সত্ত্বেও সত্যে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে সীমাহীন শক্তির দাবী করতে পারে না। তার কর্মকাণ্ডেরও শেষ পর্যন্ত একটি পরিধি রয়েছে, যে পরিধির বাইরে সে সঠিকভাবে কাজ সম্পাদন করতে পারে না। অথবা ভ্রান্তির শিকারে পরিণত হয়। মানুষের জীবনের এমন কিছু অধ্যায় রয়েছে, যেখানে বিবেক-বুদ্ধি সাধারণত দ্বিধান্বিত হয়ে যায় এবং যৌক্তিক দলীল প্রমাণের ছদ্মাবরণে অসুস্থ প্রবণতা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে অগঠনতান্ত্রিক এবং ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য করে। অতীতের সে সকল মতবাদ যেগুলোকে বর্তমানে ভ্রান্ত বিভ্রান্তি কর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, ঐ সকল মতবাদ সম্পর্কে সে যুগে দাবী করা হয়েছিল, যে তা যৌক্তিক দলীল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু শতবর্ষ পর এর ভ্রান্তি প্রকাশিত হয়েছে এবং সেগুলোকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে হাস্যকর ও অর্থহীন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এতে প্রমাণিত হল যে, বিবেক-বুদ্ধির স্রষ্টা স্বয়ং একে কার্যক্ষমতার যে পরিধি দান করেছেন, তা সীমাহীন নয়। কিছু এমন ক্ষেত্রও রয়েছে, যেথায় মনুষ্য বুদ্ধি যথার্থভাবে পথ প্রদর্শন করতে পারে না, অথবা কমপক্ষে পথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ভ্রান্তিতে নিপতিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা অবশ্যই থেকে যায়। সেসব ক্ষেত্রে বিশ্বজাহানের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীগণের উপর ওহী নাযিল করে মানব জাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। এ কারণেই প্রত্যেক মুসলিমের দৃঢ় আক্বীদা ও বিশ্বাস হলো, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি ওহী নাযিল করে আমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন, তার বাহ্যিক এবং আধ্যাত্মিক (In-letter and Sprit) উভয় ধরনের বাস্তবায়ন হওয়া উচিত। কারো

---

১. শরীয়তের পরিভাষায় এটাকে মুবাহ বলা হয়, যা করা না করা কোনটার ব্যাপারেই শরীয়তের দৃষ্টিতে মানুষের জন্য অপরিহার্য নয়।

বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা বা ব্যক্তিগত অভিলাষের ভিত্তিতে সে সকল হিদায়াতকে উপেক্ষা বা সেগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করা যাবে না। এ কারণে সকল কর্মকাণ্ড আল্লাহ্ প্রদত্ত সে সকল বিধানাবলীর অধীনে থেকে তাতে বর্ণিত সীমারেখা ও নিয়ম-নীতির ভিত্তিতেই পরিচালিত হতে হবে। ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মতো কতেক সাধারণ চারিত্রিক শিক্ষা, রসম-রেওয়ায বা কিছু ইবাদতে সীমাবদ্ধ নয়। বরং ইসলাম জীবনের সকল ক্ষেত্রে শিক্ষা-দীক্ষা এবং দিক নির্দেশনা দিয়েছে, যার মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভাগও অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর বান্দাদের শুধু ইবাদাত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ পালন করতে বলা হয়নি। বরং নিজেদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও তাঁর নির্দেশ পালন অত্যাবশ্যক করেছেন। চাই তা বাহ্যিক কিছু লাভ ত্যাগ করার বিনিময়েই হোক না কেন। কারণ এ সকল বাহ্যিক লাভ সমাজের সমষ্টিগত লাভের পরিপন্থি।

(২) পুঁজিবাদ ও ইসলামী অর্থ -ব্যবস্থার মাঝে মৌলিক পার্থক্য

ইসলাম বাজারের শক্তি (চাহিদা ও যোগান) এবং বাজার অর্থনীতিকে অস্বীকার করে না। এমনকি ব্যক্তি স্বার্থের চেতনাও একটি যৌক্তিক সীমা পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য। ইসলাম ব্যক্তি মালিকানাকেও সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেনি। এতদসত্ত্বেও ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার মাঝে মৌলিক পার্থক্য হল, পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় ব্যক্তি-মালিকানা এবং ব্যাক্তি-স্বার্থের চেতনাকে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে লাগামহীন শক্তি এবং সীমাহীন স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এবং তাদের এ স্বাধীনতাকে কোন ধরনের ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি। যদি কোথাও কিছু নিয়ন্ত্রণ থেকেও থাকে তাও স্বয়ং মানুষ কর্তৃক আরোপিত। যা আইন তৈরির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবর্তনের সম্ভাবনা মুক্ত। আর এ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণের ঊর্ধ্বে কারো কর্তৃত্বকে (Authority) স্বীকার করে না। এরূপ ব্যবস্থা এমন বহু কার্যকলাপের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, যা সমাজে (অর্থনৈতিক) বৈষম্য সৃষ্টির কারণ হয়ে যায়। সুদ, জুয়া এবং লটারী সম্পদকে গুটিকতেক লোকের হাতে পুঞ্জিভূত করে রাখার সুযোগ করে দেয়। অর্থোপার্জনের লক্ষ্যে অশালীন ও ক্ষতিকর দ্রব্য এবং সেবা (Service) আবিষ্কারের মাধ্যমে অসুস্থ মনুষ্য আবেগকে ব্যবহার করা হয়।

ধন-সম্পদ উপার্জনের লাগামহীন আগ্রহ ও স্পৃহা ইজারাদারী সৃষ্টি করে। ফলে বাজারের ক্ষমতা (চাহিদা ও যোগান) হয়ত স্থবির ও শ্লথ হয়ে যায়। অথবা কমপক্ষে তার স্বাভাবিক কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যা বাজার-ক্ষমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলে দাবীদার, কার্যত চাহিদা ও যোগানের স্বাভাবিক নিয়মে তা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কেননা, চাহিদা ও যোগানের এ শক্তি ইজারাদারীতে নয় বরং উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার অঙ্গনে সঠিকভাবে কাজ করে। ধর্মনিরপেক্ষ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় (Secular Capitalism) অনেক সময় এমনও হয় যে, কোন বিশেষ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে এ বিষয়টি পুরোপুরি অনুভব করা যায় যে, এটি সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য উপযোগী নয়। এতদসত্ত্বেও একে কেবল এ উদ্দেশ্যে চালু থাকতে দেয়া হয় যে, (একে অচল করে দেয়া) এমন একটি প্রভাবশালী মহলের স্বার্থের পরিপন্থি, যাদের সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব বিদ্যমান। যেহেতু (গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায়) জনগণের শাসনের ঊর্ধ্বে যে কোন কর্তৃপক্ষকে পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়েছে এবং Trust in God-এর মূলনীতিকে (যা প্রত্যেক মার্কিন ডলারে লিখিত রয়েছে) সামাজিক, অর্থনৈতিক অঙ্গন থেকে পুরোপুরি হটিয়ে দেয়া হয়েছে। এজন্য সে ব্যবস্থায় কোন স্বীকৃত আসমানী হিদায়াত বা দিকনির্দেশনা নেই, যা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট অপকর্ম ও অশ্লীলতাকে প্রতিরোধ করার জন্য এ ছাড়া আর কোন পথে নেই যে, আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা মেনে নিয়ে তাঁর বিধি-বিধানের আনুগত্য স্বীকার করতে হবে এবং সে বিধানাবলীকে এমন যথার্থ মনুষ্য-শক্তির ঊর্ধ্বের হিদায়াত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে যার উপর সর্বাবস্থায় যে কোন মূল্যে আমল করা অত্যাবশ্যক বলে গণ্য হবে। মূলত এটাই ইসলামী জীবনব্যবস্থার সারকথা। ব্যক্তি মালিকানা ও ব্যক্তি স্বার্থের চেতনা এবং বাজারের ক্ষমতা মেনে নিয়ে ইসলাম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করে দিয়েছ। এ সকল বিধি নিষেধ যেহেতু আল্লাহর পক্ষ হতে আরোপিত, যাঁর জ্ঞান অসীম ও অনন্ত, যেহেতু এ বিধি-নিষেধসমূহ মানুষের জ্ঞানলব্ধ গবেষণা দ্বারা হটানো যাবে না। সুদী লেনদেন, জুয়া, গুদামজাতকরণ, কালোবাজারী,

অবৈধ পণ্য এবং অবৈধ সেবার লেনদেন, যে পণ্য নিজের মালিকানায় নেই, তার বেচাকেনা (Short Selling) ইত্যাদির নিষিদ্ধতা আল্লাহ প্রদত্ত সেই বিধি নিষেধের কয়েকটি উদাহরণ। এমন বিধি নিষেধ ও নিয়মনীতি সম্মিলিতভাবে অর্থ-ব্যবস্থার উপর একটি সামগ্রিক প্রভাব বিস্তার করে। যার ফলে অর্থনৈতিক ভারসাম্য, সম্পদের সুষম বণ্টন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সামঞ্জস্যতা আসে।

(৩) প্রকৃত সম্পদের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থায়ন ঃ

(Asset-0 Backed Financing)

ইসলামী অর্থায়নের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য হল ইহা প্রকৃত সম্পদের[১] উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থায়ন। অর্থায়ন বা অর্থ সংস্থান (Financing)-এর প্রচলিত পুঁজিবাদি ধারণা হলো ব্যাংক ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র অর্থ [ধাতব বা কাগজী মুদ্রা (Money)] বা অর্থের বিকল্প দলীল হিসাবে প্রতিনিধিত্বকারী কোন কাগজ বা Monetary papers (যেমন বন্ড) লেনদেন করে থাকে। (এটি একটি মধ্যস্বত্বভোগী প্রতিষ্ঠান মাত্র) এ কারণেই পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পণ্য দ্রব্যের ব্যবসা এবং ব্যবসার জন্য পণ্য গুদামজাত করার অনুমতি নেই। যেহেতু ইসলাম মুদ্রা (Money)-কে ক্ষেত্র বিশেষ ব্যতীত ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে স্বীকার করে না। কেননা, মুদ্রার উপকার পৌছানোর মত নিজস্ব স্বত্বাগত অভ্যন্তরীন কোন ক্ষমতা নেই। বরং তা পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম (Medium of Exchange) মাত্র। এর প্রতিটি একক সেই একই মুদ্রার অন্য এককের শতকরা একশতভাগ সমমানের। (যেমন- এক টাকার একটি নোট আরেকটি এক টাকার একটি নোটের ১০০% সমান গণ্য করা হবে, যদিও একটি নতুন আরেকটি পুরাতন এবং একটি নগদ আরেকটি বাকি হোক না কেন)।

সুতরাং মুদ্রার এককসমূহের পারস্পরিক লেনদেনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের কোন অবকাশ নেই। মুনাফা ঐ ক্ষেত্রে অর্জন করা যেতে পারে,

---

১.প্রকৃত সম্পদ হচ্ছে সে সকল সম্পদ যার অপরের অভাব পুরণের নিজস্ব সত্ত্বাগত ক্ষমতা (উপযোগ) এবং বিনিময় মূল্য আছে। -সম্পাদক

যে ক্ষেত্রে মুদ্রার বিনিময়ে এমন কিছু পণ্য সামগ্রী বেচাকেনা করা হবে, যার নিজস্ব এবং স্বত্বাগত মূল্য রয়েছে। অথবা বিভিন্ন মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা যেতে পারে। (যেমন- পাকিস্তানী (বাংলাদেশী) মুদ্রা আমেরিকান ডলারের বিনিময়ে লেনদেন করা)। একই ধরনের মুদ্রা বা তার দলীল হিসাবে প্রতিনিধিত্বকারী কোন কাগজ (যেমন বন্ড ইত্যাদি)-এর লেনদেন করে অর্জিত মুনাফা সুদ এবং হারাম। এ কারণে প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিপরীতে ইসলামী পদ্ধতিতে ফিন্যান্সিং-এর ভিত্তি হল সর্বদা অতরল বস্তুগত (Illiquid)[১] সম্পদের উপর। ফলে ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রকৃত সম্পদ এবং ব্যবসার পণ্য-সামগ্রী (Inventories) অস্তিত্বে আসে।

শরীয়তে ফিন্যান্সিং-এর মূল এবং আদর্শ পদ্ধতি হচ্ছে 'মুশারাকা' এবং 'মুযারাবা'। যখন কোন পুঁজি সরবরাহকারী (Financier) উক্ত পদ্ধতি দু'টোর ভিত্তিতে বৃহদায়তন পুঁজি বিনিয়োগ করতে চায়, তখন এটা অত্যাবশ্যক হয়ে যায় যে, পুঁজিকে স্বত্বাগত মূল্য বহন করে এমন কোন সম্পদে রূপান্তরিত করা। মুনাফা উক্ত প্রকৃত সম্পদ বিক্রির মাধ্যমে অর্জন করা যাবে।

'সালাম' এবং 'ইসতিসনা' পদ্ধতির ভিত্তিতে যে ফিন্যান্সিং করা হয় তার মাধ্যমেও প্রকৃত সম্পদ অস্তিত্বে আসে। 'সালাম' (অগ্রিম ক্রয়) পদ্ধতিতে অর্থায়নকারী (পুঁজি সরবরাহকারী) প্রকৃত সম্পদ অর্জন করে তা বাজারে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করতে পারে। 'ইসতিসনা' পদ্ধতিতে ফিন্যান্সিং-এ কিছু প্রকৃত সম্পদ উৎপাদনের (Manufacturing) মাধ্যমেই কার্যকর হয়। যার দ্বারা ফাইন্যান্সার মুনাফা অর্জন করে।

ইজারা পদ্ধতিতে অর্থায়ন (Financial lease) এবং মুরাবাহা সম্পর্কে পরবর্তিতে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে জানা যাবে যে, তা মূলত ফিন্যান্সিং-এর আদর্শিক পদ্ধতি নয়। অবশ্য কিছু কিছু প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে সেগুলোকে নতুন রূপ দেয়া হয়েছে। তবে যেক্ষেত্রে 'মুশারাকা', 'মুদারাবা', 'সালাম' এবং 'ইসতিসনা'-এর পদ্ধতি কোন কারণে অবলম্বন করা না যায়, সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন পূরণের জন্য উক্ত পদ্ধতি দু'টো (শরীয়ত

---

১. যে সকল সম্পদ নগদ টাকায় (অর্থাৎ স্বল্প সময়ে ও খরচে) রূপান্তর করা যায় না।

নির্দেশিত) শর্তসাপেক্ষে বিনিয়োগ পদ্ধতি (Mode of financing) হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

মুরাবাহা এবং ইজারা পদ্ধতির অর্থায়নের ব্যাপারে সাধারণত এ প্রশ্ন করা হয় যে, এগুলোর সমাপ্তি সুদী ঋণ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। প্রশ্নটি একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সঠিক। কারণ ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শরীয়াহ এডভাইজারী বোর্ড এ বিষয়ে একমত যে, এ পদ্ধতি দু'টো ফিন্যান্সিং-এর আদর্শিক পদ্ধতি নয়। সুতরাং এগুলোকে শরীয়তের পক্ষ হতে নির্ধারিত শর্তসমূহের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রেখে শুধুমাত্র প্রয়োজনের সময়ই ব্যবহার করা উচিত। এতদ্‌সত্ত্বেও 'মুরাবাহা' এবং 'ইজারা' পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে সম্পদের উপর ভিত্তিশীল ফিন্যান্সিং পদ্ধতি। উপরোক্ত পদ্ধতির অর্থায়ন সুদী অর্থায়ন থেকে নিম্নবর্ণিত কারণের ভিত্তিতে সুস্পষ্টভাবে ভিন্নতর হয়ে যায়।

(১) আধুনিক ফিন্যান্সিং-এর প্রচলিত পদ্ধতিতে ফাইন্যান্সার গ্রাহক (Client)- কে সুদি ঋণের ভিত্তিতে অর্থ প্রদান করে। ফাইন্যান্সার কর্তৃক প্রদেয় অর্থ গ্রাহক (Client) কোথায় কিভাবে ব্যবহার করল, এ ব্যাপারে ফাইন্যান্সারের কোন চিন্তা-ভাবনা থাকে না। অপরদিকে মুরাবাহার ক্ষেত্রে ফাইন্যান্সার স্বীয় গ্রাহককে সরাসরি নগদ অর্থ প্রদানই করে না বরং ফাইন্যান্সার নিজে গ্রাহকের প্রয়োজন মাফিক পণ্য সামগ্রী (Commodity) ক্রয় করে তা গ্রাহকের নিকট বাকিতে অধিক মুনাফায় বিক্রি করে। যেহেতু মুরাবাহার এই লেনদেন ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণই হয় না, যতক্ষণ না গ্রাহক (Client) ফাইন্যান্সারকে এ নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, সে তার প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী ক্রয় করবে। সুতরাং ফাইন্যান্সার গ্রাহকের প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী ক্রয় না করা পর্যন্ত মুরাবাহা সম্ভব নয়। এভাবে মুরাবাহা পদ্ধতির পিছনে সর্বদা প্রকৃত সম্পদ বিদ্যমান থাকে।

(২) প্রচলিত অর্থায়ন পদ্ধতিতে যে কোন ধরনের লাভ বা উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ঋণ দেয়া যায়। জুয়াখানার মালিক জুয়ার কারবারে উন্নতি সাধনকল্পে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। অশ্লীল ম্যাগাজিন, উলঙ্গ ও চরিত্র বিধ্বংসী ফিল্ম প্রস্তুতকারক কোম্পানীও এমনিভাবে কোন ব্যাংকের একজন শেয়ার হোল্ডার হতে পারে যেমনিভাবে একজন দীনদার-পরহেজগার গৃহনির্মাতা ব্যক্তি হতে পারে। এরূপ প্রচলিত ফিন্যান্সিং-এ

খোদায়ী ও ধর্মীয় পাবন্দির ক্ষেত্রে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। পক্ষান্তরে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান মুরাবাহা বা ইজারা পদ্ধতিতে শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ বা সমাজের চরিত্র হননকারী এমন কোন উদ্দেশ্যে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে না।

(৩) মুরাবাহা বৈধ হওয়ার জন্য এটাও একটি শর্ত যে, মুরাবাহা ফাইন্যান্সারের ক্রয়কৃত পণ্যে (Commodity) হতে হবে। (যদিও কিছুক্ষণের জন্য হলেও উক্ত পণ্য ফাইন্যান্সারের মালিকানা ও কব্জায় থাকতে হবে)। অর্থাৎ ফাইন্যান্সার উক্ত পণ্যটি গ্রাহকের নিকট বিক্রির পূর্বে তার ঝুঁকি গ্রহণ করে থাকে। **ফাইন্যান্সার যে মুনাফা পেয়ে থাকেন, তা উক্ত ঝুঁকি বহনের ফলেই পেয়ে থাকেন**। কিন্তু সুদি লেনদেনে দ্রব্যটির কোন দায়ভার বা ঝুঁকি ফাইন্যান্সার বহন করে না।

(৪) সুদি ঋণের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহিতাকে যে অর্থ পরিশোধ করতে হয় তা (ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত) সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অপরদিকে মুরাবাহার ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের মাঝে দ্রব্যের মূল্য একবার ধার্য হওয়ার পর নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলেও পূর্ব মূল্যই বলবৎ থাকে। **সুতরাং ক্রেতা (ব্যাংকের গ্রাহক) যদি সময়মত মূল্য পরিশোধ না করে তথাপিও বিক্রেতা (ব্যাংক) এই বিলম্বের কারণে অতিরিক্ত মূল্য দাবী করতে পারে না**। কেননা, শরীয়তে মুদ্রার উপর অতিবাহিত সময়ের মূল্য গ্রহণ করার কোন বৈধতা নেই।

(৫) ইজারা বা ভাড়ার পদ্ধতিতেও ফিন্যান্সিং-এর প্রস্তাব একটি ব্যবহার উপযোগী দ্রব্যের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যে প্রপার্টি ইজারা বা ভাড়ার ভিত্তিতে দেয়া হয়, তা ভাড়া চলাকালীন সময়ে ভাড়া প্রদানকারী (ফাইন্যান্সার)-এর দায়ভার ও ঝুঁকিতে থাকবে। **এজন্য ভাড়ায় প্রদত্ত দ্রব্যটি ভাড়াটিয়ার সীমালঙ্ঘন বা অবহেলা ব্যতীত যদি স্বাভাবিক কারণে বা অন্য কোনভাবে নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে ভাড়া প্রদানকারী (ফাইন্যান্সার) এর ক্ষতি বহন করবে।**

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, ইসলামী পদ্ধতিতে প্রত্যেক ফিন্যান্সিং প্রকৃত সম্পদ অস্তিত্বে আনে। এমনকি মুরাবাহা বা লীজ-ভাড়ার পদ্ধতির ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। **অথচ সত্যিকারার্থে**

মুরাবাহা এবং ইজারাকে ইসলামী ফিন্যান্সিং-এর আদর্শিক পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা হয়নি। বরং সাধারণত চূড়ান্ত পর্যায়ে এগুলোর উপর সুদি ঋণের কাছাকাছি হওয়ার অভিযোগ করা হয়। অপরদিকে এ কথা পরিজ্ঞাত যে, সুদভিত্তিক ফিন্যান্সিং অপরিহার্যভাবে প্রকৃত সম্পদ সৃষ্টি করে না। এ কারণে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে জারিকৃত ঋণের ফলে মুদ্রার যে যোগান (Supply) অস্তিত্বে আসে তা সমাজে সৃষ্ট প্রকৃত সম্পদ এবং সেবার সাথে সামঞ্জস্য রাখে না। (বরং তার থেকে বেড়ে যায়) কেননা, এসব ঋণ কাল্পনিক মুদ্রা সৃষ্টি করে,[১] যার ফলে সে পরিমাণ প্রকৃত সম্পদ সৃষ্টি না হয়ে মুদ্রার যোগান বেড়ে যায়। বরং কোন কোন সময় কয়েকগুণ বেড়ে যায়। মুদ্রার যোগান এবং প্রকৃত সম্পদ উৎপাদনের এ পার্থক্য মুদ্রার আধিক্যতা সৃষ্টি করে কিংবা তাতে সংযোজন করে। ইসলামী পদ্ধতিতে যেহেতু ফিন্যান্সিং-এর বিপরীতে সম্পদ অবশ্যই থাকে একারণে এর বিপরীতে আগত পণ্য এবং সেবার সাথে সর্বদা তার সামঞ্জস্যতাও বিদ্যমান থাকে।

(৪) মূলধন এবং উদ্যোক্তা ঃ
(Capital and Entrepreneur)

পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে মূলধন **(Capital)** এবং উদ্যোক্তা দু'জন দু'দৃষ্টিকোন থেকে উপার্জনকারী। প্রথমটি (মূলধন) সুদ উপার্জন করে, আর দ্বিতীয়টি (উদ্যোক্তা) মুনাফার অধিকারী হয়। সুদ হল বিনিয়োগকৃত মূলধনের উপর নির্ধারিত লাভ। আর মুনাফা কেবল ঐ অবস্থা-ই অর্জিত হয়, যখন ভূমি, শ্রম ও পুঁজির নির্ধারিত লাভ (পারিশ্রমিক এবং সুদ) প্রদানের পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে। (উদ্যোক্তা তা ভোগ করে)।

অপরদিকে ইসলাম মূলধন এবং উদ্যোক্তা এ দু'টোকে উৎপাদনের পৃথক পৃথক উপার্জনকারী হিসেবে স্বীকার করে না। যে ব্যক্তি কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে (নগদ ক্যাশে) মূলধন বিনিয়োগ করে, সে লভ্যাংশের সাথে সাথে লোকসানের ঝুঁকি-দায়ভারও অবশ্যই বহন করে থাকে। এজন্য সে

---

১. এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা ইসলাম আওর জাদীদ মাঈসাত ওয়া তিজারাত দ্রষ্টব্য; পৃষ্ঠা নং- ১২৩-১২৫।

পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আনুপাতিক হারে প্রকৃত লভ্যাংশ প্রাপ্তির অধিকারী হয়। **এভাবে ব্যবসায় লোকসানের দায়ভার বহনকারী হিসেবে মূলধনও উদ্যোক্তা হতে পারে।** এ জন্য সে সুদরূপে একটি নির্ধারিত লাভের স্থলে মুনাফা অর্জন করে, ব্যবসার লাভ যত বৃদ্ধি পাবে, মূলধন-এর লাভও (Return) ততই বেড়ে যাবে। এভাবে সমাজে প্রচলিত ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা সেসব লোকদের মধ্যে ইনসাফভিত্তিক বণ্টিত হবে, যারা ব্যবসায় মূলধন যোগান দিয়ে থাকে, তাদের এ মূলধন যত কমই হোক না কেন।

আধুনিক কর্মনীতি অনুযায়ী যেহেতু ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহই এমন প্রতিষ্ঠান যে, তারা তাদের নিকট জমাকৃত আমানতসমূহের মধ্য থেকে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের মূলধন সরবরাহ করে, সেহেতু উক্ত মূলধনের প্রকৃত লভ্যাংশ সাধারণ আমানতকারী (Depositors) দের মধ্যেও ইনসাফ ও ন্যায়ের ভিত্তিতে বণ্টন হবে। যার ফলে ধন-সম্পদ গুটিকতেক ব্যক্তির হাতে পুঞ্জিভূত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে এবং তা এক বৃহৎ অঙ্গনে বণ্টিত হবে।

(৫) ইসলামী ব্যাংকসমূহের বর্তমান কার্যক্রম ঃ

ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কখনো কখনো এ যুক্তি পেশ করা হয় যে, বিগত তিন দশক যাবত যেসব ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করে আসছে, সেসব প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক সেটআপে এমনকি শুধু অর্থায়নের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য তেমন কোন পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়নি। এর দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, ইসলামী ব্যাংকিং-এর ছত্রছায়ায় "সম্পদ বণ্টনে ইনসাফ" (Distributive justice) এর জোর দাবী করা অতিরঞ্জিত বৈ কিছুই নয়।

কিন্তু এ আপত্তিকর সমালোচনা বাস্তব সম্মত নয়। কেননা প্রথমত, ইসলামী ব্যাংকসমূহকে প্রচলিত ব্যাংকেসমূহের সাথে তুলনা করলে দেখা যাবে, ইসলামী ব্যাংকগুলোর অবস্থান সমুদ্রের বিশাল জলরাশির মধ্যে এক ফোঁটা পানির সমতূল্য। সুতরাং এ স্বল্প সময়ে অর্থ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের মহাবিপ্লব ঘটানোর ধারণা করা ঠিক নয়।

দ্বিতীয়ত, ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এখনো তাদের শৈশবকাল অতিক্রম করছে। তাদেরকে অনেক বাধাবিঘ্ন ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হয়। ফলে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কোন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের সকল চুক্তিতে শরীয়তের সকল শর্ত পালনে সক্ষম হয় না। এজন্য এসব প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত সকল চুক্তি ও লেনদেনকে শরীয়তের সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না।

তৃতীয়ত, ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণত সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার, কর ব্যবস্থা, আইন ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সহযোগিতা লাভে সক্ষম হয় না। এমতাবস্থায় ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনের ভিত্তিতে এমন কিছু বিশেষ সুযোগ (রুখসাত ও রেয়ায়াত) প্রদান করা হয়, যা শরীয়তের মৌলিক ও আদর্শিক নিয়ম-নীতি ভিত্তিক নয়।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। তার বিধি-বিধানের দু'টি দিক রয়েছে। প্রথমটি হল- শরীয়তের মূল লক্ষ্য ও আদর্শ ভিত্তিক। যেগুলোর উপর সাধারণ অবস্থায় আমল করা হয়। দ্বিতীয়টি হল- সুযোগ-অবকাশ তথা রুখসাত ভিত্তিক। যেগুলোর উপর জরুরী ও অস্বাভাবিক অবস্থায় আমল করার অনুমতি দেয়া হয়। সত্যিকার ইসলামী ব্যবস্থাপনার ভিত্তি প্রথমটি তথা আদর্শিক মূলনীতির উপর। আর দ্বিতীয়টি হল রুখসাত যা প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু এর দ্বারা ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থার প্রকৃত চিত্র পরিস্ফুটিত হয় না।

অনেক প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে সাধারণত ইসলামী ব্যাংকসমূহ দ্বিতীয় প্রকারের বিধানাবলী তথা রুখসাতের উপরই তাদের কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ রাখে। ফলে ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের নিজস্ব পরিমণ্ডলেও সুস্পষ্ট কোন পরিবর্তন আনতে পারছে না। তবে যদি পুরো অর্থায়ন পদ্ধতি ইসলামের আদর্শ ও মৌলিক নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তাহলে অবশ্যই অর্থব্যবস্থার উপর এর দৃশ্যমান প্রভাব পরিলক্ষিত হবে।

এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, গ্রন্থটি যেহেতু যুগের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে, সেহেতু এতে ইসলামী বিধি-বিধানের উভয়দিক নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম

পর্যায়ে ইসলামী ফিন্যান্সিং-এর আদর্শিক মূলনীতিসমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তিতে ঐ সকল সম্ভাব্য সুন্দর সুন্দর (অবকাশ) পদ্ধতি নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে, যেগুলো অস্থায়ী (সাময়িক) ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেখানে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমান আইনগত এবং আর্থিক পদ্ধতির প্রতিকূলতার মাঝে কাজ করে যাচ্ছে, সেখানে উক্ত অবকাশসমূহের ব্যাপারেও শরীয়তের সুস্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে। এর মহৎ একটি উদ্দেশ্য হল- তুলনামূলক উত্তম কর্মপন্থা অবলম্বন করে সুস্পষ্ট হারাম থেকে বেঁচে থাকা। এর দ্বারা যদিও সঠিক ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বুনিয়াদী উদ্দেশ্য সাধনে কাংখিত অধিক সহায়তা লাভ হবে না, তবে এ কর্মপন্থা হারাম থেকে বেঁচে থাকার এবং আল্লাহ তা'আলার নাফরমানির অশুভ পরিণাম থেকে মুক্তি লাভের ক্ষেত্রে অবশ্যই সহায়ক হবে যা একজন মুসলমানের জন্য ব্যক্তি সত্তায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য, যদিও তা ব্যক্তিগত পর্যায়েই হোক না কেন। এ ছাড়া এর দ্বারা সমাজে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার আদর্শিক লক্ষ্যবস্তুর দিকে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রেও সহায়তা লাভ হবে। তাই ইসলামী শরীয়তের এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই বক্ষমান গ্রন্থটি পাঠ করা উচিত।

মুশারাকা
বা
অংশীদারী কারবার

"মুশরাকা" মূলত আরবী শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ শরীক বা অংশীদার হওয়া। কারবার ও ব্যবসাবাণিজ্যের পরিভাষায় মুশারাকা বলতে এমন এক যৌথ কারবারকে বুঝায়, যে কারবারে সকল অংশীদার যৌথ কারবারের লাভ লোকসানে শরীক থাকে। মুশারাকা বা অংশীদারি কারবার সুদভিত্তিক অর্থায়নের একটি আদর্শিক বিকল্প ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টন উভয়ের সাথে অংশীদারগণ জড়িত থাকে। আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় সুদই একমাত্র মাধ্যম যাকে সর্বপ্রকারের অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ইসলামে যেহেতু সুদ হারাম, সেহেতু একে কোন ধরনের অর্থায়ন (Financing) এর জন্য ব্যবহার করা যায় না। এজন্য ইসলামী মূলনীতিভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থায় 'মুশারাকা' সময়ের দাবী পূরণে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

সুদি ব্যবস্থাপনায় ফাইন্যান্সার কর্তৃক প্রদেয় ঋণের উপর অতিরিক্ত পরিশোধযোগ্য টাকার পরিমাণ পূর্বেই ধার্য করা হয়। ঋণগ্রহীতার লাভ হোক বা লোকসান হোক, এর প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। অপরদিকে মুশারাকায় পরিশোধযোগ্য অর্থের পরিমাণ পূর্বে ধার্য করা হয় না। বরং এতে মুনাফার ভিত্তি হল অংশীদারি কারবারে অর্জিত প্রকৃত মুনাফার উপর। সুদি কারবারে বিনিয়োগকারী (ফাইন্যান্সার) কোন অবস্থাতেই লোকসানের দায়িত্ব বহন করে না। কিন্তু মুশারাকায় ফাইন্যান্সারের লোকসানও হতে পারে, যদি এ যৌথ ব্যবসায় লাভ না হয়।

ইসলাম সুদকে একটি ইনসাফবিবর্জিত পন্থা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। কেননা, এর ফলাফল ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা উভয়ের মাঝে বৈষম্য ও বে-ইনসাফীর আকারে প্রকাশ পায়। যদি ঋণগ্রহীতার ব্যবসায় লোকসান হয় তাহলে ঋণদাতার পক্ষ থেকে অতিরিক্ত অর্থের দাবী করা বে-ইনসাফী। অন্যদিকে যদি ঋণগ্রহীতা ব্যবসায় প্রচুর পরিমাণ লাভবান হয়, তাহলে লাভের সামান্যতম অংশ ঋণদাতাকে দিয়ে অবশিষ্ট সমুদয় লভ্যাংশ ঋণগ্রহীতার কুক্ষিগত করাও ইনসাফসম্মত নয়।

আধুনিক অর্থব্যবস্থায় ব্যাংক-ই একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান, যে তার একাউন্ট হোল্ডারদের অর্থ থেকেই শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদেরকে ঋণ প্রদান করে থাকে। যদি কোন শিল্পপতির কাছে শুধু দশ মিলিয়ন টাকা থাকে, তাহলে সে ব্যাংক থেকে আরো নব্বই মিলিয়ন টাকা ঋণ গ্রহণ করতে পারে। এ অর্থের মাধ্যমে সে একটি বড় লাভজনক প্রজেক্ট শুরু করে। এতে বুঝা গেল যে, উক্ত প্রজেক্টের নব্বই শতাংশ ব্যাংকের সাধারণ একাউন্ট হোল্ডারদের (গ্রাহকদের) অর্থ থেকে এবং বাকী মাত্র দশ শতাংশ ঋণগ্রহীতার ব্যক্তিগত মূলধন থেকে সংস্থাপন করা হয়েছে। যদি এই প্রজেক্টে প্রচুর পরিমাণে মুনাফা অর্জিত হয়, তাহলে তার ক্ষুদ্রতম একটি অংশ (যেমন- শতকরা ১৪ বা ১৫ ভাগ) ব্যাংকের মাধ্যমে সাধারণ একাউন্ট হোল্ডারদের কাছে যায়। অবশিষ্ট সমূদয় মুনাফা ঋণগ্রহীতা শিল্পপতি পেয়ে থাকে। অথচ উক্ত প্রজেক্টে শিল্পপতির অংশ ছিল মাত্র শতকরা দশ ভাগ। অতপর যে ১৪-১৫% মুনাফা সাধারণ একাউন্ট হোল্ডারগণ পেয়ে থাকেন, তাও শিল্পপতি সুকৌশলে হস্তগত করে নেন। তা এভাবে যে, শিল্পপতি ব্যাংকের সুদকেও পণ্য উৎপাদনের ব্যয় হিসেবে গণ্য করেন। (ফলে উৎপাদিত পণ্যের দাম বেড়ে যায়) অবশেষে ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, এ কারবারের সমুদয় মুনাফা ঐ সকল লোকদের নিকট পুঞ্জিভূত হয়ে যায়, যাদের মূলধন সমুদয় মূলধনের শতকরা দশভাগের বেশি ছিল না। পক্ষান্তরে যে জনগণ শতকরা নব্বই ভাগ মূলধনের মালিক, তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ ছাড়া আর কিছুই পায় না। এবং পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে তাও তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হয়। অপরদিকে যদি কোন অস্বাভাবিক কারণে শিল্পপতি দেউলিয়া হয়ে যায়, তাহলে তার

লোকসান মাত্র শতকরা দশভাগের বেশি হয় না। আর অবশিষ্ট নব্বই শতাংশ লোকসান পুরোপুরিভাবে ব্যাংক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণ একাউন্ট হোল্ডারদেরকেও বহন করতে হয়। এভাবে সুদি লেনদেনে সাধারণ জনগণ তিলে তিলে শোষিত হয়ে সর্বহারাদের কাতারে এসে দাঁড়ায়, আর শিল্পপতিরা জনগণের টাকা শোষণ করে পুঁজিপতি বনে যায়।

অপরদিকে ইসলামে পুঁজি বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা বিদ্যমান রয়েছে। তা হল- পুঁজি বিনিয়োগকারীদেরকে অবশ্যই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে, তিনি ঋণগ্রহীতার সহায়তার লক্ষ্যে ঋণ প্রদান করছেন নাকি ঋণগ্রহীতার মুনাফায় অংশীদার হতে চাচ্ছেন? যদি সহযোগিতা করাই তার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু দাবী করা যাবে না। কেননা, তার উদ্দেশ্যই হল, ঋণগ্রহীতার সহযোগিতা করা। আর যদি ঋণগ্রহীতার ব্যবসায়িক মুনাফায় অংশীদারিত্ব উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তাকে ঋণগ্রহীতার ব্যবসায়িক লোকসানেও অবশ্যই অংশীদার হতে হবে। সুতরাং মুশারাকা বা অংশীদারী কারবারে ফাইন্যান্সারের মুনাফা ব্যবসায় অর্জিত প্রকৃত লাভের সাথে সম্পৃক্ত। ব্যবসায় মুনাফা যত বেশি হবে, ফাইন্যান্সারের মুনাফার অংশও ততই বৃদ্ধি পাবে। যদি অংশীদারী কারবারে প্রচুর পরিমাণে মুনাফা অর্জিত হয়, তাহলে শিল্পোদ্যক্তাদের এককভাবে তা পুঞ্জিভূত করার সুযোগ থাকে না। বরং ব্যাংকের একাউন্ট হোল্ডার হিসেবে সাধারণ লোকজনও তাতে অংশীদার হয়। এভাবে মুশারাকা পদ্ধতিতে পুঁজিপতিদের তুলনায় সাধারণ জনগণের সহযোগিতার বিষয়ই অগ্রাধিকার পায়।

এ মৌলিক দর্শনের ভিত্তিতেই ইসলাম মুশরাকা বা অংশীদারী কারবারকে সুদি অর্থায়ন (Finance)-এর বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। এ কথা সত্য যে, মুশারাকা বা অংশীদারী কারবারকে ব্যাপক অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে পূর্ণাঙ্গরূপ দেয়ার ক্ষেত্রে বর্তমান যুগে অনেক প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে। কখনো কখনো এ ধারণাও করা হয় যে, মুশারাকা একটি প্রাচীন অর্থায়ন পদ্ধতি। যা গতিশীল লেনদেনের নিত্য-নতুন প্রয়োজন পূরণে সক্ষম নয়। কিন্তু এ জড়বাদী বিষাক্ত ধারণা মুশারাকার শরয়ী মূলনীতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অভাবই জন্ম দিয়েছে। মূলত

ইসলাম মুশারাকা বা অংশীদারী কারবারের কোন ধরাবাঁধা রূপ বা সুনির্দিষ্ট কোন প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে দেয়নি। বরং এমন কিছু মৌলিক নিয়ম-নীতি বর্ণনা করে দিয়েছে, যাতে বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অবলম্বনের সুযোগ রয়েছে। মুশারাকা বা অংশীদারী কারবারের নতুন কোন পদ্ধতি বা কর্মপন্থাকে অতীতকালে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না বলেই অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। কেননা, মুশারাকা বা অংশীদারি কারবারের নিত্য-নতুন পদ্ধতি যদি কুরআন, হাদীস ও ইজমায়ে উম্মতের পরিপন্থি না হয়, তাহলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে। সুতরাং মুশারাকা বা অংশীদারি কারবার শরীয়তসম্মত হওয়ার ক্ষেত্রে আদি ও প্রাকযুগের প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত হওয়া জরুরী নয়।

এ অধ্যায়ে মুশারাকা বা অংশীদারী কারবারের বুনিয়াদী মূলনীতি এবং এর ঐ সকল পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যেসব পদ্ধতি আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও কায়কারবারে অবলম্বন করা যেতে পারে। এ আলোচনার উদ্দেশ্য হল উক্ত মৌলিক নীতিমালার বিরুদ্ধাচরণ না করে মুশারাকা বা অংশীদারী কারবারকে আধুনিক অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়া। ইসলামী ফিক্‌হের গ্রন্থাবলী এবং ঐসব বুনিয়াদী জটিলতাসমূহকে সামনে রেখে মুশারাকার পরিচয় উপস্থাপন করা হয়েছে, যেসব জটিলতা আধুনিক প্রেক্ষাপটে মুশারাকার বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে উদ্ভব হতে পারে। আশা করি এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা মুসলিম ফকীহ এবং অর্থনীতিবিদদের চিন্তা ও গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং সত্যিকার ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালু করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

মুশারাকার স্বরূপ

'মুশারাকা' এমন একটি পরিভাষা যা ইসলামী অর্থায়ন (Modes of Financing)-এর ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইসলামী ফিক্‌হের গ্রন্থাবলীতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত শিরকত পরিভাষার তুলনায় মুশারাকা পরিভাষার ব্যবহার অনেকটা সীমিত। এ উভয়টির মৌলিক ধারণা সুস্পষ্ট করার জন্য প্রথমেই মুশারাকা এবং শিরকত

পরিভাষার বিশদ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন মনে করি, যাতে একটির সাথে অপরটির পার্থক্য বুঝে আসে।

ইসলামী ফিক্হ শাস্ত্রে "শিরকত" অর্থ "অংশীদার হওয়া"। ফিক্হী দৃষ্টিকোণ থেকে শিরকতকে প্রথমে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(১) শিরকাতুল মিল্ক (মালিকানায় অংশীদারিত্ব) ঃ কোন বস্তুতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির যৌথ মালিকানা সাব্যস্ত হওয়াকে শিরকাতুল মিল্ক বলে। এ প্রকারের শিরকত দু'ভাবে হতে পারে।

(ক) কখনো তা অংশীদারদের স্বেচ্ছায় কার্যকর হয়। যেমন- দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রে কোন পণ্যসামগ্রী ক্রয় করল। ক্রয় সূত্রে উক্ত পণ্যে উভয়ের যৌথ মালিকানা সাব্যস্ত হয়। এই যৌথ সম্পদের সূত্রে উভয়ের মাঝে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাকে শিরকাতুল মিল্ক বলে। এখানে উভয়ের মাঝের এ সম্পর্ক তাদের সন্তুষ্টিতে অস্তিত্বে এসেছে। কেননা তারা উভয়ে উক্ত সম্পদকে যৌথভাবে ক্রয় করার পথ গ্রহণ করেছে।

(খ) কখনো অংশীদারদের অনিচ্ছায় অংশীদারিত্ব হয়ে যায়। যেমন- কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীগণ মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদে উত্তরাধিকার সূত্রে মালিকানা লাভ করে। বিনা চুক্তিতে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারীগণ মালিকানা লাভ করে বিধায় একে শিরকাতুল মিল্ক বলে।

(২) শিরকাতুল আক্বদ (চুক্তিভিত্তিক অংশীদারিত্ব) ঃ শিরকাতুল আক্বদ বলতে এমন অংশীদারিত্ব (Partnership) কে বুঝায়, যা পারস্পরিক চুক্তি ও অঙ্গীকারের ভিত্তিতে সংঘটিত হয়। সংক্ষেপে আমরা একে (Joint Commercial Enterprise) বলতে পারি।

শিরকাতুল আক্বদ আবার তিন প্রকার ঃ যথা-

(১) শিরকাতুল আমওয়াল (মূলধনভিত্তিক অংশীদারিত্ব) ঃ যে কারবারে অংশীদারগণ যৌথভাবে পুঁজি বিনিয়োগ করে, তাকে শিরকাতুল আমওয়াল বলে।

(২) শিরকাতুল আ'মাল (শ্রমভিত্তিক অংশীদারিত্ব) ঃ যে কারবারে অংশীদারগণ যৌথভাবে গ্রাহকদেরকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং গ্রাহক থেকে অর্জিত পারিশ্রমিক পূর্ব নির্ধারিত হারে পরস্পরের মাঝে বণ্টিত হয়, তাকে শিরকাতুল আ'মাল বলে। যেমন- দু'জন দর্জি এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হল যে, তারা উভয়ে গ্রাহকদেরকে সেলাই সংক্রান্ত সেবা প্রদান করবে এবং তারা এ শর্তেও একমত হলো যে, এভাবে অর্জিত মজুরী এক যৌথ খাতে জমা হতে থাকবে। অতঃপর পরিশ্রম সমান বা কমবেশির প্রতি লক্ষ্য না রেখে তা উভয়ের মাঝে সমহারে বণ্টন হবে। এরূপ চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ করাকে শিরকাতুল আ'মাল বলে। এ পদ্ধতিকে শিরকাতুত্ তাকাব্বুল (কাজ সংগ্রহভিত্তিক অংশীদারিত্ব), শিরকাতুস্ সানাই (পেশাভিত্তিক অংশীদারিত্ব) এবং শিরকাতুল্ আব্দান (শারীরিক শ্রমভিত্তিক অংশীদারিত্ব)ও বলে।

(৩) শিরকাতুল ওজূহ (সুনামভিত্তিক অংশীদারিত্ব) ঃ যে কারবারে অংশীদারগণ পুঁজি বিনিয়োগ করে না, বরং স্বীয় পরিচিতি ও বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে ব্যবসা পণ্য বাকিতে ক্রয় করে নগদ বিক্রি করে, এতে যে লাভ হয় তা পূর্ব নির্ধারিত হারে অংশীদারগণ বণ্টন করে নেয়। অংশীদারিত্বের এ তিনটি পদ্ধতিকে ইসলামী ফিক্হের পরিভাষায় "শিরকত" বলা হয়। কিন্তু "মুশারাকা" পরিভাষাটি ফিক্হের গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায় না। এ পরিভাষাটি বর্তমান যুগের ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতির উপর গ্রন্থরচনাকারীদের মাধ্যমে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এ পরিভাষাটি সাধারণত শিরকতের ঐ বিশেষ প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, যাকে শিরকাতুল আমওয়াল বা মূলধনভিত্তিক অংশীদারিত্ব বলা হয়। যে কারবারে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যৌথভাবে নিজ নিজ পুঁজি সরবরাহ করে। এছাড়া কখনো কখনো মুশারাকা পরিভাষাটি শিরকাতুল আ'মালকেও বুঝায়, যখন অংশীদারিত্ব সেবামূলক (Services) কারবারে সংঘটিত হয়।

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা পরিষ্কার প্রতিভাত হয়েছে, যে অর্থে বর্তমান যুগে মুশারাকা পরিভাষাটি ব্যবহার হয়ে থাকে, শিরকত পরিভাষাটি তার চেয়ে ব্যাপক অর্থবোধক। মুশারাকা দ্বারা শুধুমাত্র শিরকাতুল আমওয়াল

(মূলধনভিত্তিক অংশীদারিত্ব)কেই বুঝানো হয়। অপরদিকে শিরকত শব্দে মালিকানায় অংশীদারিত্ব এবং অন্যান্য সকল প্রকারের অংশীদারিত্বই অন্তর্ভুক্ত।

এক নং চিত্রে 'শিরকত'-এর বিভিন্ন প্রকার এবং আধুনিক পরিভাষায় পরিচিত 'মুশারাকার' প্রকারসমূহ বুঝা যাবে।

যেহেতু 'মুশারাকা' আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে বেশি সম্পৃক্ত এবং শিরকাতুল আমওয়ালের প্রায় সদৃশ্য। তাই এ পর্যায়ে আমাদের আলোচনা সেদিকে নিবদ্ধ করব। প্রথমে শিরকাতুল আমওয়ালের ব্যাখ্যা অতঃপর আধুনিক ফিন্যান্সিং-এর ক্ষেত্রে এর প্রয়োগের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।
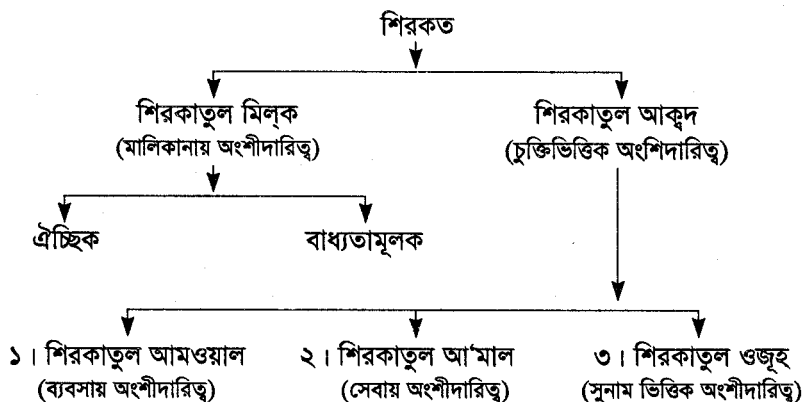
মুশারাকার মৌলিক বিধি-বিধান

(১) 'মুশারাকা' বা 'শিরকাতুল আমওয়াল' এমন এক সম্পর্ক যা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং

যেকোন চুক্তি সঠিক ও শুদ্ধ হওয়ার অপরিহার্য শর্তাবলী এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, বিধায় তা এখানে বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। যেমন- উভয়পক্ষের মধ্যে চুক্তির যোগ্যতা থাকা। (অর্থাৎ, কেউ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও উম্মাদ ইত্যাদি না হওয়া) এ চুক্তি যেকোন ধরনের চাপ, ধোঁকা-প্রতারণা ও ভুল বর্ণনা ব্যতীত উভয় পক্ষের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া, ইত্যাদি, ইত্যাদি। তবে এমন কিছু আনুষঙ্গিক বিষয় রয়েছে, যা শুধুমাত্র 'মুশারাকা' চুক্তির সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। সে বিষয়গুলো সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো।

মুনাফা বণ্টন

(২) অংশীদারদের মাঝে লভ্যাংশ বণ্টনের হার চুক্তি বাস্তবায়নের সময়ই নির্ধারণ করে নিতে হবে। এভাবে লভ্যাংশ বণ্টনের হার নির্ধারণ করা না হলে অংশীদারী কারবারের চুক্তি শরীয়ত সম্মত হবে না।

(৩) প্রত্যেক অংশীদারের মুনাফা বণ্টনের হার প্রকৃত মুনাফার ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে হবে। তার পক্ষ থেকে প্রদত্ত পুঁজির ভিত্তিতে নির্ধারণ করা যাবে না। কোন অংশীদারের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ বা বিনিয়োগকৃত পুঁজির বিনিময়ে নির্ধারিত কোন অংক ধার্য করা বৈধ নয়। (অর্থাৎ- কোন অংশীদারের লভ্যাংশ বণ্টনের হার প্রকৃত লাভের শতকরার ভিত্তিতে নির্ধারণ না করে তার বিনিয়োগকৃত পুঁজির এত শতাংশ লাভ পাবে এরূপ নির্ধারণ করা বৈধ নয়)।

যেমন- 'ক' এবং 'খ' তাদের একটি অংশীদারী কারবারে লভ্যাংশ বণ্টনের হার এভাবে নির্ধারণ করল যে, 'ক' নিজের অংশ হিসেবে প্রতিমাসে লভ্যাংশের দশ হাজার টাকা নিবে। অবশিষ্ট মুনাফা 'খ' গ্রহণ করবে। এ ধরনের অংশীদারিত্ব শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক হবে না। তেমনিভাবে যদি এরূপ চুক্তি করা হয় যে, 'ক' লাভ হিসেবে তার মূলধনের শতকরা পনের ভাগ নিবে, এ ধরণের চুক্তিও বৈধ হবে না। লভ্যাংশ বণ্টনের সঠিক বিধান হল, ব্যবসায় অর্জিত প্রকৃত মুনাফা শতকরার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা।

যদি কোন অংশীদারের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ বা তার মূলধনের বিনিময়ে শতকরা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তাহলে চুক্তিনামায় এ বিষয়টিও অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকতে হবে যে, অংশীদারকে প্রদত্ত এ টাকা চুক্তির মেয়াদান্তে সর্বশেষ যে হিসাব-নিকাশ করা হবে তার অধীনে থাকবে। অর্থাৎ, যেকোন অংশীদার যত টাকা নিবে তার সাথে Payment of Account-এর হিসাব-নিকাশ করা হবে। এ টাকা চুক্তির মেয়াদান্তে উক্ত অংশীদারের প্রাপ্য লভ্যাংশের সাথে সংযুক্ত করা হবে। আর যদি ব্যবসায় আদৌ কোন লাভই না হয়ে থাকে বা আশাতীত লাভের তুলনায় কম হয়, তাহলে উক্ত অংশীদার যে পরিমাণ টাকা নিয়েছিল তা ফেরৎ দিতে হবে।

মুনাফার হার

(৪) মুনাফার হার অংশীদারদের বিনিয়োগকৃত পুঁজির পরিমাণ অনুপাতে হওয়া আবশ্যক কি না? এ প্রশ্নের ব্যাপারে মুসলিম ফিক্‌হবিদদের মধ্যে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়।

ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে প্রত্যেক অংশীদারকে তার বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ অনুপাতে লাভ প্রদান করা 'মুশারাকা' যথার্থ ও বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত। অতএব 'ক' যদি মোট মূলধনের ৪০% বিনিয়োগ করে তাহলে সে লভ্যাংশের ৪০%ই পাবে। সুতরাং লভ্যাংশের ৪০% অপেক্ষা কম বা বেশি নির্ধারণ করে কোন চুক্তি করা হলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে না।

অপরদিকে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতে অংশীদারদের পারস্পরিক আলোচনা সাপেক্ষে লভ্যাংশের হার বিনিয়োগকৃত পুঁজির অনুপাত অপেক্ষা কম বা বেশি হতে পারবে। সুতরাং ৪০% বিনিয়োগকারীর জন্য লাভের ৬০-৭০% এবং ৬০% বিনিয়োগকারীর জন্য শুধুমাত্র ৩০-৪০% গ্রহণ করা বৈধ হবে।[১]

---

১. ইব্‌ন কুদামা, আল-মুগনী, ৫/১৪০, দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরুত, ১৯৭২।

তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কর্তৃক, তিনি উল্লেখিত দৃষ্টিভঙ্গিদ্বয় সমন্বয় করে বলেন, সাধারণ অবস্থায় লভ্যাংশের হার বিনিয়োগকৃত পুঁজির অনুপাত অপেক্ষা কম বা বেশি হতে পারবে। কিন্তু কোন অংশীদার যদি চুক্তিপত্রে এ মর্মে সুস্পষ্ট শর্তারোপ করে যে, সে কখনো সক্রিয়ভাবে ব্যবসায় অংশ গ্রহণ করবে না, বরং মুশারাকার পুরো মেয়াদে সে নিষ্ক্রিয় অংশীদার (Sleeping partner) হিসেবে থাকবে। এমতাবস্থায় তার লভ্যাংশের হার বিনিয়োগকৃত পুঁজির অনুপাত অপেক্ষা বেশি হতে পারবে না।[১]

লোকসানে অংশীদারিত্ব

লভ্যাংশ বণ্টনের ক্ষেত্রে ফিক্হবিদদের মাঝে মতানৈক্য থাকলেও লোকসানের ক্ষেত্রে সকল ইসলামী আইনবেত্তা এ ব্যাপারে একমত যে, প্রত্যেক অংশীদার তার বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ অনুপাতে লোকসান বহন করবে। সুতরাং যে অংশীদার শতকরা ৪০ ভাগ পুঁজি বিনিয়োগ করবে, সে লোকসানের ৪০%ই বহন করবে। কমবেশি বহন করবে না। এর পরিপন্থি যে কোন শর্ত করা হলে তা চুক্তিকে অকার্যকর করে দিবে। এ মূলনীতির ব্যাপারে (লোকসান পুঁজির পরিমাণ অনুপাতে বহন করতে হবে) সকল ফকীহ্দের ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[২]

উল্লেখিত আলোচনার সারমর্ম হল- ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে প্রত্যেক অংশীদারের লাভ ও লোকসান উভয়টিই তার পুঁজির পরিমাণ অনুপাতে হতে হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতে অংশীদারদের মধ্যকার সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে লভ্যাংশের হার পুঁজির অনুপাত অপেক্ষা কম বা বেশি হতে পারবে। কিন্তু লোকসানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক অংশীদার তাদের বিনিয়োগকৃত পুঁজির পরিমাণ অনুপাতে লোকসান বহন করতে হবে।

---

১. আল-কাসানী, বাদায়িউস সানা'য়ি, ৬/১৬২-১৬৩।
২. ইব্ন কুদামা, আল-মুগনী, ৫/১৪৭।

এ নীতিমালাকে একটি প্রসিদ্ধ ফিক্হী সূত্রে (Maxim) এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে- الـــربح علـــى مـــا اصطلحا عليه والوضيعة على قدر المال "লাভ পাবে উভয়ের মাঝে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী এবং লোকসান হবে বিনিয়োগকৃত মূলধন অনুপাতে।"

মূলধন বা পুঁজির ধরন

অধিকাংশ ফিক্হবিদ এ মত পোষণ করেন যে, প্রত্যেক অংশীদারের বিনিয়োগকৃত পুঁজি-মূলধন তরল [তথা সহজে অর্থে রূপান্তরযোগ্য (Liquid)] প্রকৃতির হতে হবে। অর্থাৎ- 'মুশারাকা' বা অংশীদারী চুক্তি কেবলমাত্র নগদ অর্থে (Money) হতে পারে; পণ্য বা দ্রব্যে নয়। এতদসত্ত্বেও এ বিষয়ে ফিক্হবিদদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

(১) ইমাম মালেক (রহ.)-এর নিকট 'মুশারাকা' বা অংশীদারী কারবার বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য মূলধন তরল প্রকৃতির হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং যে কোন অংশীদার অংশীদারী কারবারে দ্রব্যগত প্রকৃতির মূলধনও বিনিয়োগ করতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে উক্ত অংশীদারের অংশের মূল্য চুক্তি সম্পাদনের তারিখের প্রচলিত বাজারদর অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। কোন কোন হাম্বলী ফিক্হবিদও এ মত গ্রহণ করেছেন।

(২) ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মত হলো, কোন অংশীদারের অংশ দ্রব্যগত প্রকৃতির মূলধন হতে পারবে না। দু'টো কারণে তারা এ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন।

প্রথমত, তাঁরা বলেন যে, প্রত্যেক অংশীদারের দ্রব্য অপর অংশীদারের দ্রব্য থেকে সর্বদা পৃথক ও ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের হয়ে থাকে। যেমন- 'ক' যদি একটি গাড়ি ব্যবসায় বিনিয়োগ করে এবং 'খ'ও আরেকটি গাড়ি ব্যবসায় বিনিয়োগ করে, এমতাবস্থায় এ দু'টো গাড়ির প্রত্যেকটি তাদের ব্যক্তি মালিকানায়। এখন যদি 'ক' এর গাড়ি বিক্রি করে দেয়া হয়, তাহলে এ বিক্রির সকল দায়-দায়িত্ব অবশ্যই 'ক'-এর উপর বর্তাবে। 'ক'-এর বিক্রিত গাড়ির মূল্যে 'খ' এর কোন দাবী করার অধিকার নেই।

অতএব, যেহেতু প্রত্যেক অংশীদারের সম্পদ অন্য অংশীদারের সম্পদ থেকে স্বতন্ত্র, তাই এ কারবারে কোন অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। পক্ষান্তরে যদি প্রত্যেক অংশীদারের বিনিয়োগকৃত পুঁজি তরল প্রকৃতির (মুদ্রায়) হয়, তাহলে কোন অংশীদারের পুঁজি অপরের পুঁজি থেকে পৃথক করা যায় না। কেননা, মুদ্রা (টাকা-পয়সা) নির্দিষ্ট করা দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না। সুতরাং তারা একটি (Common pool) যৌথ একাউন্ট গঠন করেছেন বলে ধরে নেয়া হবে এবং এভাবে অংশীদারিত্ব অস্তিত্ব লাভ করবে।[১]

দ্বিতীয়ত, 'মুশারাকা' বা অংশীদারী চুক্তিতে কোন কোন সময় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অংশীদারগণকে তাদের প্রত্যেকের অংশ পুনর্বণ্টন করতে হয়। সেক্ষেত্রে বিনিয়োগকৃত পুঁজি তরল না হয়ে দ্রব্যের আকৃতিতে হলে, তা বিক্রি করা ব্যতীত অংশীদারদের মাঝে পুনর্বণ্টন করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় যদি দ্রব্যের বিক্রিত মূল্যের ভিত্তিতে পুঁজি পুনর্বণ্টন করা হয়, তাহলে এমনও হতে পারে, কোন কোন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, এক অংশীদার তার বিনিয়োগকৃত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসার সমুদয় লাভ পেয়ে যাবেন, আর অপর অংশীদারগণ বঞ্চিত হবেন; কিছুই পাবেন না। অপরদিকে যদি উক্ত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পায়, তাহলে এ আশংকা রয়েছে যে, এ অংশীদার তার বিনিয়োগকৃত মূলধন ছাড়াও অন্য অংশীদারের বিনিয়োগকৃত দ্রব্যের প্রকৃত মূল্যের কিছু অংশও হস্তগত করে নিবেন।[২]

(৩) ইমাম শাফেয়ী (রহ.) উল্লেখিত দু'টি মতের মাঝামাঝি আরেকটি মত গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, দ্রব্য দুই প্রকার। (১) সমতুল্য বস্তু ঃ অর্থাৎ- যে দ্রব্য নষ্ট হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ এমন জিনিস দ্বারা দেয়া যায়, যা গুণাগুণ এবং পরিমাণের দিক থেকে নষ্ট দ্রব্যের সমতুল্য হয়। যেমন গম, চাউল ইত্যাদি। যদি একশ কেজি গম নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে গুণগত দিক থেকে নষ্ট গমের পরিবর্তে আরেকশ' কেজি গম অনায়াসেই দেয়া যায়।

---

১. আল-কাসানী, বাদায়েউস সানায়ি, ৬/৫৯।

২. প্রাগুক্ত, ১২৫।

(২) মূল্যনির্ভর বস্তু ঃ অর্থাৎ- যে দ্রব্য নষ্ট হয়ে গেলে ঐ জাতীয় দ্রব্য দ্বারা এর ক্ষতিপূরণ দেয়া যায় না। যেমন প্রাণী, জীব-জন্তু। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিটি ছাগলের নিজস্ব বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে, যা অপর ছাগলের মধ্যে পাওয়া যায়না। এ কারণে যদি কোন ব্যক্তি কারো ছাগলকে হত্যা করে, তাহলে সমতুল্য ছাগল দিয়ে উক্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে না। বরং এস্থলে ছাগলের বাজার মূল্য দিয়ে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

এখন ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, প্রথম প্রকারের দ্রব্য (অর্থাৎ সমতুল্য বস্তু)কে 'মুশারাকা'য় পুঁজির অংশ হিসেবে গণ্য করা যাবে। তবে দ্বিতীয় প্রকারের দ্রব্য (অর্থাৎ মূল্যনির্ভর বস্তু)কে পুঁজির অংশ হিসেবে গণ্য করা যাবেনা।[১]

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) দ্রব্যকে দু'ভাগে, তথা সমতুল্য বস্তু ও মূল্যনির্ভর বস্তুতে বিভক্ত করে ইমাম আহমাদ (রহ.) কর্তৃক দ্রব্যগত মূলধন দ্বারা অংশীদারিত্বের উপর উত্থাপিত দ্বিতীয় অভিযোগ নিরসন করে দিয়েছেন। কেননা, পুঁজি সমতুল্য বস্তুর ক্ষেত্রে প্রত্যেক অংশীদারকে তার বিনিয়োগকৃত দ্রব্যের সমতুল্য বস্তু ফেরৎ দেয়ার মাধ্যমে পুনর্বণ্টন সম্ভব। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর পক্ষ থেকে প্রথম অভিযোগের কোন জবাব দেয়া হয়নি। এই অভিযোগ নিরসনে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন, সমতুল্য বস্তু পুঁজি হিসেবে ঐ ক্ষেত্রে পরিগণিত হতে পারে, যে ক্ষেত্রে প্রত্যেক অংশীদারের প্রদত্ত দ্রব্য অপরের অংশের সাথে এমনভাবে মিশ্রিত করা যাবে যে, এক অংশীদারের দ্রব্য অপর অংশীদারের দ্রব্য থেকে পৃথক করা যায় না।[২]

মূল কথা হল, যদি কোন অংশীদার মুশারাকা কারবারে দ্রব্যগত মূলধন দিয়ে অংশীদার হতে চায়, তবে ইমাম মালেক (রহ.)-এর মত অনুযায়ী তিনি বিনা প্রতিবন্ধকতায় অংশীদার হতে পারবেন। তবে উক্ত অংশীদারের অংশের মূল্য অংশীদারিত্ব চুক্তি সম্পাদনের তারিখে দ্রব্যের বাজার মূল্য

---

১. ইব্‌ন কুদামা, আল-মুগনী, ৫/১২৪-১২৫।

২. থানভী (রহঃ), ইমদাদুল ফাতওয়া।

অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে দ্রব্যগত মূলধনের প্রথম প্রকার তথা সমতুল্য বস্তুকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে, কিন্তু মূল্যনির্ভর বস্তুকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে দ্রব্য যদি সমতুল্য বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে তা পুঁজির অংশ ঐ ক্ষেত্রে হতে পারবে, যে ক্ষেত্রে প্রত্যেক অংশীদারের দ্রব্য অপরের দ্রব্যের সাথে মিশ্রণ করা যাবে। আর যদি দ্রব্য মূল্যনির্ভর বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে তা মুশারাকায় পুঁজির অংশ হতে পারবে না।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইমাম মালেক (রহ.)-এর মত অধিক সহজ এবং যুক্তিসঙ্গত মনে হয় এবং তা আধুনিক ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজন পূরণ করে। তাই এর উপর আমল করা যেতে পারে।[১]

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, মুশারাকার মূলধন নগদেও হতে পারে এবং দ্রব্যের আকারেও হতে পারে। তবে দ্রব্যের ক্ষেত্রে দ্রব্যের বাজার দর অনুযায়ী মূলধনে অংশীদারের অংশ নির্ধারণ করা হবে।

মুশারাকার ব্যবস্থাপনা

মুশারাকার (অংশীদারী কারবার) সাধারণ নিয়ম-নীতি হল, প্রত্যেক অংশীদার-এর (Management) ব্যবস্থাপনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এবং কাজ করার অধিকার রাখে। তবে অংশীদারগণ এ শর্তেও একমত হতে পারে যে, তাদের মধ্য থেকে যে কোন একজনের উপর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকবে, অপর কোন অংশীদার মুশারাকার জন্য কাজ করবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় অংশীদারগণ (Sleeping partner) তাদের বিনিয়োগকৃত পুঁজির অনুপাত অপেক্ষা অধিক লাভ পাবে না, বরং পুঁজির পরিমাণ অনুপাতে পাবে। যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

১. ইব্‌ন কুদামা, আল-মুগনী, ৫/১২৪-১২৫।

যদি সকল অংশীদার যৌথ কারবার ব্যবস্থাপনায় সক্রিয়ভাবে কাজ করতে একমত হয়, তবে ব্যবসার সকল বিষয়ে তাদের প্রত্যেকেই একে অপরের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হবে এবং ব্যবসার সাধারণ অবস্থায় অংশীদারদের যে কেউ যে কোন কাজ করবে, তার ব্যাপারে এ কথা ধরে নেওয়া হবে যে, অন্য অংশীদারগণও তাতে অনুমতি দিয়েছে।

মুশারাকা (অংশীদারী কারবার) বিলুপ্ত করা

নিম্নোল্লেখিত যে কোন অবস্থায় মুশারাকা কারবার বিলুপ্ত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

(১) প্রত্যেক অংশীদারের যে কোন সময় অপর অংশীদারকে নোটিশ প্রদান করে মুশারাকা বিলুপ্ত করার অধিকার রয়েছে। এ ধরণের নোটিশের মাধ্যমে মুশারাকা কারবার বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

এক্ষেত্রে মুশারাকার সমুদয় সম্পদ যদি নগদ তরল আকৃতির হয়, তাহলে তা অংশীদারদের মাঝে তাদের অংশ অনুপাতে বণ্টন করা হবে। আর সম্পদ যদি তরল প্রকৃতির না হয়, তাহলে অংশীদারগণ দু'টি পদ্ধতির যে কোন একটি অবলম্বন করতে পারে। হয়ত দ্রব্যগত সম্পদকে তারল্য করে (অর্থাৎ- বিক্রি করে মুদ্রায় রূপান্তরিত করে) অথবা দ্রব্যগত সম্পদকেই পরস্পরে বণ্টন করে নিবে। যদি এ ব্যাপারে অংশীদারদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়, যেমন- কোন অংশীদার সমুদয় সম্পদকে তরল আকৃতিতে (Liquidation) রূপান্তরিত করতে চায়, অপরদিকে অন্য অংশীদার হুবহু দ্রব্যগত সম্পদকেই বন্টন করতে চায়, তাহলে শেষোক্ত (দ্রব্যগত সম্পদ বন্টনের) দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রাধান্য দেয়া হবে। কেননা, মুশারাকা বিলুপ্তির পর সমুদয় সম্পদে অংশীদারদের যৌথ মালিকানা থাকে। আর যৌথ মালিকানাধীন সম্পদের ব্যাপারে প্রত্যেক অংশীদারের জন্য ঐ দ্রব্যটি হুবহু বণ্টন বা স্বীয় অংশ পৃথকের দাবী করার অধিকার রয়েছে। কেউ তাকে তারল্য (Liquidation) করার প্রতি চাপ প্রয়োগ

করতে পারে না। তবে সম্পদ যদি এমন হয়, যে গুলোকে পৃথক করে বণ্টন করা যায় না, যেমন- মেশিনারী দ্রব্য। সে ক্ষেত্রে ঐ সম্পদকে বিক্রি করে বিক্রিলব্ধ অর্থ অংশীদারদের মাঝে বণ্টন করা হবে।[১]

(২) মুশারাকা চলাকালীন যদি কোন অংশীদারের মৃত্যু হয়, তাহলে মৃত ব্যক্তির অংশীদারিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে মৃতের উত্তরাধিকারীগণ ইচ্ছা করলে তার অংশীদারিত্ব উঠিয়ে নিতে পারবে, অথবা মুশারাকা চুক্তি অব্যাহত রাখতে পারবে।

(৩) অংশীদারদের কেউ যদি পাগল বা উম্মাদ হয়ে যায়, কিংবা কোন কারণে ব্যবসায়িক চুক্তির যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে, তাহলে মুশারাকা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

ব্যবসা বিলুপ্ত না করে মুশারাকা বিলুপ্ত করা

যদি কোন অংশীদার মুশারাকা বিলুপ্ত করতে চায়, অপরদিকে অন্য অংশীদার বা অংশীদারগণ ব্যবসা অব্যাহত রাখতে চায়, তাহলে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে তা করা যেতে পারে। যে সকল অংশীদার ব্যবসা অব্যাহত রাখতে ইচ্ছুক, তারা বিলুপ্তকারী অংশীদারের অংশ ক্রয় করে নিবে। কেননা, কোন অংশীদারের মুশারাকা বিলুপ্তি করার অর্থ এটা নয় যে, এই মুশারাকা কারবার অন্যান্য অংশীদারের সাথেও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।[২]

এরূপ ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব বিলুপ্তকারীর অংশের মূল্য পারস্পরিক আলোচনা ও সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারণ করা জরুরী। যদি উক্ত অংশীদারের মূল্য নির্ধারণে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং অংশীদারদের সর্বসম্মতিক্রমে কোন মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে মুশারাকা প্রত্যাহারকারী অংশীদার স্বয়ং ব্যবসার পণ্যসামগ্রী (যেভাবে আছে

১. ইব্‌ন কুদামা, আল-মুগনী, ৫/১৩৩-১৩৪।
২. প্রাগুক্ত।

সেভাবেই) বণ্টন করে; অথবা পণ্যসামগ্রী বিক্রি করত তারল্যে রূপান্তরিত করে তার অংশ নিয়ে অন্যান্য অংশীদার থেকে পৃথক হয়ে যেতে পারবে।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, মুশারাকায় চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে অংশীদারগণ এ শর্তারোপ করতে পারবে কি না যে, সকল অংশীদার বা অধিকাংশ অংশীদারের সম্মতি ব্যতীত ব্যবসার সম্পদ বন্টন কিংবা তরল আকৃতিতে রূপান্তরিত করা যাবে না এবং কোন একক অংশীদার অংশীদারিত্ব থেকে পৃথক হতে চাইলে তার অংশ অন্য অংশীদারের নিকট বিক্রি করে দিতে হবে। ব্যবসার সম্পদ বণ্টন বা তরল আকৃতিতে রূপান্তরিত করার জন্য তিনি অন্যান্য অংশীদারকে বাধ্য করতে পারবেন না।

ইসলামী ফিক্‌হের গ্রন্থাবলীতে এ প্রশ্নের ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে বাহ্যিকভাবে শরীয়তের দৃষ্টিতে এতে কোন অসুবিধা নেই। বরং অংশীদারগণ মুশারাকা চুক্তির শুরু লগ্নে এ ধরনের শর্তে আবদ্ধ হতে পারবে। কোন কোন হাম্বলী ফকীহগণ এ ধরনের শর্তে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট অনুমতি দিয়েছেন।[১]

এই নতুন শর্তটি বিশেষত আধুনিক প্রেক্ষাপটে ন্যায়সঙ্গত বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা, বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবসায় সফলতার জন্য অংশীদারিত্ব অব্যাহত রাখার দাবী করে। শুধুমাত্র একজন অংশীদারের দাবীর প্রেক্ষিতে ব্যবসার সম্পদ তরল আকৃতিতে রূপান্তর বা বণ্টন করার দ্বারা অন্য অংশীদারদের অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়ে যেতে পারে।

একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে যদি কোন ব্যবসা শুরু করা হয় এবং প্রকল্পের শৈশবকালেই অংশীদারদের কোন একজন সম্পদের তারল্য চায়, তাহলে এ ক্ষেত্রে তাকে বিনা কারণে সম্পদের তারল্য বা বণ্টনের স্বাধীনতা প্রদান করা অন্য অংশীদারদের উন্নয়নের জন্য এমনিভাবে মারাত্মক ক্ষতি হবে যেমনিভাবে সমাজের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য ক্ষতিকারক হয়। তাই এ ধরনের শর্ত ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হয়। এধরনের শর্তারোপের সমর্থনে একটি মূলনীতিও রয়েছে,

---

১. ইব্‌ন কুদামা, আল-মুগনী, ৫/১৩৩-১৩৪।

যে মূলনীতিটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে বর্ণনা করেছেন-

المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما او حرما حلالا

"মুসলমানদের যাবতীয় বিষয় তাদের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে আরোপিত শর্ত অনুযায়ীই হয়ে থাকে, তবে সে শর্ত ব্যতীত যা হালালকে হারাম করে বা হারামকে হালাল করে।" (আবু দাঊদ, হাদীস নং-৩৫৫৫)[১]

এ যাবৎ "শিরকাতুল আমওয়াল" বা "মুশারাকা"-এর মৌলিক ও প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে মুশারাকার এমন কিছু মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই, যা বর্তমান যুগের বৈধ পন্থায় আধুনিক অর্থায়ন পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে এ আলোচনাটি "মুদারাবা" (Mudarabah)-এর প্রাথমিক আলোচনার পর করা অধিক যৌক্তিক মনে করি। যা (মুদারাবা) লভ্যাংশে অংশীদারিত্বের আরেকটি প্রধান ও আদর্শিক অর্থায়ন পদ্ধতি। যেহেতু মুশারাকা এবং মুদারাবা পদ্ধতিতে অর্থায়নের বিধি-বিধান একই ধরণের এবং বাস্তব প্রয়োগের মূলনীতির দিক দিয়েও উভয়ে সম্পর্কযুক্ত, তাই 'মুশারাকার' বাস্তব প্রয়োগের মূলনীতির আলোচনার পূর্বে 'মুদারাবার' অর্থায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা অধিক উপকারী মনে করি।

---

১. ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, ২/৩৩৫-৩৩৬।

মুদারাবা
(Mudarabah)

"মুদারাবা" অংশীদারিত্বের একটি বিশেষ পদ্ধতি। যে অংশীদারিত্বে এক শরীক অপরকে ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য অর্থ সরবরাহ করে। পুঁজি বিনিয়োগ করে প্রথম পক্ষ, তাকে বলা হয় "রাব্বুলমাল" বা "পুঁজি বিনিয়োগকারী" অপরদিকে ব্যবসার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা (Management) এবং কাজের দায়িত্ব দ্বিতীয় পক্ষের উপর, যাকে বলা হয় "মুদারিব" বা "কারবারি"।

মুশারাকা এবং মুদারাবার মাঝে পার্থক্য নিম্ন-বর্ণিত দিকগুলোতে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা যায়।

(১) মুশারাকায় পুঁজি উভয়পক্ষ থেকে সরবরাহ করা হয়। কিন্তু মুদারাবায় পুঁজি বিনিয়োগের দায়িত্ব শুধু রাব্বুল মালের উপর।

(২) মুশারাকায় সকল অংশীদারগণ ব্যবসার জন্য কাজ করতে পারে এবং ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় (Management) সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু মুদারাবায় রাব্বুলমাল ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণের কোন অধিকার রাখেনা, বরং তা শুধুমাত্র মুদারিবই আঞ্জাম দিবে।

(৩) মুশারাকায় সকল অংশীদার স্বীয় পুঁজির পরিমাণ অনুপাতে লোকসানে অংশীদার হয়। কিন্তু মুদারাবায় যদি লোকসান হয়, তাহলে তা শুধুমাত্র রাব্বুলমালকেই বহন করতে হবে। কেননা, মুদারিবতো কোন মূলধনই বিনিয়োগ করে না। তার লোকসান শুধুমাত্র এতটুকু যে, শ্রম বিফলে গেল এবং কোন পারিশ্রমিক পেল না।

তবে এই নীতিমালা এ শর্তের সাথে সম্পৃক্ত যে, মুদারিবকে এমন পূর্ণ সতর্কতা এবং দায়িত্বের সাথে কাজ করতে হবে যা সাধারণত ঐ জাতীয় ব্যবসার জন্য জরুরী মনে করা হয়। কিন্তু মুদারিব যদি উদাসীনতা এবং বেপরওয়ার হয়ে কাজ করে বা নীতিবিরোধী কোন আচরণ করে, তাহলে বেপরওয়া এবং অসতর্কতার কারণে ব্যবসায় যে লোকসান হবে তা মুদারিবকে বহন করতে হবে।

(৪) মুশারাকায় সাধারণত অংশীদারদের দায়িত্ব (স্বীয় অংশের সাথে) সীমাবদ্ধ থাকে না। সুতরাং ব্যবসার দায়িত্ব (ঋণ) যদি তার সম্পদের তুলনায় বেশী হয়ে যায় এবং পর্যায়ক্রমে ব্যবসার পণ্যসামগ্রী তারল্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়, তাহলে সম্পদ অপেক্ষা অতিরিক্ত দায়িত্ব (ঋণ) অংশীদারগণকে স্বীয় অংশ অনুপাতে বহন করতে হবে। তবে সকল অংশীদার যদি এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, কোন অংশীদার ব্যবসা চলাকালীন সময়ে কোন ঋণ গ্রহণ করবে না, তাহলে এক্ষেত্রে অতিরিক্ত দায়িত্ব (ঋণ) শুধুমাত্র সেই অংশীদারকেই বহন করতে হবে যিনি উল্লেখিত শর্ত লংঘন করে ব্যবসায় ঋণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু মুদারাবায় ব্যাপারটি ভিন্ন ধরনের। মুদারাবায় রাব্বুলমালের দায়িত্ব তার বিনিয়োগকৃত পুঁজির পরিমাণের সাথে সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে রাব্বুলমাল যদি মুদারিবকে তার (রাব্বুলমালের) পক্ষ থেকে ঋণ গ্রহণের অনুমতি দিয়ে থাকে। (তাহলে অতিরিক্ত ঋণের দায়িত্ব রাব্বুলমালকে বহন করতে হবে)।

(৫) মুশারাকায় যখনই অংশীদারগণ স্বীয় পুঁজি মিশ্রণ করে নিবে, তখনই মুশারাকার সমুদয় সম্পদে অংশীদারদের অংশ অনুপাতে তাদের যৌথ মালিকানা হয়ে যাবে। (এবং প্রত্যেকেই সম্পদের প্রত্যেক অংশের মালিক হয়ে যাবে)। ফলে অংশীদারদের প্রত্যেকেই উক্ত সম্পদের মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে লাভবান হতে থাকবে, যদিও তা বিক্রি করে লাভবান হয়নি।

কিন্তু মুদারাবার অবস্থা ভিন্নরূপ। মুদারাবায় ক্রয়কৃত সমুদয় সম্পদের মালিক হয় শুধুমাত্র রাব্বুল্‌মাল। মুদারিব শুধুমাত্র উক্ত সম্পদ লাভে বিক্রি

করার ক্ষেত্রে লভ্যাংশ থেকে স্বীয় অংশ গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং মুদারিব সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি হলেও তাতে স্বীয় অংশের দাবী করার অধিকার রাখে না।

মুদারাবা ব্যবসা

রাব্বুলমাল মুদারিবকে বিশেষ ধরনের ব্যবসা করা নির্দিষ্ট করে দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে মুদারিবকে শুধুমাত্র রাব্বুলমালের নির্দেশ মুতাবেক ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। এ ধরনের মুদারাবাকে 'মুদারাবা মুক্বাইয়াদা' বলা হয়। পক্ষান্তরে রাব্বুলমাল যদি মুদারিবকে যে কোন ধরনের ব্যবসা করার স্বাধীনতা প্রদান করে, তাহলে মুদারিব ইচ্ছানুযায়ী যে কোন ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করতে পারবে। এ ধরনের মুদারাবাকে 'মুদারাবা মুত্বলাকা' বলা হয়।

একজন রাব্বুল্মাল একই চুক্তিতে একাধিক ব্যক্তির সাথে মুদারাবার চুক্তি করতে পারে। অর্থাৎ, রাব্বুলমাল তার পুঁজি 'ক' এবং 'খ' উভয়কে (যৌথভাবে) প্রদান করতে পারে। সুতরাং তাদের প্রত্যেকেই রাব্বুলমালের জন্য মুদারিব হিসেবে কাজ করতে পারবে এবং মুদারাবার মূলধন উভয়ে যৌথভাবে ব্যবহার করবে, মুদারিবের অংশ তাদের উভয়ের মাঝে পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে বণ্টন করা হবে।[১] এক্ষেত্রে উভয় মুদারিব পরস্পরের অংশীদারের ন্যায় ব্যবসার কাজ পরিচালনা করবে।

মুদারিব একজন হোক কিংবা একাধিক হোক, তারা ব্যবসায় ঐ সকল কাজ করতে পারবে, যা সাধারণত এ ধরনের ব্যবসায় করা হয়ে থাকে। কিন্তু মুদারিব যদি এমন কোন অসাধারণ কাজ করতে চায়, যা ব্যবসায়ীগণ সাধারণত করে না, তাহলে তা রাব্বুলমালের সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত করতে পারবে না।

---

১. ইব্ন কুদামা, আল-মুগনী, ৫/১৪৫।

মুনাফা বণ্টন

মুদারাবা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য অন্যতম জরুরী শর্ত হল, কারবার শুরু করার পূর্বেই উভয়পক্ষ প্রকৃত লভ্যাংশ বণ্টনের হার নির্ধারণের ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে, যে অনুযায়ী রাব্বুলমাল এবং মুদারিব উভয়ে লভ্যাংশের পাওনাদার হবে। শরীয়ত লভ্যাংশ বণ্টনের নির্দিষ্ট কোন অনুপাত বর্ণনা করেনি, বরং তা নির্ধারণের ব্যাপারে উভয়পক্ষের স্বাধীন মতামতের উপর ছেড়ে দিয়েছে। তারা লভ্যাংশে সমহারেও অংশীদার হতে পারে কিংবা রাব্বুলমাল এবং মুদারিবের জন্য পৃথক পৃথক অনুপাতও নির্দিষ্ট করতে পারে। তবে তারা কোন পক্ষের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ ধার্য করতে পারবে না। এমনিভাবে কোন পক্ষের মুনাফা মূলধনের কোন আনুপাতিক অংশের সাথেও নির্দিষ্ট করতে পারবে না। উদাহরণস্বরূপ- মূলধন যদি এক লাখ টাকা হয়, তাহলে তারা এ শর্তে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে না যে, সমুদয় মুনাফার দশ হাজার টাকা মুদারিব পাবে এবং এ ধরনের চুক্তিও করতে পারবে না যে, (যেমন) মূলধনের ২০% রাব্বুলমালকে দেয়া হবে। তবে এ চুক্তি করতে পারবে যে, প্রকৃত মুনাফার ৪০% মুদারিব পাবে এবং ৬০% রাব্বুলমাল পাবে, কিংবা ৬০% মুদারিব এবং ৪০% রাব্বুলমাল পাবে।

বিভিন্ন অবস্থায় মুনাফার বিভিন্ন অনুপাত ধার্য করাও জায়েয আছে। যেমন- রাব্বুলমাল মুদারিবকে একথা বলতে পারে যে, তুমি যদি গমের ব্যবসা কর, তাহলে সমুদয় মুনাফার ৫০% পাবে, আর যদি আটার ব্যবসা কর, তাহলে সমুদয় মুনাফার ৩৩% পাবে। এমনিভাবে রাব্বুলমাল একথাও বলতে পারে যে, তুমি যদি নিজ শহরে ব্যবসা কর, তাহলে ৩০% পাবে, আর যদি ভিন্ন শহরে ব্যবসা কর, তাহলে মুনাফায় তোমার অংশ ৫০% হবে।

মুনাফার সিদ্ধান্তকৃত আনুপাতিক অংশ ব্যতীত মুদারিব মুদারাবার জন্য কৃত স্বীয় কাজের বিনিময়ে কোন রকম বেতন, ভাতা বা বিনিময়ের দাবী করতে পারবে না।

ফিক্‌হবিদদের সর্বসম্মতিক্রমে মুদারিব পূর্ব সিদ্ধান্তকৃত আনুপাতিক হারে মুনাফা ব্যতীত মুদারাবার ব্যবসা পরিচালনার কারণে কোন রকম বেতন, ভাতা বা বিনিময়ের দাবী করতে পারবে না।[১] তবে ইমাম আহমাদ (রহ.) মুদারিবকে মুদারাবা একাউন্ট থেকে শুধুমাত্র দৈনিক খোরাকের খরচ গ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করেন।[২] কিন্তু হানাফী ফিক্‌হবিদদের নিকট মুদারিব মুদারাবা একাউন্ট থেকে দৈনিক খোরাকের খরচ ঐ সময় গ্রহণ করতে পারবে, যখন সে মুদারাবা ব্যবসার জন্য নিজ শহরের বাইরে ভ্রমণ করবে। তখন সে তার থাকা খাওয়া ইত্যাদির খরচ গ্রহণ করতে পারবে। নিজ শহরে থাকাকালীন সময়ে দৈনিক কোন খরচের পাওনাদার হবে না।

যদি মুদারাবার কোন ব্যবসায় লোকসান হয় এবং কোন ব্যবসায় লাভ হয়, তাহলে প্রথমে লাভ দ্বারা লোকসানের ক্ষতিপূরণ করা হবে। ক্ষতিপূরণের পর যা থাকবে, তা উভয়ের মাঝে পূর্ব সিদ্ধান্তকৃত আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হবে।[৩]

মুদারাবা সমাপ্ত করা

মুদারাবা চুক্তি উভয়পক্ষের যে কেউ যে কোন সময় অপর পক্ষকে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে সমাপ্ত করতে পারে। সমাপ্তির সময় মুদারাবার সমুদয় সম্পদ যদি তরল আকৃতির হয় এবং মূলধনের বিনিময়ে কিছু মুনাফাও অর্জিত হয়, তাহলে তা উভয়ের মাঝে মুনাফার সিদ্ধান্তকৃত আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হবে। কিন্তু মুদারাবার সম্পদ যদি তরল আকৃতির না হয়, তাহলে ম্যাদারিবকে মুদারাবার সম্পদ বিক্রি করে তারল্যে রূপান্তরিত করার সুযোগ দেয়া হবে, যাতে প্রকৃত মুনাফা নির্ধারণ করা যায়।[৪]

---

১. বাদায়িউস সানাই, ৫/৯৯।

২. সারাখসী, আল-মাবসূত, ২২/১৪৯-১৫০।

৩. আল-কাসানী, বাদায়িউস সানাই, ৬/১০৯।

৪. ইবন কুদামা, আল-মুগনী, ৫/১৮৬।

মুসলিম ফিক্‌হবিদদের এ প্রশ্নের ব্যাপারে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যে, মুদারাবাকে এমন কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের সাথে নির্ধারণ করা যাবে কিনা, যে মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে মুদারাবা চুক্তি নিজে নিজেই সমাপ্ত হয়ে যাবে। হানাফী এবং হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী মুদারাবাকে সুনির্দিষ্ট মেয়াদের সাথে সীমাবদ্ধ করা যাবে। যেমন, এক বছর, ছয় মাস ইত্যাদি। যার পরে মুদারাবা বিনা নোটিশে সমাপ্ত হয়ে যাবে। অপরদিকে মালেকী এবং শাফেয়ী ফিক্‌হবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি হল মুদারাবাকে নির্দিষ্ট মেয়াদের সাথে সীমাবদ্ধ করা যাবে না।[১]

তবে ফিক্‌হবিদদের এ মতবিরোধ মুদারাবার মেয়াদের সর্বশেষ এবং সর্বোচ্চ সময়সীমার সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু উভয়ের পক্ষ থেকে মুদারাবার এমন কোন সর্বনিম্ন সময়সীমা নির্ধারণ করা যাবে কিনা, যার পূর্বে মুদারাবা চুক্তি সমাপ্ত করা যাবে না? ইসলামী ফিক্‌হের গ্রন্থাবলীতে এ প্রশ্নের ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন উত্তর পাওয়া যায় না। কিন্তু একটি মূলনীতি যা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এ ধরনের কোন সময়সীমা নির্ধারণ করা যাবেনা। বরং উভয়পক্ষের যে কেউ যখন ইচ্ছা করবে মুদারাবা চুক্তি সমাপ্ত করতে পারবে।[২]

উভয়পক্ষের মুদারাবা সমাপ্তি করার এই অসীম স্বাধীনতা বর্তমান যুগে কিছু সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। কেননা, বর্তমানে অধিকাংশ ব্যবসা-বাণিজ্যে সফলতা দেখানোর জন্য বেশ কিছু সময়, দৃঢ়সংকল্প ও স্থিরচিত্তসম্পন্ন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। এ কারণে রাব্বুলমাল যদি ব্যবসার একেবারেই শুরুলগ্নে মুদারাবা সমাপ্ত করে দেয়, তাহলে তা এই প্রকল্পের জন্য বিরাট জটিলতার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। বিশেষ করে মুদারিবের জন্য মারাত্মক ক্ষতি হবে, কেননা সে সার্বিক প্রচেষ্টা ব্যয় করার পরও কোন কিছু অর্জন করতে পারেনি। এজন্য মুদারাবা চুক্তির প্রারম্ভেই যদি উভয়পক্ষ এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, কোন পক্ষ একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত বিশেষ কোন সমস্যা ব্যতীত মুদারাবাকে সমাপ্ত করবেনা,

১. আল-কাসানী, বাদায়িউস সানাই, ৬/১৯৯, ইবন কুদামা, আল-মুগনী, ৫/১৮৫, ৪.

২. সারাখসী, আল-মাবসূত, ২২/১৩৩।

তাহলে এ শর্তটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে শরীয়তের কোন মূলনীতির পরিপন্থি বলে মনে হয় না। বিশেষত ঐ হাদীসের আলোকে যা পূর্বেও উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যে, المسلمون على شروطهم إلا أحل حراما أو حرم حلالا "মুসলমানদের মাঝে সিদ্ধান্তকৃত শর্তকে স্থির রাখা হবে, কিন্তু ঐ শর্ত যা কোন হারামকে হালাল করে বা হালালকে হারাম করে।"

(আবু দাঊদ, হাদীস নং- ৩৫৫৫)।

মুশারাকা এবং মুদারাবার সমন্বয়

সাধারণ অবস্থায় এটাই মনে করা হয় যে, মুদারিব মুদারাবায় কোন পুঁজি বিনিয়োগ করে না, সে শুধু ব্যবস্থাপনার যিম্মাদার, সমুদয় পুঁজি রাব্বুলমাল বিনিয়োগ করে। কিন্তু এমন অবস্থাও হতে পারে যে, মুদারিবও তার কিছু পুঁজি মুদারাবা ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে চায়, এ ক্ষেত্রে মুশারাকা এবং মুদারাবা চুক্তিদ্বয় একত্রিত হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ- 'A' 'B' কে মুদারাবার ভিত্তিতে এক লাখ টাকা প্রদান করল। অতঃপর 'B' 'A' এর সম্পতিতে নিজের পক্ষ থেকে আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা মুদারাবায় সংযুক্ত করল। এ জাতীয় অংশীদারিত্বের সাথে মুশারাকা এবং মুদারাবার সমন্বিত মু'আমালা করা হবে। এখানে মুদারিব নিজের জন্য অংশীদার হিসেবে মুনাফার বিশেষ একটি অংশ ধার্য করতে পারবে। এর সাথে সাথে সে মুদারিব হিসেবে মুদারাবার ব্যবস্থাপনা এবং পরিশ্রমের কারণে মুনাফার আরেকটি অংশ ধার্য করতে পারবে। উল্লেখিত উদাহরণে মুনাফা এ ভিত্তিতে নির্ধারণ হবে যে, 'B' প্রকৃত মুনাফার এক তৃতীয়াংশ স্বীয় পুঁজির কারণে পাবে, অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ মুনাফা উভয়ের মাঝে সমহারে বণ্টন হবে, কিন্তু (এই দুই তৃতীয়াংশ বণ্টনে) উভয়পক্ষ অন্য কোন আনুপাতিক হারের উপরও চুক্তিবদ্ধ হতে পারে। তবে এতটুকু শর্ত যে, নিষ্ক্রিয় অংশীদার (Sleeping Partner) স্বীয় পুঁজির অনুপাত অপেক্ষা বেশি গ্রহণ করতে পারবে না। সুতরাং উল্লেখিত উদাহরণে 'A' নিজের জন্য সমুদয় মুনাফার দুই তৃতীয়াংশের অধিক ধার্য করতে পারবে না। কেননা, তার বিবিয়োগকৃত পুঁজি সমুদয় পুঁজির দুই তৃতীয়াংশের অধিক নয়।

মুশারাকা এবং মুদারাবা পদ্ধতিতে অর্থায়ন

পূর্বের অনুচ্ছেদসমূহে মুশারাকা এবং মুদারাবার প্রাচীন ধারণা এবং সে অনুযায়ী শরয়ী বিধানাবলীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে আধুনিক ব্যবসা বাণিজ্যে এ দু'টি পদ্ধতিকে অর্থায়ন (Financing) -এর উদ্দেশ্যে কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে সে বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে করি।

ইসলামী ফিকহের গ্রন্থাবলীতে মুশারাকা এবং মুদারাবার স্বরূপ এ চিন্তা-চেতনার ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে যে, এ দু'টি চুক্তি এমন যৌথ কারবার শুরু করার জন্য যেখানে উভয়পক্ষ একেবারে শুরু থেকেই ব্যবসায় অন্তর্ভুক্ত হয় এবং একেবারে শেষ পর্যন্ত তথা সম্পদ তরল আকৃতিতে রূপান্তর করা পর্যন্ত অংশীদার থাকে। ইসলামী ফিক্‌হের প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে এ ধরনের চলমান ব্যবসার বর্ণনা পাওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার, যেখানে অংশীদারগণ ব্যবসার চলমান অবস্থায় কোন রকম জটিলতা সৃষ্টি ব্যতীত অংশীদার হয় এবং পৃথক হয়ে যায়। বস্তুত ইসলামী ফিক্‌হের প্রাচীন গ্রন্থাবলী এমন পরিবেশে লিখা হয়েছে যেখানে বড় ধরনের কোন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলন ছিল না এবং বর্তমান যুগের ন্যায় তৎকালীন ব্যবসা-বাণিজ্যে এত জটিলতাও ছিল না। যার ফলে পূর্ববর্তী মনীষীগণ এ ধরনের প্রচলিত ব্যবসার সমাধানের প্রতি মনোনিবেশ করেননি। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, মুশারাকা এবং মুদারাবাকে চলমান ব্যবসার অর্থায়নের জন্য ব্যবহার করা যায় না। মুশারাকা এবং মুদারাবার পদ্ধতি যেসব বুনিয়াদী মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেসব মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে কালের পরিবর্তনে সেগুলোর প্রয়োগের প্রক্রিয়া পরিবর্তন করা যেতে পারে।

বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে সেসব বুনিয়াদী মূলনীতির প্রতি আমাদের একটু দৃষ্টিপাত করা উচিত।

(১) মুশারাকা এবং মুদারাবার মাধ্যমে অর্থায়ন ঋণ হিসেবে অর্থ প্রদানের সদৃশ্য নয়। বরং মুশারাকার পদ্ধতিতে অর্থায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিনিয়োগকৃত পুঁজির অনুপাতে ঐ ব্যবসার সম্পদে অংশীদার হওয়া।

(২) বিনিয়োগকারী/অর্থযোগানদাতা তার পুঁজির অনুপাতে ব্যবসার লোকসানেও অবশ্যই অংশীদার হতে হবে।

(৩) অংশীদারদের এ স্বাধীনতা রয়েছে যে, তারা তাদের পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে প্রত্যেকের জন্য মুনাফার অনুপাত সাব্যস্ত করতে পারে। তবে যে অংশীদার সুস্পষ্টভাবে নিজেকে ব্যবসার জন্য কাজ করার দায়িত্ব থেকে পৃথক করে নেয়, সে তার পুঁজির অনুপাত অপেক্ষা অধিক মুনাফার দাবী করতে পারে না।

(৪) লোকসান প্রত্যেককেই তাদের পুঁজির অনুপাতে বহন করতে হবে।

এসব মূলনীতিকে সামনে রেখে মুশারাকা এবং মুদারাবাকে অর্থায়নের বিভিন্ন অধ্যায়ে কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, এ পর্যায়ে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করব।

প্রকল্প অর্থায়ন ঃ (Project Financing)

প্রকল্প অর্থায়ন (Project Financing)-এর জন্য মুশারাকা এবং মুদারাবার প্রাচীন পদ্ধতি খুব সহজতার সাথে অবলম্বন করা যায়। পুঁজি বিনিয়োগকারী (Financier) যদি (এককভাবে) পূর্ণ প্রজেক্টে পুঁজি বিনিয়োগ করতে চায়, তাহলে মুদারাবা পদ্ধতি গ্রহণ করবে। আর উভয়পক্ষ পুঁজি বিনিয়োগ করলে মুশারাকা পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। পুঁজি উভয়পক্ষ বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা যদি এক পক্ষের দায়িত্বে থাকে, তাহলে পূর্বোল্লেখিত নিয়মানুযায়ী মুশারাকা এবং মুদারাবার সমন্বিত পদ্ধতি গ্রহণ করবে।

যেহেতু মুশারাকা এবং মুদারাবা প্রকল্পের একেবারে প্রথম থেকেই কার্যকর হবে, তাই পুঁজির মূল্য নির্ধারণের সমস্যাও সামনে আসবেনা। এমনিভাবে সাধারণ হিসাব-নিকাশের নিয়ম-নীতি (Accounting Standards) অনুযায়ী মুনাফা বণ্টনেও কোন সমস্যা হবে না। তবে পুঁজি বিনিয়োগকারী (Financier) যদি মুশারাকা থেকে পৃথক হয়ে যেতে চায়

এবং দ্বিতীয় পক্ষ ব্যবসা চালু রাখতে চায়, তাহলে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের অংশ পারস্পরিক আলোচনা সাপেক্ষে মূল্য নির্ধারণ করত্ ক্রয় করতে পারবে। এভাবে পুঁজি বিনিয়োগকারী লভ্যাংশসহ তার বিনিয়োগকৃত পুঁজি ফেরত নিতে পারে। ব্যবসায় যদি কিছু মুনাফা অর্জন হয়, তাহলে তার অংশের মূল্য কিসের ভিত্তিতে নির্ধারণ হবে এ বিষয়টি সামনে ওয়ার্কিং ক্যাপিট্যালের অর্থায়নের আলোচনায় আসবে।

অপরদিকে ব্যবসায়ী (পুঁজি ব্যবহারকারী) ইচ্ছা করলে তার প্রজেক্ট চালু রাখতে পারে। হয়ত নিজের মালিকানায় রেখে কিংবা প্রথম অর্থায়নকারীর অংশ অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে। অন্যের নিকট বিক্রির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পুঁজি বিনিয়োগকারী প্রথম বিনিয়োগকারীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে।

যেহেতু অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান (Financial Institution) সাধারণত দীর্ঘ মেয়াদের জন্য বিশেষ কোন প্রজেক্টে অংশীদার থাকতে চায় না, এজন্য উল্লেখিত পন্থানুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠান স্বীয় অংশ প্রজেক্টের অন্যান্য অংশীদারদের নিকট বিক্রি করতে পারবে। যদি প্রজেক্টে তরল আকৃতির পুঁজি অর্থাৎ নগদ অর্থের স্বল্পতার কারণে তা একসঙ্গে বিক্রি করা সম্ভব না হয়, তাহলে অর্থায়নকারীর অংশকে ছোট ছোট ইউনিটে ভাগ করে কিছুদিন পর পর সময়মত বিক্রি করা যায়। যখন একটি ইউনিট বিক্রি হয়ে যাবে, তখন বিনিয়োগকারী (Financier) -এর সে পরিমাণ অংশ প্রজেক্ট থেকে কমে যাবে। এভাবে যখন সকল ইউনিট বিক্রি হয়ে যাবে তখন অর্থায়নকারী প্রজেক্ট থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়ে যাবে।

মুশারাকাকে আদান-প্রদান যোগ্য ডকুমেন্টে রূপান্তরিত করা ঃ

(Securitization of Musharakah)

মুশারাকা এমন একটি অর্থায়ন পদ্ধতি, যাকে সহজেই সিকিউরিটাইজ করা যায়। (অর্থাৎ আদান-প্রদান যোগ্য ডকুমেন্টে রূপান্তরিত করা যায়)। বিশেষ করে এমন বৃহদায়তনের প্রজেক্ট যেখানে প্রচুর পরিমাণ অর্থের

প্রয়োজন হয়, যা সীমিত সংখ্যক লোক যোগান দিতে পারে না। (ফলে উদ্যোক্তারা পুঁজি গঠনের জন্য ৫০/১০০ টাকা করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত করে শেয়ার হিসেবে বিক্রির জন্য ছাড়ে) প্রত্যেক অর্থ প্রদানকারীকে একটি "মুশারাকা সার্টিফিকেট" প্রদান করা হয়, যে সার্টিফিকেট পরিশোধিত মূলধন অনুপাতে মুশারাকার সমুদয় সম্পদে প্রতিনিধিত্ব করে। যখন জড় সম্পদ এবং দ্রব্যগত সম্পদ সংগ্রহ করে ব্যবসার প্রজেক্ট শুরু হয়ে যাবে, তখন ঐ "মুশারাকা সার্টিফিকেটসমূহ" আদান-প্রদানযোগ্য ডকুমেন্টের মর্যাদায় উপনীত হয়ে যাবে এবং সেগুলোকে শেয়ার মার্কেটে বেচাকেনা করা যাবে। কিন্তু এসব সার্টিফিকেটের ব্যবসা মুশারাকার সমুদয় সম্পদ তরল আকৃতি (অর্থাৎ- নগদ টাকা-পয়সা, উসূলযোগ্য ঋণ, অন্যকে প্রদানকৃত ঋণের টাকা) থাকাকালীন জায়েয হবে না।

উক্ত বিষয়টি যথাযথভাবে বুঝার জন্য একথা স্মরণ রাখা জরুরী যে, মুশারাকায় পুঁজি বিনিয়োগ করা ঋণের সাদৃশ্য নয়। কোন ঋণের প্রমাণপত্র হিসেবে জারীকৃত বন্ডের ঋণকৃত অর্থ দ্বারা পরিচালিত ব্যবসার সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না। এই বন্ড শুধুমাত্র ঐ ঋণের প্রতিনিধিত্ব করে যার বাহককে সর্বাবস্থায় সাধারণত সুদসহ ফেরৎ দেয়া হয়। পক্ষান্তরে মুশারাকা সার্টিফিকেট প্রজেক্টের সম্পদে বাহকের সরাসরি আনুপাতিক একটি অংশের মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে। যদি যৌথ প্রজেক্টের সমুদয় সম্পদ তরল আকৃতির হয়, তাহলে উক্ত সার্টিফিকেট প্রজেক্টের মালিকানাধীন অর্থের একটি বিশেষ আনুপাতিক অংশের প্রতিনিধিত্ব করবে। উদাহরণস্বরূপ- একশ' সার্টিফিকেট ছাড়া হল, যার প্রতিটির মূল্য এক মিলিয়ন টাকা। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রজেক্টের সমুদয় মূলধন হল একশ' মিলিয়ন টাকা। যদি এ অর্থ দ্বারা কোন প্রকার দ্রব্যগত সম্পদ ক্রয় না করা হয়, তাহলে প্রতিটি সার্টিফিকেট এক মিলিয়ন টাকার প্রতিনিধিত্ব করবে। এমতাবস্থায় এই সার্টিফিকেটকে শুধুমাত্র গায়ের মূল্য (এক মিলিয়ন টাকা)-এর বিনিময়েই বিক্রি করা যাবে। কেননা, যদি একটি সার্টিফিকেটকে এক মিলিয়ন টাকা অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রি করা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে এক মিলিয়ন টাকা, এক মিলিয়ন টাকার অধিক

মূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে যার অনুমতি নেই। কারণ, যখন টাকার বিনিময়ে টাকা বিক্রি করা হয়, তখন উভয় দিকে টাকার পরিমাণগত সমতা রক্ষা করা জরুরী। যে কোন পক্ষ থেকে টাকার পরিমাণ বেশি পরিশোধ করা হলে তা সুদ হয়ে যাবে।

কিন্তু যৌথ মূলধন দ্বারা যখন দ্রব্যগত সম্পদ যেমন- যমিন, বিল্ডিং, মেশিনারী, জড় সম্পদ এবং ফার্নিচার ইত্যাদি ক্রয়ে বিনিয়োগ করা হবে, তখন মুশারাকা সার্টিফিকেট ঐ সম্পদসমূহে সার্টিফিকেট হোল্ডারের পরিশোধিত মূলধন অনুপাতে মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করবে। সুতরাং উল্লেখিত উদাহরণে একটি সার্টিফিকেট ঐ সম্পদসমূহের একশ' ভাগের এক ভাগের (১০০/১) প্রতিনিধিত্ব করবে। এমতাবস্থায় উক্ত সার্টিফিকেটকে শেয়ার মার্কেটে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে যে কোন মূল্যে বিক্রি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে। এ মূল্য শেয়ারের লিখিত মূল্য (Face Value) থেকেও অধিক হতে পারবে। কেননা, এক্ষেত্রে যে জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে তা দ্রব্যগত এবং জড় সম্পদের একটি অংশ। শুধু মুদ্রা বা টাকা পয়সা নয়। সুতরাং উক্ত সার্টিফিকেটকে অন্যান্য যে কোন দ্রব্যগত সম্পদের ন্যায় মনে করে লাভ লোকসানের ভিত্তিতে (কম বেশিতে) বিক্রি করা যাবে।

অধিকাংশ সময় প্রজেক্টের সম্পদ তরল এবং দ্রব্যগত-এর সংমিশ্রণ হয়। এরূপ তখন হয়, যখন সক্রিয় অংশীদার (Working Partner) যৌথ মূলধনের একটি অংশকে জড় সম্পদ বা কাঁচা মালে রূপান্তরিত করে ফেলে এবং অবশিষ্ট মূলধন তরল আকৃতির থেকে যায়। অথবা মূলধনকে দ্রব্যগত সম্পদে রূপান্তরিত করার পর তার থেকে কৃয়দাংশ সম্পদ বিক্রি করে কিছু নগদ অর্থ সংগ্রহ করে নেয়। কোন কোন অবস্থায় এমনও হতে পারে যে, ঐ দ্রব্যগত সম্পদ বাকিতে বিক্রি করার কারণে মূল্য এখনো উসূল হয়নি, তবে উসূলযোগ্য। সেই উসূলযোগ্য অর্থ ঋণ হওয়ার কারণে তরল আকৃতির সম্পদ মনে করা হবে। এক্ষেত্রে যখন কোন প্রজেক্টের সম্পদ তরল আকৃতির (নগদ অর্থ) এবং দ্রব্যগত সম্পদের বমিশ্রণ হয়, তখন তার শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে প্রশ্ন উঠে যে, এমন প্রজেক্টের মুশারাকা

সার্টিফিকেটের ব্যবসা করা যাবে কিনা? এই বিষয়ে সমকালীন ফিক্‌হবিদদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। পূর্ববর্তী শাফে'য়ী ফিক্‌হবিদদের মতে এ ধরনের সার্টিফিকেটকে বিক্রি করা যাবে না। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল, যেখানে তরল আকৃতির সম্পদ এবং দ্রব্যগত সম্পদের বিমিশ্রণ হবে, সেখানে ততক্ষণ পর্যন্ত বেচাকেনা করা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পদের দ্রব্যগত অংশকে পৃথক করে তা আলাদাভাবে বিক্রি না করা হবে।[১]

হানাফী ফিক্‌হবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি হল, তরল এবং দ্রব্যগত বমিশ্রিত সম্পদকে বিক্রি করা যাবে। তবে শর্ত হল, ধার্যকৃত মূল্য সমুদয় সম্পদের অন্তর্ভুক্ত তরল সম্পদের মূল্যমান থেকে অধিক হতে হবে। যাতে একথা মনে করা যায় যে, মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় তার সমপরিমাণ মুদ্রার বিনিময়ে হয়েছে এবং অতিরিক্ত অর্থ ব্যবসার মালিকানাধীন বিদ্যমান দ্রব্যগত সম্পদের মূল্য।

উদাহরণস্বরূপ- মুশারাকা প্রজেক্টের ৪০% সম্পদ দ্রব্যগত, অর্থাৎ- মেশিনারি, স্থাবর সম্পত্তি ইত্যাদি। ৬০% সম্পদ তরল আকৃতির, অর্থাৎ- নগদ ক্যাশ এবং উসূলযোগ্য অর্থ। এ প্রজেক্টের একশ' টাকা মূল্যমানের সার্টিফিকেট ৬০ টাকার তরল এবং ৪০ টাকার দ্রব্যগত সম্পদের প্রতিনিধিত্ব করে। উক্ত সার্টিফিকেটকে ৬০ টাকার অধিক যে কোন মূল্যে বিক্রি করা যাবে। যদি তাকে ১১০ টাকায় বিক্রি করা হয়, তার অর্থ দাঁড়াবে ৬০ টাকা সার্টিফিকেটের তরল ৬০ টাকার বিনিময়ে এবং অবশিষ্ট ৫০ টাকা দ্রব্যগত সম্পদের আনুপাতিক অংশের বিনিময়ে। কিন্তু এ সার্টিফিকেটকে ৬০ টাকা বা তার চেয়ে কম মূল্যে বিক্রি করা অবশ্যই জায়েয হবে না। কেননা, এক্ষেত্রে অবশিষ্ট দ্রব্যগত সম্পদকে পৃথক করত ৬০ টাকাকে ৬০ টাকার বিনিময়ে ধরা যাচ্ছে না। (যেহেতু দ্রব্যগত সম্পদের বিনিময়ে ঐ ৬০ টাকার কিছু অংশ অবশ্যই এসে যাবে) যার ফলে ৬০ টাকার বিনিময়ে আর ৬০ টাকা থাকবে না।

---

১. আল-খাত্বাবী, মাআলিমুস সুনান, ৫/২৩।

হানাফী মাযহাব অনুযায়ী মিশ্র সম্পদে দ্রব্যগত সম্পদের বিশেষ কোন আনুপাতিক হার নির্দিষ্ট নেই। সুতরাং যদি দ্রব্যগত সম্পদ মিশ্র সম্পদের ৫০% থেকে কমও হয়, তাহলেও উল্লেখিত নিয়মানুযায়ী তার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে।

তবে শাফে'য়ী ফিক্হবিদ এবং অধিকাংশ সমকালীন ফিক্হবিদ ব্যবসার দ্রব্যগত সম্পদ ৫০% থেকে বেশি হওয়ার ক্ষেত্রে ঐ ইউনিটসমূহের ক্রয়-বিক্রির অনুমতি প্রদান করেন।

সুতরাং মুশারাকা সার্টিফিকেটের ব্যবসা সকল ফিক্হবিদদের নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য জরুরী হল- মুশারাকার দ্রব্যগত সম্পদ মিশ্র সম্পদের (Portfolio) ৫০% থেকে অধিক হতে হবে। কিন্তু যদি শুধু হানাফী মাযহাব অনুযায়ী আমল করা হয়, তাহলে দ্রব্যগত সম্পদ ৫০% থেকে কম হওয়ার ক্ষেত্রেও এর ব্যবসা করা জায়েয হবে। তবে এই দ্রব্যগত সম্পদ এত স্বল্প না হতে হবে যা একেবারেই অনুল্লেখযোগ্য।

এক চুক্তির অর্থায়ন ঃ (Financing of Single Transaction)

মুশারাকা এবং মুদারাবা একই চুক্তির অর্থায়নের জন্য খুব সহজেই ব্যবহৃত হতে পারে। ছোটখাট ব্যবসায়ীদের দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণ করা ছাড়াও মুশারাকা এবং মুদারাবাকে আমদানি এবং রফতানির অর্থায়নের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে। একজন আমদানিকারক (Inporter) (রফতানিকারকের সাথে) চুক্তিকৃত অর্থ পরিশোধের জন্য যে কোন অর্থায়নকারী (financier) -এর নিকট মুশারাকা এবং মুদারাবার ভিত্তিতে অর্থায়নের জন্য আবেদন করতে পারে। ব্যাংকও এ দু'টি পদ্ধতি (মুশারাকা এবং মুদারাবা)কে আমদানির অর্থায়ন (Import Financing)-এর জন্য ব্যবহার করতে পারে। এলসি যদি জিরো মার্জিনে খোলা হয়, তাহলে মুদারাবা পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে, আর যদি এলসি আংশিক মার্জিনে খোলা হয়, তাহলে শুধু মুশারাকা কিংবা মুদারাবা এবং মুশারাকার সমন্বিত পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে। আমদানিকৃত পণ্য বন্দর থেকে খালাস করার পর সেগুলোর বিক্রিলব্ধ অর্থ আমদানিকারক এবং অর্থায়নকারীর মাঝে পূর্ব সিদ্ধান্তকৃত আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হবে।

এক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্য অর্থায়নকারীর বিনিয়োগকৃত পুঁজির অনুপাতে তার মালিকানায় থাকবে। এই মুশারাকাকে একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্তও সীমাবদ্ধ করা যায়। যদি সেই নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আমদানিকৃত পণ্য বিক্রি না হয়, তাহলে আমদানিকারক নিজে অর্থায়নকারীর অংশ ক্রয় করে এককভাবে ঐ পণ্যের মালিক হয়ে যাবে। কিন্তু এ অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় ও বাজার মূল্য অনুযায়ী, অথবা বিক্রির দিন উভয়ের মাঝে সাব্যস্তকৃত মূল্যে হতে হবে। মুশারাকায় অন্তর্ভুক্তির সময় যে মূল্য ধার্য করা হয়েছিল, সে মূল্যে বিক্রি করা সঠিক হবে না। মূল্য যদি পূর্বেই সাব্যস্তকৃত হয়, তাহলে অর্থায়নকারী নিজ গ্রাহক আমদানিকারককে তা ক্রয়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে পারবে না।

এমনিভাবে রফতানির অর্থায়ন (Export Financing)-এর জন্যও মুশারাকা পদ্ধতি খুব সহজভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। যে মূল্যে পণ্য রফতানি করা হবে তা পূর্বেই জানা থাকার কারণে অর্থায়নকারী (Financier) প্রত্যাশিত মুনাফার ধারণা খুব সহজেই উপলব্ধি করতে পারে এবং মুশারাকা ও মুদারাবার ভিত্তিতে অর্থায়ন করে রফতানিকৃত সম্পদে পূর্ব সিদ্ধান্তকৃত আনুপাতিক হারে অংশীদার হতে পারে। রফতানিকারকের কোনরূপ উদাসীনতার কারণে লোকসান হলে অর্থায়নকারী নিজেকে তা থেকে মুক্ত রাখার জন্য এ শর্তারোপ করতে পারে যে, এলসির শর্তানুযায়ী পণ্য পাঠানোর দায়িত্ব রফতানিকারকের উপর। যদি এলসির শর্তের সাথে কোন রকম ব্যবধান পাওয়া যায়, তাহলে এর দায়-দায়িত্ব শুধুমাত্র রফতানিকারকের উপর বর্তাবে। এধরনের শর্তারোপ থাকলে কোন লোকসান হলে তা থেকে অর্থায়নকারী মুক্ত থাকবে। কেননা, এ লোকসান রফতানিকারকের উদাসীনতার কারণে হয়েছে। কিন্তু অর্থায়নকারীকে রফতানিকারকের সাথে অংশীদার হওয়ার সুবাধে ঐসব লোকসান বহন করতে হবে, যা রফতানিকারকের কোনরূপ অসতর্কতা বা উদাসীনতা ছাড়া হয়েছে।[১]

---

১. আমদানি রফতানির অর্থায়ন সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ইসলাম আওর জাদীদ মাঈসাত ওয়া তিজারাত দ্রষ্টব্য, ১৪৭-১৫২পৃষ্ঠা।

ওয়ার্কিং ক্যাপিট্যালে অর্থায়ন ঃ
(Financing of the working capital)

যদি কোন চলতি ব্যবসার ওয়ার্কিং ক্যাপিট্যালের জন্য অর্থায়নের প্রয়োজন হয় তাহলে মুশারাকার মাধ্যম নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হতে পারে।

(১) পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে চলতি ব্যবসার সমুদয় সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করে নেয়া হবে। পূর্বে মুশারাকার প্রাচীন পদ্ধতির বর্ণনায় আলোচনা করা হয়েছে যে, ইমাম মালেক (রহ.)-এর মাযহাব অনুযায়ী মুশারাকার মূলধন তরল-নগদ আকৃতিতে বিনিয়োগ করা জরুরী নয়। দ্রব্যগত সম্পদও মূল্য নির্ধারণ করত মুশারাকার অংশ হতে পারে। এ দৃষ্টিভঙ্গিকে এখানে গ্রহণ করা যেতে পারে। এভাবে ব্যবসার সম্পদের মূল্যকে ব্যবসায়ীর মূলধন ধরা হবে, অপরদিকে অর্থায়নকারীর প্রদেয় অর্থকে মূলধনে তার অংশ মনে করা হবে। মুশারাকা একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা তথা এক বছর, ছয় মাস বা এর চেয়ে কম-বেশি সময়ের জন্যও হতে পারে। উভয়পক্ষ অর্থায়নকারীর প্রাপ্য মুনাফার আনুপাতিক হার নির্ধারণ করে নিবে। তবে অর্থায়নকারী ব্যবসায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ না করার কারণে মুনাফার হার তার মূলধনের চেয়ে অধিক না হতে হবে। মুশারাকার মেয়াদান্তে তরল এবং দ্রব্যগত সমুদয় সম্পদের পুনরায় মূল্য নির্ধারণ করে মুনাফা উক্ত মূল্যের ভিত্তিতে বণ্টন করে নেয়া হবে।

যদিও প্রাচীন পদ্ধতি অনুযায়ী মুনাফা ততক্ষণ পর্যন্ত নির্ধারণ করা যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবসার সমুদয় সম্পদকে তরল আকৃতিতে রূপান্তরিত করা না হবে। কিন্তু সম্পদের মূল্য নির্ধারণকে পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে তরল আকৃতির মনে করা যেতে পারে। কেননা এরূপ করার ব্যাপারে শরীয়তে কোন নিষিদ্ধতা নেই। অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, সক্রিয় অংশিদার (Working Partner) ব্যবসার সম্পদে অর্থায়নকারীর অংশকে ক্রয় করে নিয়েছে, এবং তার অংশের মূল্য নির্ধারণ ব্যবসার সম্পদের মূল্য ধরে করা হয়েছে, এতে মুশারাকার শর্তানুযায়ী তার জন্য সাব্যস্তকৃত মুনাফার হারকেও সামনে রাখা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ- 'A' এর ব্যবসার সমুদয় সম্পদ ৩০ ইউনিট। 'B' আরো ২০ ইউনিট অর্থায়ন করেছে। এতে করে ব্যবসার মোট সম্পদ হল ৫০ ইউনিট। শতকরা হিসেবে এই ব্যবসায় ৪০% 'B' -এর পক্ষ থেকে বিনিয়োগ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৬০% 'A' -এর ছিল। উভয়পক্ষ এ সিদ্ধান্ত করল যে, 'B' প্রকৃত মুনাফার ২০% পাবে। মেয়াদান্তে ব্যবসার মোট সম্পদ হলো ১০০ ইউনিট। এ পর্যায়ে 'A' যদি 'B' -এর অংশ ক্রয় করতে চায়, তাহলে 'B' ব্যবসার ৪০% মালিক হওয়ার কারণে 'A' 'B' কে ৩০ ইউনিটের মূল্য দিয়ে দিবে। তবে তার অংশের মূল্যে মুনাফার পূর্ব নির্ধারিত হারের বিপরীত হবে, মূল্য ধার্যের ফরমুলা ভিন্ন, ব্যবসার যে কোন মুনাফা উভয়পক্ষের মাঝে ২০% এবং ৮০% হারে বণ্টন হবে, যেহেতু মুনাফা বণ্টনের এই আনুপাতিক হার চুক্তিতে পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়েছিল।

ব্যবসার মূল্যে যেহেতু ৫০ ইউনিট লাভ হয়েছে। তাই এ ৫০ ইউনিট উভয়ের মাঝে ২০-৮০% হারে বণ্টন হবে। যার অর্থ এটা দাঁড়াবে যে, 'B' মুনাফার ১০ ইউনিট পেয়েছে, এ ১০ ইউনিটকে মূলধন ২০ ইউনিটের সাথে যোগ করা হলে তার অংশের মূল্য ৩০ ইউনিট দাঁড়াবে।

লোকসানের ক্ষেত্রে সম্পদের মূল্যে যে কোন ধরনের ঘাটতি তাদের বিনিয়োগকৃত পুঁজির অনুপাতেই বণ্টন হবে। অর্থাৎ, ৪০% এবং ৬০% হারে লোকসান বহন করতে হবে। সুতরাং উল্লেখিত উদাহরণে ব্যবসার মূল্যে যদি ১০ ইউনিট ঘাটতি হয়, যার কারণে ৪০ ইউনিট অবশিষ্ট থাকে, তাহলে ৪ ইউনিটের লোকসান 'B' বহন করবে, (যা সমুদয় লোকসানের ৪০%)। এই ৪ ইউনিটকে তার বিনিয়োগকৃত ২০ ইউনিট থেকে বিয়োগ করা হলে 'B' -এর অংশের মূল্য দাঁড়াবে ১৬ ইউনিট। এই ফরমুলাটি ২ নং চিত্রে আরো সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হবে।
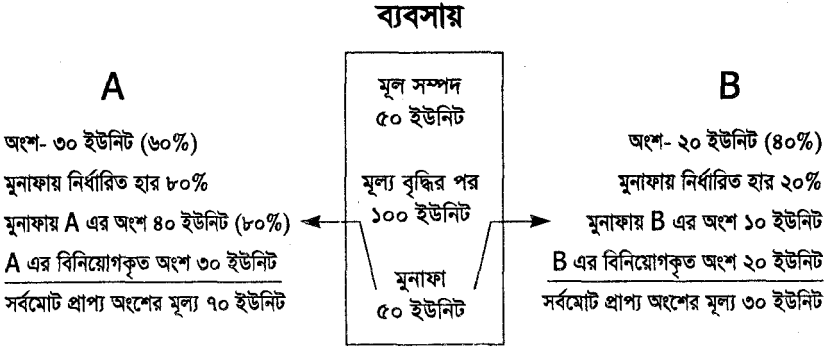
২। শুধু গ্রোস প্রফিটে (মোট লাভে) অংশীদারিত্ব ঃ

যে ব্যবসায় স্থাবর সম্পদ (Fixed Assets) বেশি, সে ব্যবসায় উল্লেখিত নিয়মানুযায়ী মুশারাকা পদ্ধতিতে অর্থায়ন করা জটিল হতে পারে, বিশেষ করে চলতি শিল্প কারখানায়। কেননা, অংশীদারিত্বের সময় সমুদয় সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করা এবং ব্যবসার মেয়াদান্তে সেগুলোর মূল্যে ঘাটতি ও বৃদ্ধি নির্ধারণ একাউন্টিং-এর দৃষ্টিতে জটিলতা এবং পরস্পরে দ্বন্দ-কলহের কারণ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে মুশারাকায় অন্য আরেকটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

এমতাবস্থায় পরোক্ষ খরচের হিসাব-নিকাশে বেশি জটিলতা দেখা দেয়। যেমন- মেশিনারী দ্রব্যের মূল্যে ঘাটতি, কর্মচারিদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি। এ জটিলতা সমাধানের জন্য উভয়পক্ষ এ সিদ্ধান্তে একমত হতে পারে যে, নীট লাভ (Net Profit) -এর পরিবর্তে মোট লাভ (Gross Profit)[১] বণ্টন হবে।

---

১. লাভ লোকসান তৈরি করার পদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট পরিভাষাসমূহ বিস্তারিত জানার জন্য ইসলাম আওর জাদীদ মা'ঈসাত ও তিজারাত দ্রষ্টব্য ঃ পৃষ্ঠা নং ৬৮-৬৯।

যার অর্থ এটা হবে যে, যাবতীয় পরোক্ষ খরচ শিল্পপতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বহন করবে। শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ খরচ (যেমন- কাঁচা মাল, সরাসরি কর্মচারি বেতন, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি) মুশারাকা বহন করবে। তবে শিল্পপতি যেহেতু স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীয় মেশিনারী, বিল্ডিং এবং কর্মচারি স্টাফ মুশারাকায় পেশ করে, এজন্য তাকে উপযুক্ত প্রতিদান দেওয়ার ব্যাপারে মুনাফায় তার আনুপাতিক অংশ অধিক ধার্য করা যেতে পারে।

উক্ত পদ্ধতিটি এ কারণেও যুক্তিসঙ্গত যে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রাহক (অর্থাৎ- তাদের থেকে অর্থ গ্রহণকারী) সাধারণত নিজেকে ঐ উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না, যে উদ্দেশ্যের জন্য সে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। বরং তার মেশিনারী এবং কর্মচারি স্টাফ অন্যান্য এমন কাজেও লিপ্ত থাকে, যেগুলোর মুশারাকার সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না। এ ক্ষেত্রে (মেশিনারী ইত্যাদির) এসব ব্যয় মুশারাকা থেকে প্রদান করা যায় না। একটি বাস্তব উদাহরণ যেমন- একটি তুলা ফ্যাক্টরীর একটি বিল্ডিং রয়েছে, যার মূল্য বাইশ মিলিয়ন টাকা, প্লান্ট এবং মেশিনারী দ্রব্যের মূল্য দুই মিলিয়ন এবং কর্মচারি স্টাফের মাসিক বেতন পঞ্চাশ হাজার পরিশোধ করা হয়। ফ্যাক্টরী একটি ব্যাংক থেকে এক বছরের মেয়াদে পঞ্চাশ লাখ (পাঁচ মিলিয়ন) টাকা মুশারাকার ভিত্তিতে ফিন্যান্সিং হিসেবে গ্রহণ করতে চায়, অর্থাৎ- এক বছর পর মুশারাকা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং এক বছর পর্যন্ত অর্জিত মুনাফা উভয়পক্ষের মাঝে নির্ধারিত আনুপাতিক হারে বণ্টিত হবে। মুনাফা নির্ধারণের সময় যাবতীয় প্রত্যক্ষ খরচ (Direct Expenses) লাভ থেকে বাদ যাবে।

প্রত্যক্ষ খরচে নিম্নবর্ণিত ব্যয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হয় ঃ

১। কাঁচা মাল ক্রয়ে ব্যয়িত টাকা।

২। যেসব কর্মচারি কাঁচামাল উন্নয়নে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত তাদের বেতন।

৩। তুলার কাজে ব্যয়িত বিদ্যুৎ বিল।

৪। অন্যান্য সেবাসমূহের বিল যা প্রত্যক্ষভাবে মুশারাকাকে সরবরাহ করা হয়েছে।

এই বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, বিল্ডিং, মেশিনারী এবং কর্মচারিদের বেতন-ভাতা শুধুমাত্র মুশারাকা ব্যবসার জন্য নয়। কেননা, মুশারাকাতো এক বছর পর শেষ হয়ে যাবে, অথচ বিল্ডিং-মেশিনারী দীর্ঘ সময়ের জন্য ক্রয় করা হয়েছে। যে সময়ের মধ্যে তুলা ফ্যাক্টরী বিল্ডিংকে স্বীয় কারবারের জন্য ব্যবহার করতে থাকবে। যার এক বছর মুশারাকার সাথে কোন সম্পর্ক হবে না। এ কারণে বিল্ডিং এবং মেশিনারীর মূল্যের যাবতীয় ব্যয়ভার ঐ স্বল্প সময়ের মুশারাকার উপর দেয়া যায় না। বেশির চেয়ে বেশি এতটুকু করা যেতে পারে যে, মুশারাকা চলাকালীন সময়ে বিল্ডিং এবং মেশিনারীর ক্ষয়িতকে মুশারাকার খরচে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই ক্ষয়িতের মূল্য নির্ধারণ অত্যন্ত কঠিন হবে এবং এ কারণে কলহ-কোন্দলও সৃষ্টি হতে পারে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য দু'টি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

প্রথমত, উভয়পক্ষ এই সিদ্ধান্ত করবে যে, "মুশারাকা" গ্রাহককে (অর্থ গ্রহণকারী আসল মালিককে) মেশিনারী এবং বিল্ডিং ব্যবহার করার কারণে নির্ধারিত ভাড়া প্রদান করবে। মুশারাকার পক্ষ থেকে সে এই ভাড়া সর্বাবস্থায় পাবে, চাই ব্যবসায় লাভ হোক কিংবা লোকসান হোক। দ্বিতীয়ত, গ্রাহককে ভাড়া প্রদানের পরিবর্তে মুনাফায় তার আনুপাতিক হার বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে 'সেবায় মুদারাবার উপর' কিয়াস করে সঠিক সাব্যস্ত করা যেতে পারে, যা ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর নিকট বৈধ।

(৩) দৈনিক উৎপাদনের ভিত্তিতে চলতি যৌথ একাউন্ট

অনেক আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোন কোন ব্যবসার ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের অর্থায়ন এ পদ্ধতিতে করে যে, (আর্থিক প্রতিষ্ঠানে) উক্ত ব্যবসার জন্য

একটি চলতি একাউন্ট খোলা হয়। যে একাউন্ট থেকে সে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ উত্তোলন করে। এমনিভাবে প্রয়োজনাতিরিক্ত টাকা সে একাউন্টে পুনরায় জমাও দেয়। এভাবে উত্তোলন এবং জমা (Debit and Credit) এর কার্যক্রম মেয়াদ উত্তীর্ণ (Maturity) -এর তারিখ পর্যন্ত চলতে থাকে এবং সুদের হিসাব দৈনিক উৎপাদনের ভিত্তিতে (On the basis of daily products) করা হয়।

এ ধরনের পদ্ধতি মুশারাকা এবং মুদারাবার অর্থায়নে সম্ভব কি না। এ কথা সুস্পষ্ট যে, এটি একটি নতুন পদ্ধতি হওয়ার কারণে এ প্রশ্নের উত্তর সুস্পষ্টভাবে প্রাচীন ইসলামী গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায় না। এতদসত্ত্বেও মুশারাকার মৌলিক ধারণাকে সামনে রেখে এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিম্নবর্ণিত পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

(১) সার্ভিসের জন্য প্রকৃত মুনাফার একটি বিশেষ আনুপাতিক হার নির্ধারণ করতে হবে।

(২) মুনাফার অবশিষ্ট আনুপাতিক অংশ শুধুমাত্র পুঁজি বিনিয়োগকারীর জন্য হতে হবে।

(৩) যদি কোন লোকসান হয়, তাহলে তা শুধুমাত্র পুঁজি বিনিয়োগকারীগণ তাদের পুঁজির অনুপাতে বহন করতে হবে।

(৪) যৌথ একাউন্টে অন্তর্ভুক্তকৃত টাকার স্থিতি গড় (যার হিসাব দৈনিক উৎপাদনের ভিত্তিতে করা হবে) অর্থায়নের শেয়ার ক্যাপিটাল ধরা হবে।

(৫) মেয়াদ শেষে অর্জিত মুনাফার হিসাব দৈনিক উৎপাদনের ভিত্তিতে করা হবে এবং সে অনুযায়ীই তা বণ্টন করা হবে। যদি এ ধরনের চুক্তি উভয়ের মাঝে সাব্যস্ত হয়ে যায়, তাহলে তা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুশারাকার কোন বুনিয়াদি মূলনীতির পরিপন্থি বলে মনে হয় না। এতদসত্ত্বেও এই প্রক্রিয়ার ব্যাপারে অভিজ্ঞ ইসলামী ফিক্‌হবিদদের আরো অধিক গবেষণা এবং অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে। বাহ্যিক কার্যক্রমে এ কথা বুঝা যায় যে, উভয়পক্ষ এ নীতিমালায় একমত হয়েছে যে, মেয়াদান্তে যৌথ একাউন্টে অর্জিত মুনাফা দৈনিক ব্যবহৃত পুঁজির ভিত্তিতে বণ্টিত হবে। যার

অর্থ এটা দাঁড়াবে যে, দৈনিক এক টাকায় অর্জিত মুনাফার গড় বের করে প্রতি দিনের প্রতি টাকার মুনাফার গড়কে তত দিনের সংখ্যার সাথে গুণ দেয়া হবে যত দিন প্রত্যেক পুঁজি বিনিয়োগকারী স্বীয় অর্থ ব্যবসায় রেখেছে। যার ফলে বিনিয়োগকারীর মুনাফায় পাওনাদার হওয়ার ফায়সালা দৈনিক উৎপাদনের ভিত্তিতে করা হবে।

সমকালীন কোন কোন আলিমগণ এ পদ্ধতিতে মুনাফা হিসাব করার অনুমতি প্রদান করেন না। এ ভিত্তিতে যে, এটা একটি আনুমানিক পদ্ধতি- যা কোন অংশীদারের অর্জিত প্রকৃত মুনাফার প্রতিবিম্ব বর্ণনা (عكاسي) করে না। কেননা, এমন হতে পারে যে, কোন এক সময় ব্যবসায় প্রচুর মুনাফা অর্জিত হয়েছে, যখন বিশেষ কোন পুঁজি বিনিয়োগকারীর কোন পুঁজি এ সময়ে ব্যবসায় বিনিয়োগ-ই হয়নি বা হলেও তা ন্যূনতম ও অনুল্লেখযোগ্য পরিমাণ ছিল। অথচ তার সাথে অন্যান্য ঐ সকল পুঁজি বিনিয়োগকারীদের ন্যায় লেনদেন করা হবে, যারা এ সময়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছিল। পক্ষান্তরে কোন সময় ব্যবসায় প্রচুর লোকসান হতে পারে, যখন একজন বিশেষ পুঁজি বিনিয়োগকারী বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছিল, অথচ সে তার লোকসানের একটি অংশ অন্যান্য ঐ সকল পুঁজি বিনিয়োগকারীদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যারা উক্ত সময়ে ব্যবসায় কোন অর্থ বিনিয়োগ করেনি বা করলেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ছিল না।

এ যুক্তির এই উত্তর দেয়া যেতে পারে যে, মুশারাকায় কোন অংশীদারের জন্য শুধুমাত্র তার বিনিয়োগকৃত অর্থ দ্বারা অর্জিত মুনাফাই পেতে হবে তা জরুরী নয়। বরং মুশারাকা অস্তিত্বে আসার পর যৌথ একাউন্টে অর্জিত মুনাফা সকল অংশীদারগণ পাবে। এদিকে লক্ষ্য করা হবে না যে, তাদের অর্থ বিশেষ ব্যবসায় বিনিয়োগ হয়েছে কি না। এ যুক্তিটি বিশেষভাবে ফিক্‌হে হানাফীর উপর প্রযোজ্য হয়। ফিক্‌হে হানাফী অনুযায়ী মুশারাকা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য অংশীদারদের অর্থের আকৃতিতে বিনিয়োগকৃত পুঁজি পরস্পরে মিশ্রণ করে নেওয়া জরুরী নয়। তার অর্থ এটা দাঁড়াল যে, 'ক' যদি 'খ' এর সাথে একটি মুশারাকা চুক্তিতে অন্ত

র্ভুক্ত হয়, কিন্তু 'ক' এখনো যৌথ একাউন্টে তার অর্থ জমা করেনি, তারপরও 'খ' এর অর্থ দ্বারা মুশারাকায় যে মুনাফা অর্জন হবে, তাতে 'ক'ও তার অংশের পাওনাদার হবে।[১] যদিও মুনাফায় তার অংশ পাওয়ার অধিকার লাভ হওয়াটা ঐ অর্থ পরিশোধের সাথে সর্ম্পৃকত, যতটুকুর দায়িত্ব সে নিয়েছিল। তদুপরি এই বাস্তবতা বিদ্যমান যে, এই বিশেষ চুক্তির মুনাফা তার অর্থ থেকে অর্জিত হয়নি। কেননা, পরবর্তীতে 'ক' যখন তার অর্থ পরিশোধ করবে তাতো অন্য কোন লেনদেনে ব্যবহৃত হবে। যেমন- 'ক' এবং 'খ' এক লাখ টাকা দিয়ে ব্যবসা করার জন্য একটি মুশারাকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তারা উভয়ে এ সিদ্ধান্ত করল যে, প্রত্যেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করবে এবং মুনাফা সমহারে বণ্টিত হবে। 'ক' এখনও তার পঞ্চাশ হাজার টাকা যৌথ একাউন্টে জমা করেনি, ইতিমধ্যে 'খ' একটি লাভজনক ব্যবসা দেখে নিজের পক্ষ থেকে বিনিয়োগকৃত পঞ্চাশ হাজার টাকা দ্বারা মুশারাকার জন্য দু'টি এয়ার কন্ডিশনার ক্রয় করে ষাট হাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়েছে। যাতে দশ হাজার টাকা মুনাফা অর্জন হয়েছে। 'ক' তার অংশ পঞ্চাশ হাজার টাকা এই ব্যবসার পর যৌথ একাউন্টে জমা করেছে, তার পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে দু'টি রিফ্রিজারেটর ক্রয় করে আটচল্লিশ হাজার টাকার ঊর্ধ্বে বিক্রি করা যাচ্ছে না, অর্থাৎ- এতে দু'হাজার টাকা লোকসান হয়েছে। যদিও 'ক'-এর অর্থ দ্বারা কৃত ব্যবসায় দু'হাজার টাকা লোকসান হয়েছে, অথচ এয়ার কন্ডিশনারে মুনাফায় শুধুমাত্র 'খ'-এর টাকা ব্যবহৃত হয়েছে, যাতে 'ক'-এর কোন অংশ ছিল না, তদুপরি 'ক' প্রথম (এয়ার কন্ডিশনারে) ব্যবসার মুনাফায় তার অংশের পাওনাদার হবে। দ্বিতীয় (রিফ্রিজারেটর) ব্যবসায় যে দু'হাজার টাকা লোকসান হয়েছে, তা প্রথম ব্যবসার মুনাফা থেকে বিয়োগ করা হবে। ফলে মোট মুনাফা হবে আট হাজার টাকা। এই আট হাজার টাকা উভয়ের মাঝে সমহারে বণ্টিত হবে। অর্থাৎ 'ক' চার হাজার টাকা পাবে, যদিও তার অর্থ দ্বারা কৃত ব্যবসায় লোকসান হয়েছিল।

---

১. বাদায়িউস সানাই, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা নং- ৫৪, ৬০।

কারণ, যখন উভয়পক্ষ মুশারাকা চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তখন মুশারাকার জন্য যে কোন চুক্তি হবে তা এই যৌথ একাউন্টের সাথে সম্বন্ধ-যুক্ত হবে। এদিকে দৃষ্টিপাত করা হবে না যে, এই ব্যবসায় কার অর্থ এককভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। এই মুশারাকা চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে প্রত্যেকেই প্রত্যেক ব্যবসায় অংশীদার হবে।

উপরোল্লেখিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপর একটি সম্ভাব্য প্রশ্ন হতে পারে যে, উল্লেখিত উদাহরণে 'ক' পঞ্চাশ হাজার টাকা দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছিল, আর ব্যবসা শুরু করার পূর্বেই জানা ছিল যে, সে এত টাকা মুশারাকায় বিনিয়োগ করবে। কিন্তু প্রচলিত মুশারাকার চলতি একাউন্ট যেখানে নতুন অংশীদার প্রতিদিন অন্তর্ভূক্ত হয় পুরাতন কেউ কেউ চলে যায়। এতে কোন অংশীদার নির্দিষ্ট পরিমাণ কোন অর্থ বিনিয়োগ করার দায়িত্ব নিজের উপর নেয় না। সুতরাং মুশারাকায় অন্তর্ভুক্তির সময় প্রত্যেক পক্ষ থেকে বিনিয়োগকৃত পুঁজি অনির্দিষ্ট থাকে। যার ফলে মুশারাকা সঠিক না হওয়া উচিত।

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, মুশারাকা সঠিক হওয়ার জন্য সমুদয় মূলধনের পরিমাণ সম্পর্কে অংশীদারদের পূর্ব থেকেই জানা থাকা জরুরী কি না, এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী ফিক্‌হবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন ধরনের। হানাফী ফিক্‌হবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, মুশারাকা সঠিক হওয়ার জন্য তা শর্ত নয়। প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা কাসানী লিখেন-

وأما العلم بقدر رأس المال وقت العقد فليس بشرط لجواز الشركة بالأموال عندنا، وعند الشافعي شرط .... ولنا أن الجهالة لا تمنع جواز العقد لعينها، بل لإفضائها إلى المنازعة، وجهالة رأس المال وقت العقد لا تفضي إلى المنازعة، لأنه يعلم مقداره ظاهرا وغالبا، لأن الدراهم والدنانير توزنان وقت الشراء فيعلم مقدارها، فلايؤدي إلى جهالة مقدار الربح وقت القسمة.

'আমাদের (হানাফীদের) নিকট শিরকাতুল আমওয়াল বৈধ হওয়ার জন্য এটা জরুরী নয় যে, চুক্তির সময় মূলধনের পরিমাণ জানা থাকতে হবে। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর নিকট তা শর্ত,-। আমাদের প্রমাণ হল- অজ্ঞতা সত্তাগতভাবে চুক্তির বৈধতার জন্য প্রতিবন্ধক নয়। বরং এ কারণে প্রতিবন্ধক যে, এর দ্বারা ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার কারণ হতে পারে। আর চুক্তির সময় মূলধন জানা না থাকা ঝগড়ার কারণ হয় না। কেননা, মূলধনের পরিমাণ সাধারণত মুশারাকার জন্য কোন দ্রব্য ক্রয় করার সময় পরিজ্ঞাত হয়ে যায়। সুতরাং বণ্টনের সময় মুনাফার পরিমাণে অজ্ঞতা সৃষ্টি হবে না।'[১]

এ কথা সত্য যে, চলতি যৌথ একাউন্টের পদ্ধতি, যে একাউন্টে অংশীদারগণ যে কোন সময় যে কোন পরিমাণ টাকা উত্তোলন করতে পারে এবং যে কোন পরিমাণ টাকা জমা করতে পারে আর মুনাফা দৈনিক উৎপাদনের ভিত্তিতে বণ্টন হয়, এ পদ্ধতি ইসলামী ফিক্‌হের প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায় না। তবে এ না পাওয়া যাওয়া কোন পদ্ধতিকে শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ সাব্যস্ত করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা মুশারাকার বুনিয়াদী মূলনীতির পরিপন্থি না হবে। প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে সকল অংশীদারদের সাথে একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। প্রত্যেক অংশীদারদের মুনাফার হিসাব ঐ মেয়াদের ভিত্তিতে করা হয়, যতদিন তার অর্থ যৌথ একাউন্টে ছিল। নিঃসন্দেহে যৌথ একাউন্টে সামগ্রিকভাবে অর্জিত মুনাফা ঐ অর্থ যৌথভাবে ব্যবহার করার কারণে অর্জিত হয়েছে, যা অংশীদারগণ বিভিন্ন সময় জমা করেছিল। যদি সকল অংশীদার পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নেয় যে, মুনাফা দৈনিক উৎপাদনের ভিত্তিতে বণ্টন হবে, তাহলে এমন কোন শরয়ী নিষেধাজ্ঞা নেই যা তাকে অবৈধ সাব্যস্ত করবে। বরং উল্টা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ মৌলিক হেদায়াতের সমর্থনই পাওয়া যায় যা পূর্বে কয়েকবার উল্লেখিত প্রসিদ্ধ হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে-

"المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما"

---

[১] ১. (বাদায়িউস সানাই, ৬/৬৩)।

"মুসলমানদের পারস্পরিক চুক্তিসমূহ পালনীয়, যতক্ষণ পর্যন্ত এ চুক্তি হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল না করবে।"

(আবূ দাউদ, হাদ্বীস নং-৩৫৫৫)।

যদি দৈনিক উৎপাদনের ভিত্তিতে মুনাফা বণ্টন পদ্ধতিকে গ্রহণ না করা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে, কোন অংশীদার যৌথ একাউন্ট থেকে অর্থ উত্তোলনও করতে পারবে না এবং নতুন কোন গ্রাহক অর্থ জমাও করতে পারবে না। এমনিভাবে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত নতুন করে কোন পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন কোন নির্দিষ্ট তারিখ না আসবে। ব্যাংকের যে আমানতকারীগনের পক্ষ থেকে (Deposits Side) দৈনিক কয়েকবার অর্থ জমা দেয়া এবং উত্তোলন করা হয়, তাদের জন্য এ প্রক্রিয়া একেবারে অকার্যকর হয়ে যাবে। দৈনিক উৎপাদনের পদ্ধতিকে অস্বীকার করার দ্বারা এসব আমনতকারীগণ তাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ কোন লাভজনক একাউন্টে জমা করার পূর্বে কয়েক মাস অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়ে যাবে। এর দ্বারা শিল্প এবং ব্যবসার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে এবং দীর্ঘ মেয়াদের জন্য অর্থায়ন বিভাগের কার্যক্রম নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে। এ সমস্যার সমাধান দৈনিক উৎপাদনের পদ্ধতি অবলম্বন করা ব্যতীত সম্ভব নয়। যেহেতু এটা শরীয়তের কোন বিধানের পরিপন্থি নয়, সেহেতু এ পদ্ধতি অবলম্বন না করার কোন যৌক্তিকতা নেই।

যৌথ অর্থায়নের উপর কয়েকটি অভিযোগ

এ পর্যায়ে আমরা ঐ সকল অভিযোগের নিরীক্ষা করব যা মুশারাকাকে অর্থায়নের পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে বাস্তব দৃষ্টিতে উত্থাপন করা হয়।

(১) লোকসানের ঝুঁকি

একটি অভিযোগ এই যে, মুশারাকা পদ্ধতি অবলম্বন করার ক্ষেত্রে ব্যবসার লোকসান অর্থায়নকারী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দিকে ধাবিত

হওয়ার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে। অতঃপর এই লোকসান সাধারণ আমানতকারীগণদের দিকেও ধাবিত হবে। আমানতকারীগণকে যেহেতু স্থায়ীভাবে লোকসানের আশংকায় ফেলা হচ্ছে, সেহেতু তারা ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তাদের অর্থ জমা রাখতে অনুৎসাহী হয়ে যাবে। যার ফলে এ প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ হয়ত নিষ্ক্রিয় ও শ্লথ হয়ে যাবে, অথবা ব্যাংকিং পদ্ধতি ভিন্ন অন্য কোন পন্থায় ব্যবহৃত হবে। এভাবে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ অর্থসমূহের কোন ভূমিকাই থাকবে না। কিন্তু এ অভিযোগের ভিত্তি ভুল বুঝাবুঝির উপর। মুশারাকার ভিত্তিতে অর্থায়ন করার পূর্বে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঐ প্রস্তাবিত ব্যবসার সম্ভাব্যতা (Feasibility) যাচাই করে নিবে, যার জন্য ফান্ড প্রয়োজন। এমনকি বর্তমান সুদি ব্যাংকিং পদ্ধতিতেও ব্যাংক প্রত্যেক আবেদনকারীর ঋণ মঞ্জুর করে না। বরং তারা ব্যবসার সম্ভাব্যতা যাচাই করে নেয়। যদি তাদের আশংকা হয় যে, এই ব্যবসা লাভজনক নয়, তাহলে তারা ঋণ প্রদান করতে অস্বীকার করে। মুশারাকার ক্ষেত্রে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই সম্ভাব্যতা অত্যন্ত গভীরভাবে এবং সতর্কতার সাথে যাচাই করে নিবে।

অধিকন্তু কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজেকে শুধুমাত্র একটি মুশারাকায় সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না। বরং তাদের বিভিন্ন রকমের মুশারাকা থাকবে। যদি কোন ব্যাংক তার গ্রাহকদের (Clients) থেকে একশ' গ্রাহকের সাথে মুশারাকার ভিত্তিতে অর্থায়ন করে এবং এ অর্থায়নও ব্যাংক তাদের প্রত্যেকের প্রস্তাবিত ব্যবসার সম্ভাব্যতা যাচাই করে করে তাহলে এ ধারণা করা অত্যন্ত দুষ্কর যে, তাদের প্রত্যেকেই বা অধিকাংশ গ্রাহক লোকসানে পতিত হবে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনের পর বেশির চেয়ে বেশি এতটুকু হতে পারে যে, তাদের কারো কারো ব্যবসায় লোকসান হয়ে যাবে। কিন্তু অপরদিকে লাভজনক মুশারাকা ব্যবসায় সুদি ঋণের তুলনায় অধিক মুনাফার আশা করা যায়। কেননা প্রকৃত মুনাফা ব্যাংক এবং গ্রাহকের (Client) মাঝে বণ্টন হবে। এ কারণে মুশারাকার সকল সেক্টরে লোকসানের আশংকা করা যায় না। আর সামগ্রিকভাবে লোকসানের সম্ভাবনা শুধুমাত্র কাল্পনিক বিষয়, যা আমানতকারীগণকে অনুৎসাহী করবে না। কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এ

ধরনের কাল্পনিক সম্ভাব্যতা কোন জয়েন্ট স্টক কোম্পানীতে লোকসানের সম্ভাব্যতা থেকে অনেক কম, যার ব্যবসা একটি সীমিত সেক্টরে সীমাবদ্ধ থাকে। এতদসত্ত্বেও মানুষ তার শেয়ার ক্রয় করে এবং লোকসানের এ সম্ভাব্যতা তাদেরকে ঐ শেয়ারে পুঁজি বিনিয়োগ করা থেকে বিরত রাখে না। ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা ব্যবস্থাপনা জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর তুলনায় যথেষ্ট সুদৃঢ় ও সুসংগঠিত। কেননা তাদের মুশারাকা ব্যবসা বিভিন্ন প্রকার হবে যে, প্রত্যেক মুশারাকায় সম্ভাব্য লোকসানের ক্ষতিপূরণ অন্যান্য মুশারাকা ব্যবসায় অর্জিত মুনাফা দ্বারা হয়ে যাবে।

এ ছাড়া ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্রে এমন মন-মানসিকতা সৃষ্টি করা উচিত যার দ্বারা এ বিশ্বাস করা যায় যে, বিনিয়োগকৃত অর্থ দ্বারা অর্জিত যে কোন মুনাফা ব্যবসার ঝুঁকি গ্রহণ করার প্রতিদান। অভিজ্ঞতা এবং ব্যবসার সকল সেক্টরের পরিধি বিস্তৃত করে এ ঝুঁকি এত কমানো যায় যে, তা একেবারে কাল্পনিক হিসেবে থেকে যাবে। তবে এ ঝুঁকি একেবারে দূর করার কোন পন্থা বা উপায় নেই। যে কেউ মুনাফা অর্জন করতে চায়, তাকে এ ধরনের সাধারণ ঝুঁকি অবশ্যই বহন করতে হবে। সাধারণ জয়েন্ট স্টক কোম্পানীতেও এ ধরনের ঝুঁকি রয়েছে, অথচ কখনো কেউ এ ধরনের অভিযোগ করেনি যে, শেয়ার হোল্ডারের অর্থ লোকসানে ফেলে দিয়েছে। এ সমস্যা প্রচলিত ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতির সৃষ্টি, যা ব্যাংকিং এবং অর্থায়নের কর্মতৎপরতাকে সাধারণ ব্যবসায়িক কর্মতৎপরতা থেকে আলাদা করে দিয়েছে। প্রচলিত পদ্ধতি মানুষদেরকে এ কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে যে, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র মুদ্রা এবং মুদ্রার দলীল দস্তাবেজের ব্যবসা করতে পারে, তাদের শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। যার কারণে তারা সর্বাবস্থায় নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা পাওয়ার দাবী করে। অর্থায়ন খাত (SECTOR) এবং শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতের মাঝে এই ভিন্নতা সামষ্টিক অর্থনীতিতে (MACRO ECONOMICS) মারাত্মক ক্ষতি সাধন করেছে। একথা সুস্পষ্ট যে, ইসলামী ব্যাংকিং-এর আলোচনা দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই এটা নয় যে, ইসলামী ব্যাংক প্রত্যেক ক্ষেত্রে আধুনিক ব্যাংকের অনুসরণ করবে। ইসলামের নিজস্ব রূপ ও নীতিমালা রয়েছে যা অর্থায়নকে

শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে ভিন্ন মনে করে না। যখন এই ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনা বুঝে আসবে, তখন লোকসানের কাল্পনিক আশংকা থাকা সত্ত্বেও মানুষ লাভজনক কোম্পানীতে যে আগ্রহ ও উৎসাহের সাথে পুঁজি বিনিয়োগ করে, এর চেয়ে অধিক উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে ইসলামী অর্থায়ন সেক্টরে (Financing Sector) পুঁজি বিনিয়োগ করবে।

(২) দীনদারী না থাকা

মুশারাকা অর্থায়নের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ এই উত্থাপন করা হয় যে, বদদীন গ্রাহক মুশারাকার এই পদ্ধতিকে অবৈধভাবে ব্যবহার করবে এবং অর্থায়নকারীকে কোন মুনাফা প্রদান করবে না। সে সর্বদা এটাই দেখাবে যে, ব্যবসায় কোন মুনাফা অর্জিত হয়নি। বরং হাক্বীকৃত হল সে এই দাবীও করতে পারে যে, ব্যবসায় লোকসান হয়েছে। যার ফলে লাভতো দূরের কথা আসল পুঁজি ফিরে পাওয়াও আশংকাজনক হয়ে পড়বে। নিঃসন্দেহে এটি একটি যথার্থ আশংকা। বিশেষ করে যে সমাজে চুরি ডাকাতি নিত্য-নৈমিত্তিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তবে এ সমস্যার সমাধান এত জটিলও নয় যা সাধারণত প্রচার করা হয় কিংবা বাড়িয়ে বর্ণনা করা হয়।

যদি কোন দেশের সকল তফসিলী ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক রাষ্ট্রের পূর্ণ সহায়তায় ইসলামী পদ্ধতি অনুযায়ী চালানো যায়, তাহলে বদদীনীর সমস্যার সমাধান জটিল হবে না। সর্বপ্রথম কথা এই যে, গ্রাহকদের হিসাব-নিকাশ রাখার জন্য উত্তম পদ্ধতিতে ডিজাইনকৃত অডিট সিস্টেম চালু করতে হবে এবং তা যথাযথভাবে কনট্রোল করতে হবে। এব্যাপারে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, মুনাফার নির্ধারণ শুধুমাত্র গ্রোস প্রফিটের ভিত্তিতে করা হবে। এর দ্বারা দ্বন্দ্ব-কলহ এবং ঘুষের প্রবণতা হ্রাস পাবে। এরপরও গ্রাহকের পক্ষ থেকে যদি কোনরূপ বদদীনী, অনিয়ম বা উদাসীনতা পাওয়া যায়, তাহলে তাকে সতর্কতামূলক শাস্তির সম্মুখীন করা হবে এবং তাকে দেশের যে কোন ব্যাংক থেকে যে কোন ধরণের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করার ব্যাপারে কমপক্ষে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বঞ্চিতও করা যেতে পারে। এই পদক্ষেপ প্রকৃত মুনাফা গোপন বা অন্য যে

কোন বদদীনী পন্থা অবলম্বনের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য প্রতিবন্ধক হিসেবে প্রমানিত হবে। অধিকন্তু ব্যাংকের গ্রাহকগণ স্বাধীনভাবে লোকসান দেখানোরও সাহস পাবে না। কেননা, লোকসান দেখানোর বিভিন্নভাবে তাদের স্বার্থের পরিপন্থি হবে। একথা সত্য যে, উপরোল্লিখিত কৌশল অবলম্বন করা সত্ত্বেও এমন পরিস্থিতির সম্ভাবনা রয়েছে, যে পরিস্থিতিতে কোন কোন গ্রাহক তার অসৎ উদ্দেশ্যে সফল হয়ে যেতে পারে। তবে শাস্তির পদক্ষেপ এবং ব্যবসার সাধারণ পরিবেশ এ ধরণের সুযোগ হ্রাস করে দিবে। (স্বয়ং সুদি অর্থনীতিতেও ঋণ খেলাফী ব্যক্তি ঋনকে উসূলের অযোগ্য করে (Bad Debts) জটিলতা সৃষ্টি করতে থাকে) কোন কোন গ্রাহকের অসৎ উদ্দেশ্য সফল হওয়া মুশারাকার পূর্ণ সিষ্টেমকে অস্বীকার করার যুক্তি সঙ্গত কারণ বা ওজর হতে পারে না।

নিঃসন্দেহে বদদীনীর এই আশংকা ঐ সব ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য অনেক বেশি রয়েছে যারা আধুনিক ব্যাংকের সাধারণ কার্যক্রম থেকে পৃথক হয়ে কাজ পরিচালনা করে। তাদের প্রতি দেশীয় প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তেমন কোন সহযোগিতা থাকে না। ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান তারা তাদের সিস্টেমও পরিবর্তন করতে পারে না এবং বিধি-বিধানও অমান্য করতে পারে না। কিন্তু তাদের একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, তারা শুধুমাত্র ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান-ই নয়, বরং তারা এমন একটি সিস্টেমকে পরিচিত করানোর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার নিজস্ব একটি দর্শন রয়েছে। তাদের দায়িত্ব হল, এই পদ্ধতিকে অগ্রসর করানো যদিও এর কারণে কোন এক পর্যায়ে তাদের মুনাফার হার স্বল্প হওয়ার আশংকা থাকে। এ জন্য তাদের কমপক্ষে কয়েকটি নির্বাচিত নীতিমালার উপর ভিত্তি করে মুশারাকার ব্যবহার শুরু করা উচিত। প্রত্যেক ব্যাংকের অবশ্যই এমন কিছু গ্রাহক থাকে যাদের ঈমানদারী সন্দেহ-সংশয়ের ঊর্ধ্বে থাকে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের কমপক্ষে ঐ সকল গ্রাহকদের সাথে অর্থায়ন সহীহ মুশারাকার ভিত্তিতে করা উচিত। এর দ্বারা সমাজে উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপনে সহায়ক হবে এবং অন্যরা তাদের অনুসরণের ব্যাপারে উৎসাহী হবে। অধিকন্তু এমন কিছু সেক্টরও রয়েছে, যেখানে মুশারাকার ভিত্তিতে অর্থায়ন অতীব সহজতার সাথে হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এক্সপোর্ট ফিন্যান্সিং (রপ্তানির অর্থায়ন)-এ মুশারাকাকে

ব্যবহার করা হলে বদদীনীর তেমন কোন সুযোগ থাকে না। কেননা, রপ্তানিকারকের নিকট বিদেশের গ্রাহকের একটি নির্দিষ্ট অর্ডার বিদ্যমান থাকে। মূল্য নির্ধারিত থাকে। ব্যয়ের আন্দাজ করাতেও কোন জটিলতা নেই। মূল্য পরিশোধে সাধারণত এলসির কারণে অনিয়ম হয় না। মূল্য পরিশোধ স্বয়ং ব্যাংকের মাধ্যমেই হয়। এমতাবস্থায় মুশারাকা পদ্ধতি অবলম্বন করাতে কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে কিছু সতর্কতার সাথে ইমপোর্ট ফিন্যান্সিং (আমদানীর অর্থায়ন)ও মুশারাকার ভিত্তিতে হতে পারে। যা এ অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে বর্ণনা করা হয়েছে।

(৩) ব্যবসার গোপনীয়তা

মুশারাকার উপর আরেকটি অভিযোগ এটা করা হয় যে, অর্থায়নকারী (Financier) কে গ্রাহকের ব্যবসায় অংশীদার বানানোর দ্বারা ব্যবসার গোপনীয়তা তার (অর্থায়নকারীর) নিকট এবং তার মাধ্যমে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের নিকট ফাঁস হয়ে যাবে।

কিন্তু এর সমাধান অত্যন্ত সহজ। মুশারাকায় অন্তর্ভুক্তির সময় গ্রাহক (Client) এ শর্তারোপ করতে পারে যে, অর্থসংস্থানকারী (Financier) ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না এবং সে ব্যবসার কোন ধরনের তথ্য কোন ব্যক্তিকে গ্রাহকের অনুমতি ব্যতীত পরিবেশন করবে না। গোপনীয়তা ঠিক রাখার এ ধরনের চুক্তিকে মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান সম্মান করে। বিশেষত ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান যাদের সমুদয় ব্যবসা-ই গোপনীয়তার ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

(৪) গ্রাহকের মুনাফায় অংশীদারিত্বের ব্যাপারে উৎসাহী না হওয়া

কখনো কখনো এ কথা বলা হয় যে, গ্রাহক ব্যাংকসমূহের সাথে প্রকৃত মুনাফায় অংশীদার হতে চায় না, এই নিরুৎসাহিতার ভিত্তি দু'টি জিনিসের উপর।

(১) গ্রাহক মনে করে প্রকৃত মুনাফা, যা প্রচুর পরিমাণেও হতে পারে, তাতে ব্যাংক অংশীদারিত্বের কোন অধিকার রাখে না। কেননা, ব্যবসার ব্যবস্থাপনা এবং তা পরিচালনায় ব্যাংকের কোন ভূমিকা থাকে না। তাহলে

গ্রাহক তার পরিশ্রমের উপার্জিত মুনাফায় ব্যাংকসমূহকে কেন অংশীদার করবে যারা শুধুমাত্র ফান্ড সরবরাহ করে। গ্রাহক এই যুক্তিও প্রদান করে যে, আধুনিক ব্যাংক কিঞ্চিৎ সুদের হারে ঋণ প্রদান করতে রাজি হয়ে যায়, ইসলামী ব্যাংকসমূহেরও এরূপ করা উচিত।

(২) এ ছাড়া গ্রাহক এ ব্যাপারেও ভীতিপ্রদ থাকে যে, তার প্রকৃত মুনাফার পরিমাণ সম্পর্কে ব্যাংকের অবগতি হয়ে যাবে এবং তাদের মাধ্যমে এ তথ্য ইনকাম ট্যাক্সের কর্মকর্তাদের নিকট পৌঁছে যাবে, যার ফলে গ্রাহকের ইনকাম ট্যাক্সের হার বেড়ে যাবে।

প্রথম সমস্যার সমাধান যদিও সহজ নয়, তবে খুব জটিল এবং অসম্ভবও নয়। এ ধরনের গ্রাহকদেরকে এ কথা বুঝানোর চেষ্টা করা উচিত যে, কোনরূপ বাধ্য-বাধকতা ব্যতীত সুদি ঋণ গ্রহণ করা অত্যন্ত গুনাহ ও পাপের কাজ। শুধুমাত্র ব্যবসাকে বৃহদায়তন ও প্রশস্ত করা কোন ক্রমেই মারাত্মক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত নয়। মুশারাকার মাধ্যমে স্বীয় ব্যবসার জন্য বৈধ ফান্ডের সরবরাহের ব্যবস্থা করে সে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিই অর্জন করবে না বরং নিজের জন্য এবং ইসলামী ব্যাংক-এর জন্য মুনাফাকেও হালাল করবে।

দ্বিতীয় সমস্যার ব্যাপারে এ কথা বলা যেতে পারে যে, কোন কোন মুসলিম দেশে ইনকাম ট্যাক্সের হার অবৈধ এবং ন্যায়সঙ্গত নয়। ইসলামী ব্যাংকসমূহ এবং তাদের সকল গ্রাহকদের উচিত প্রশাসনকে বুঝানোর চেষ্টা করা এবং ঐসব নীতিমালা পরিবর্তনের ব্যাপারে মেহনত-প্রচেষ্টা করা যা ইসলামী ব্যাংকের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। প্রশাসনেরও এ বিষয়টি বুঝা উচিত যে, ইনকাম ট্যাক্সের হার যদি যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত হয়, তাহলে রাজস্ব আয় কমবে না বরং বৃদ্ধি হবে এবং ট্যাক্স উসূলকারীদেরও বুঝাতে হবে যে, সততার সাথে ট্যাক্স আদায়ে তাদেরও লাভ রয়েছে।

ক্ষীয়মান অংশীদারিত্ব
(Diminishing Musharakah)

মুশারাকার আরেকটি পদ্ধতি যাকে সাম্প্রতিককালে প্রসারিত করা হয়েছে। তাহল "ক্ষীয়মান অংশীদারিত্ব"[১]। এই পদ্ধতি অনুযায়ী অর্থায়নকারী এবং তার গ্রাহক কোন যমীন, আসবাবপত্র কিংবা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের যৌথ মালিকানা লাভ করে, অর্থায়নকারীর অংশ বিভিন্ন ইউনিটে বিভক্ত করা হয় এবং একথা পরিজ্ঞাত থাকে যে, গ্রাহক অর্থায়নকারীর অংশের ইউনিটসমূহ ক্রমান্বয়ে এক এক করে ক্রয় করতে থাকবে। এক একটি ইউনিট ক্রয়ের ফলে অর্থায়নকারীর অংশ কম হতে থাকবে। এক পর্যায়ে গ্রাহক অর্থায়নকারীর সমুদয় অংশ ক্রয় করে ফেলবে এবং যমীন কিংবা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের এককভাবে মালিক হয়ে যাবে।

ক্ষীয়মান অংশীদারিত্বের এই পদ্ধতিকে বিভিন্ন লেনদেনে বিভিন্নভাবে অবলম্বন করা যায়। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে।

(১) এই পদ্ধতিকে ব্যাপকভাবে হাউজ ফিন্যান্সিং (গৃহ নির্মান অর্থায়ন)-এর জন্য ব্যবহার করা যায়। গ্রাহক একটি বাড়ি ক্রয় করতে ইচ্ছুক, কিন্তু তার নিকট বাড়ি ক্রয় করার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা বিদ্যমান নেই। এমতাবস্থায় গ্রাহক অর্থায়নকারীর স্মরণাপন্ন হয়, ফলে অর্থায়নকারী বাড়ি ক্রয়ে গ্রাহকের সাথে অংশীদারিত্বের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে যায়। বাড়ির মুল্যের (২০%) বিশ পার্সেন্ট গ্রাহক পরিশোধ করে এবং (৮০%) আশি পার্সেন্ট পরিশোধ করে অর্থায়নকারী। সুতরাং বাড়ির আশি পার্সেন্টের মালিক অর্থায়নকারী এবং বিশ পার্সেন্টের মালিক

---

১. অর্থাৎ ক্রমশ হ্রাসের ভিত্তিতে অংশীদারিত্ব।

গ্রাহক। বাড়ি যৌথভাবে ক্রয়ের পর গ্রাহক বাড়িকে তার বসবাসের প্রয়োজনে ব্যবহার করে এবং অর্থায়নকারীকে তার অংশ ব্যবহার করার কারণে ভাড়া প্রদান করে। এর সাথে সাথে অর্থায়নকারীর অংশকে সমান আটটি ইউনিটে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেকটি ইউনিট বাড়ির দশ পার্সেন্ট মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে। (কেননা তার পূর্ণ মালিকানা ছিল আশি পার্সেন্ট)। গ্রাহক অর্থায়নকারীর সাথে এই অঙ্গীকার করে যে, প্রত্যেক তিন মাস পর পর একটি ইউনিট ক্রয় করবে। সুতরাং তিন মাসের প্রথম মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর সে বাড়ির মূল্যের দশ পার্সেন্ট পরিশোধ করে একটি ইউনিট ক্রয় করে নেয়। এর দ্বারা অর্থায়নকারীর অংশ আশি পার্সেন্ট থেকে হ্রাস পেয়ে সত্তর পার্সেন্ট হয়ে যাবে। এই অনুপাতে অর্থায়নকারীকে পরিশোধ্য ভাড়াও কম হতে থাকবে। দ্বিতীয় মেয়াদ পূর্ণ হলে গ্রাহক আরেকটি ইউনিট ক্রয় করে নিবে। যার ফলে বাড়িতে তার অংশ বৃদ্ধি পেয়ে চল্লিশ পার্সেন্ট এবং অর্থায়নকারীর অংশ হ্রাস পেয়ে ষাট পার্সেন্ট হয়ে যাবে। আর সেই অনুপাতে ভাড়াও কম হয়ে যাবে। এভাবে এই ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে, এমনকি দু'বছর সমাপ্তির পর গ্রাহক অর্থায়নকারীর সমুদয় অংশ ক্রয় করে নিবে, যার ফলে তার অংশ শেষ হয়ে যাবে এবং গ্রাহকের অংশ একশ' পার্সেন্ট হয়ে যাবে।

এই পদ্ধতি অর্থায়নকারীকে এ অনুমতি প্রদান করে যে, বাড়িতে তার মালিকানা অনুপাতে ভাড়ার দাবী করতে পারবে এবং সাথে সাথে স্বীয় অংশের ইউনিটসমূহ বিক্রি করে আসল পুঁজি ক্রমান্বয়ে ফেরত নিয়ে নিতে পারবে।

(২) "ক" যাত্রীদেরকে ভ্রমণ সেবা প্রদানের জন্য একটি গাড়ি ক্রয় করতে ইচ্ছুক, যাতে যাত্রীদের থেকে গৃহীত ভাড়া দ্বারা আয় উপার্জন করতে পারে। কিন্তু তার নিকট সেই পরিমাণ ফান্ড নেই। এমতাবস্থায় "খ" গাড়ির ক্রয়ে অংশীদারিত্বের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। ফলে তারা উভয়ে যৌথভাবে একটি গাড়ি ক্রয় করে নেয়। ৮০% মূল্য "খ" পরিশোধ করে এবং ২০% মূল্য "ক" পরিশোধ করে। অতঃপর এই গাড়িটি যাত্রীদের ভ্রমণ সেবার কাজে নিয়োজিত করা হয়। এর থেকে দৈনিক ১০০০/=

টাকা আয় হয়। যেহেতু গাড়িতে "খ"-এর অংশ ৮০%, সেহেতু এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করে নেয়া হয়েছে যে, ভাড়ার ৮০% "খ" পাবে এবং ২০% "ক" পাবে, গাড়িতে তার অংশও ২০%। এর অর্থ হল এই যে, দৈনিক ৮০০/= টাকা "খ" এবং ২০০/= টাকা "ক" পাবে। তিন মাস পর "ক" "খ"এর অংশ থেকে একটি ইউনিট ক্রয় করে নিয়েছে। যার ফলে "খ" এর অংশ কমে ৭০% এবং "ক" এর অংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩০% হয়ে গিয়েছে। যার অর্থ এটা হল যে, ঐ তারিখ হতে "ক" দৈনিক আয় থেকে ৩০০/= টাকা এবং "খ" ৭০০/= টাকার পাওনাদার হব। এ পদ্ধতি চলতে থাকবে, এমনকি দু'বছর সমাপ্তির পর গাড়ি সম্পূর্ণভাবে "ক" এর মালিকানায় হয়ে যাবে, "খ" উল্লেখিত নিয়মানুযায়ী আয়ের স্বীয় অংশ এবং তার আসল পুঁজিও ফেরত পেয়ে যাবে।

(৩) "ক" রেডিমেট গার্মেন্টসের ব্যবসা শুরু করতে চায়, কিন্তু তার কাছে ঐ ব্যবসার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা বিদ্যমান নেই। এমতাবস্থায় "খ" একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ যথা- দু'বছরের জন্য তার সাথে অংশীদারিত্বের ব্যাপারে রাজী হয়ে যায়। চল্লিশ পার্সেন্ট পুঁজি বিনিয়োগ করে "ক" এবং ষাট পার্সেন্ট বিনিয়োগ করে "খ"। উভয়ে মুশারাকার ভিত্তিতে ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে এবং মুনাফার হারও সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে নিয়েছে। এর সাথে সাথে ব্যবসায় "খ" এর অংশকে সমান ছয়টি ইউনিট বানানো হয় এবং "ক" ধীরে ধীরে তা ক্রয় করা শুরু করে দেয়। এমনকি দু'বছরান্তে "খ" ব্যবসা থেকে বের হয়ে যায় এবং "ক" ব্যবসার একক মালিক হয়ে যায়। "খ" বিভিন্ন মেয়াদে মুনাফা পাওয়া ছাড়াও স্বীয় ইউনিটসমূহের মূল্যও পেয়ে যাবে। যা মূলত তার আসল পুঁজি ফেরত পাওয়ার সদৃশ্য।

শরীয়তের দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এই পদ্ধতিসমূহ বিভিন্ন লেনদেনের সমষ্টি। যা বিভিন্ন পর্যায়ে স্বীয় দায়িত্ব আদায় করে। এ জন্য ক্ষীয়মান অংশীদারিত্বের উপরোল্লিখিত তিনটি উদাহরণ সম্পর্কে ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

ক্ষীয়মান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে হাউজ ফিন্যান্সিং

প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে নিম্নল্লোখিত বিষয়সমূহ রয়েছে।

১. বাড়িতে যৌথ মালিকানা সৃষ্টি করা। (শিরকাতুল মিলক)

২. অর্থায়নকারীর অংশ গ্রাহককে ভাড়ায় প্রদান করা।

৩. অর্থায়নকারী ক্লায়েন্ট (গ্রাহক) থেকে তার অংশ ক্রয়ের অঙ্গীকার নেয়া।

৪. বিভিন্ন ধাপে বাস্তবে তার ইউনিটসমূহ ক্রয় করা।

৫. বাড়িতে অর্থায়নকারীর অবশিষ্টাংশ অনুপাতে ভাড়া নির্ধারণ।

এ পর্যায়ে আমরা এই পদ্ধতির বিষয়সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা করব।

(১) উল্লেখিত পদ্ধতিতে প্রথম ধাপ বাড়িতে যৌথ মালিকানা সৃষ্টি করা। এ বিষয়টি এ অধ্যায়ের শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শিরকাতুল মিলক বিভিন্ন পদ্ধতিতে অস্তিত্বে আসতে পারে। যার মধ্যে উভয়পক্ষের যৌথভাবে ক্রয় করাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ পদ্ধতিকে সকল ফিক্‌হবিদগণ সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ বলে সাব্যস্ত করেছেন[১]। তাই এভাবে যৌথ মালিকানা সৃষ্টি করার ব্যাপারে কোন অভিযোগ হতে পারে না।

(২) এই পদ্ধতির দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে অর্থায়নকারী তার স্বীয় অংশ গ্রাহককে ভাড়ায় (Lease) প্রদান করে এবং এর বিনিময়ে তার থেকে ভাড়া উসূল করে। এই পদ্ধতিও সম্পূর্ণ বৈধ। কেননা, কোন ব্যক্তির কোন যৌথ সম্পত্তিতে স্বীয় অবণ্টিত অংশ অপর অংশীদারকে ভাড়ায় প্রদান করার বৈধতার ব্যাপারে ফিক্‌হবিদদের মাঝে কোন মতভেদ নেই। যদি অবণ্টিত অংশ তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে ভাড়ায় প্রদান করে, তার বৈধতার ব্যাপারে ফিক্‌হবিদদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এবং ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে অবণ্টিত অংশ তৃতীয় কোন

---

১. রাদ্দুল মুখতার, খণ্ড ৩য়, পৃষ্ঠা নং- ৩৬৪, ৩৬৫।

ব্যক্তির নিকট ভাড়ায় প্রদান করা যাবে না। অপরদিকে ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু ইউসূফ এবং মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (রহ.) বলেন যে, অবণ্টিত অংশও তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট ভাড়ায় প্রদান করা যেতে পারে। কিন্তু এই এ পদ্ধতিটির সম্পর্ক যতটুকু যে, যৌথ সম্পত্তিকে যদি স্বীয় অপর অংশীদারের নিকট-ই ভাড়ায় প্রদান করা হয়, তাহলে এই ভাড়ার বৈধতার ব্যাপারে সকল ফিক্হবিদ একমত।

(৩) উপরোল্লেখিত পদ্ধতির তৃতীয় ধাপ হল, গ্রাহক অর্থায়নকারীর অবণ্টিত অংশের বিভিন্ন ইউনিটসমূহ ক্রয় করতে থাকে। এটাও শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। যদি অবণ্টিত অংশ যমীন এবং বিল্ডিং উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তাহলে উভয়টির বিক্রি সকল ফিক্হবিদের নিকট বৈধ। এমনিভাবে যদি বিল্ডিং-এর অবণ্টিত অংশ নিজের অপর অংশীদারের নিকট বিক্রি করার ইচ্ছা করে, তাহলে এটাও ফিক্হবিদদের সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ। তবে তা যদি তৃতীয় কোন পার্টির নিকট বিক্রি করে, তাহলে এ ব্যাপারে ফিক্হবিদদের মতভেদ রয়েছে।

এইমাত্র বর্ণিত তিনটি দফা (মৌলনীতি) দ্বারা প্রতিভাত হয়েছে যে, উপরোল্লেখিত তিনটি বিষয় সত্তাগতভাবে বৈধ। কিন্তু এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, তিনটি বিষয়কে একই ব্যবস্থাপনায় একত্রীকরণ বৈধ কি না। এর উত্তর হল, যদি তিনটি বিষয়কে এই হিসেবে একত্র করা হয় যে, তাদের প্রত্যেকটি অপরটির জন্য শর্তস্বরূপ হয়ে যায়, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা বৈধ নয়। কেননা, ইসলামের আইনগত পদ্ধতিতে এই উসূল অবধারিত যে, একটি লেনদেনকে অপরটির জন্য পূর্বশর্তস্বরূপ বানানো যায় না। কিন্তু প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে এ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে যে, দু'টি লেনদেনের একটিকে অপরটির জন্য শর্তস্বরূপ বনানোর পরিবর্তে শুধুমাত্র গ্রাহকের পক্ষ থেকে এক তরফা অঙ্গীকার হতে হবে। প্রথম অঙ্গীকার এ কথার যে, গ্রাহক অর্থায়নকারীর অংশকে ভাড়ায় (Lease) গ্রহণ করে এর ভাড়া পরিশোধ করবে। দ্বিতীয় অঙ্গীকার হল, সে বাড়িতে অর্থায়নকারীর অংশের বিভিন্ন ইউনিটসমূহকে ক্রমান্বয়ে ক্রয় করে নিতে থাকবে। এখন আমরা চতুর্থ বিষয়ের দিকে ফিরে যাচ্ছি, তাহল বিচারের দৃষ্টিতে এ ধরনের অঙ্গীকারের আবশ্যকতার মাসআলা।

(৪) সাধারণত এ ধারণা করা হয় যে, কোন কাজের অঙ্গীকার গ্রহণের দ্বারা অঙ্গীকারকারীর উপর শুধুমাত্র চারিত্রিক দায়িত্ব অর্পিত হয়, সেই অঙ্গীকার আদালতের মাধ্যমে কার্যত পূরণ করানো যায় না। কিন্তু অনেক ফিক্‌হবিদ এমনও রয়েছেন যাদের দৃষ্টিভঙ্গী এই যে, অঙ্গীকার বিচারের দৃষ্টিতেও আবশ্যক হয়ে যায় এবং আদালত অঙ্গীকারকারীকে তার কৃত অঙ্গীকার পূরণের জন্য বাধ্য করতে পারে। বিশেষত ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে[১]। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কয়েকজন মালেকী এবং হানাফী ফিক্‌হবিদদের বরাত দেয়া যায়, যারা বলেন যে, প্রয়োজনের সময় আদালতের মাধ্যমেও অঙ্গীকার পূরণ করানো যেতে পারে। হানাফী ফিক্‌হবিদগণ এই দৃষ্টিভঙ্গীকে একটি বিশেষ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছেন, যাকে (بيع بالوفاء) "বাইবিল ওফা" বলা হয়। "বাইবিল ওফা" কোন বাড়ির ক্রয়-বিক্রির একটি বিশেষ পদ্ধতি। যে পদ্ধতিতে ক্রেতা বিক্রেতার সাথে এ অঙ্গীকার করে যে, বিক্রেতা যখন ক্রেতাকে বাড়ির মূল্য ফেরৎ দিয়ে দিবে, ক্রেতা তখন উক্ত বাড়ি পুনরায় বিক্রি করে দিবে। এই পদ্ধতি মধ্য এশিয়ায় প্রচলিত ছিল এবং এ ব্যাপারে হানাফী ফিক্‌হবিদদের দৃষ্টিভঙ্গী এই ছিল যে, যদি বাড়ির দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয়কে প্রথম ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য শর্ত বনানো হয়ে থাকে তাহলে এটা বৈধ নয়। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় যদি বিনাশর্তে সংঘটিত হয় এবং ক্রয়-বিক্রয়ের পর ক্রেতা এ মর্মে অঙ্গীকার করে যে, বিক্রেতা যখন তাকে তার ক্রয়মূল্য সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করবে, তখন সে উক্ত বাড়ি পুনরায় তার কাছে বিক্রি করে দিবে। তাহলে এই অঙ্গীকার গ্রহণযোগ্য হবে এবং এর দ্বারা অঙ্গীকারকারীর উপর শুধুমাত্র চারিত্রিক দায়িত্বই অর্পিত হবে না বরং এর দ্বারা প্রকৃত বিক্রেতা আইনগতভাবে অঙ্গীকার পূরণ করানোর একটি অধিকার পেয়ে যাবে[২]।

ফিক্‌হবিদগণ এই পদ্ধতির বৈধতার ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তি এই নীতিমালার উপর রেখেছেন যে, قد تجعل المواعيد لازمة لحاجة الناس

---

১. ইব্‌ন কুদামা, আল-মুগনী, খণ্ড ৬ষ্ঠ, পৃষ্ঠা নং- ১৩৭ ঃ রাদ্দুল মুখতার, খন্ড ৬ষ্ঠ, পৃষ্ঠা নং- ৪৭,৪৮।

২. রাদ্দুল মুখতার, খণ্ড ৩য়, পৃষ্ঠা নং- ৩৬৫

"প্রয়োজনের সময় অঙ্গীকারকে আদালতের মাধ্যমেও আবশ্যকীয় সাব্যস্ত করা যেতে পারে।" এমনকি অঙ্গীকার যদি ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার পূর্বে গ্রহণ করা হয়, অতঃপর ক্রয়-বিক্রয় বিনাশর্তে সংঘটিত হয়, তাহলে ঐসব ফিক্হবিদদের নিকট এমনটি করাও বৈধ হবে[১]।

কেউ কেউ এই প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে যে, অঙ্গীকার যদি কার্যতভাবে ক্রয়-বিক্রয়ে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে গ্রহণ করা হয়, তাহলে মূলত এটা স্বয়ং ক্রয়-বিক্রয়ে শর্তারোপ করার সদৃশ্য হয়ে যায়। কেননা উভয় পক্ষের ক্রয়-বিক্রয়ে অন্তর্ভুক্তির সময় এই শর্ত তাদের জানা ছিল, যার কারণে ক্রয়-বিক্রয় যদিও কোন সুস্পষ্ট শর্ত ব্যতীত সংঘটিত হয়েছে, তদুপরি তাকে শর্তযুক্ত মনে করা উচিত। যেহেতু একটি সুস্পষ্ট শর্তের অঙ্গীকার ইতিপূর্বে হয়ে গিয়েছে।

এই প্রশ্নের উত্তর এটা দেয়া যেতে পারে যে, ক্রয়-বিক্রয়কে শর্তযুক্ত করা এবং ক্রয়-বিক্রয়কে শর্তযুক্ত করা ব্যতীত অঙ্গীকার করা এই দু'য়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। যদি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সুস্পষ্টভাবে শর্ত উল্লেখ করা হয়, তার অর্থ হবে ক্রয়-বিক্রয় ঐ সময়ই সংঘটিত এবং বাস্তবায়ন হবে যখন অঙ্গীকার পূর্ণ করা হবে। যার ফলে ভবিষ্যতে যদি অঙ্গীকার পূর্ণ না করা হয়, তাহলে এই ক্রয়-বিক্রয় বাতিল বলে সাব্যস্ত হবে। এর দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি ভবিষ্যতের কোন ঘটনার উপর নির্ভরশীল হয়ে যায়, যা সংঘটিত হতেও পারে নাও হতে পারে। ফলে চুক্তিতে অনিশ্চয়তার (ধোঁকার) আশংকা সৃষ্টি হয়ে যায়, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ[২]।

পক্ষান্তরে ক্রয়-বিক্রয় যদি কোন শর্ত ব্যতীত সংঘটিত হয়ে থাকে, কিন্তু কোন এক পক্ষ পৃথকভাবে কোন অঙ্গীকার করে নেয়, তাহলে এ কথা বলা যায় না যে, ক্রয়-বিক্রয় অঙ্গীকার পূরণের উপর নির্ভরশীল কিংবা তার সাথে শর্তযুক্ত ছিল। এই ক্রয়-বিক্রয় যে কোন অবস্থায় সংঘটিত হবে অঙ্গীকারকারী তার অঙ্গীকার পূরণ করুক কিংবা না করুক। এমনকি

---

১. এই মাসআলার বিস্তারিত আলোচনা "মুরাবাহা"র অধ্যায়ে আসবে।

২. জামিউল ফুসূলিয়্যিন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা নং- ২৩৭ ঃ রাদ্দুল মুখতার, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা নং- ১৩৫।

অঙ্গীকারকারী যদি তার অঙ্গীকার থেকে ফিরে যায় তাহলেও ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হবে। যার সাথে অঙ্গীকার করা হয়েছে বেশির চেয়ে বেশি সে এতটুকু করতে পারে যে, অঙ্গীকারকারীকে আদালতের মাধ্যমে তার অঙ্গীকার পূরণের ব্যাপারে বাধ্য করবে। অঙ্গীকারকারী যদি তার অঙ্গীকার পূর্ণ করার ক্ষমতা না রাখে, তাহলে যার সাথে অঙ্গীকার করা হয়েছিল সে ততটুকু প্রকৃত ক্ষতিপূরণের দাবী করতে পারে যতটুকু তার অঙ্গীকার পূরণ না করার কারণে হয়েছে।

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ক্রয় করার পৃথক অঙ্গীকার আসল চুক্তিকে তার সাথে শর্তযুক্ত কিংবা তার উপর নির্ভরশীল করে না। সুতরাং এ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যেতে পারে।

এই পর্যালোচনার ভিত্তিতে "ক্ষীয়মান অংশীদারিত্ব"কে হাউজ ফিন্যান্সিং-এর জন্যে নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(ক) যৌথভাবে ক্রয়, ভাড়া এবং অর্থায়নকারীর অংশের ইউনিটসমূহের

ক্রয়-বিক্রয় এসব লেনদেনকে একই চুক্তিতে পরস্পরে মিলানো উচিত নয়। তবে যৌথ ক্রয় এবং ভাড়ার চুক্তিকে একই কাগজে লিখা যাবে। যার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থায়নকারী এ ব্যাপারে একমত পোষণ করবে যে, যৌথ ক্রয়ের পর সে তার অংশ গ্রাহককে ভাড়ার ভিত্তিতে প্রদান করবে। এরূপ করা এজন্য বৈধ (সামনে আসবে) যে, ভাড়া ভবিষ্যতের যেকোন তারিখ থেকেও সংঘটিত পারে। এর সাথে গ্রাহক একতরফা অঙ্গীকারের উপর স্বাক্ষর করতে পারে, যার পরিপ্রেক্ষিতে সে অর্থায়নকারীর অংশের ইউনিটসমূহ নির্দিষ্ট বিরতির পর ক্রয় করে নিবে এবং অর্থায়নকারী একথা স্বীকার করতে পারে যে, গ্রাহক যখন তার অংশের একটি ইউনিট ক্রয় করে নিবে, তখন সে অনুপাতে ভাড়াও কমে যাবে।

(খ) প্রত্যেক ইউনিট ক্রয় করার সময় নতুন করে ইজাব-কবুল (প্রস্তাব দান গ্রহণ)-এর মাধ্যমে সেই নির্দিষ্ট তারিখে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হতে হবে।

(গ) এটা সর্বোত্তম যে, গ্রাহকের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ইউনিটের ক্রয়মূল্য ঐ দিনের বাজারদর অনুযায়ী হওয়া যা ঐ ইউনিট ক্রয় করার দিন বাজারে প্রচলিত থাকে। তবে এটাও জায়েয আছে যে, ক্রয়ের অঙ্গীকারনামায়ও (যার উপর গ্রাহক স্বাক্ষর করেছে) একটি মূল্য ধার্য করে নিতে পারে।

সেবার (Services) ব্যবসার জন্য ক্ষীয়মান অংশীদারিত্ব

উপরোল্লেখিত ক্ষীয়মান অংশীদারিত্বের দ্বিতীয় উদাহরণ একটি গাড়ি যৌথ ভাবে ক্রয় করা, যাতে গাড়িটি ভ্রমণ সেবার কাজে ভাড়ায় প্রদান করে আয় উপার্জন করা যায়। এই পদ্ধতিটি নিম্নবর্ণিত বিষয়কে শামিল করে।

(১) শিরকাতুল মিল্‌কের আকৃতিতে গাড়িতে একটি যৌথ মালিকানা সৃষ্টি করা, এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ, যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

(২) গাড়ি দ্বারা সেবা (Service) প্রদানের মাধ্যমে উপার্জিত আয়ে মুশারাকা, এটাও বৈধ, যা এই অধ্যায়ের শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে।

(৩) গ্রাহক অর্থায়নকারীর অংশের বিভিন্ন ইউনিটসমূহ ক্রয় করা। এর বৈধতা ঐসব শর্তের সাথে শর্তযুক্ত যা হাউজ ফিন্যান্সিং-এ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তবে হাউজ ফিন্যান্সিং এবং এই দ্বিতীয় উদাহরণের মাঝে প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। তাহল এই যে, গাড়িকে যখন ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে সেবার কাজে ব্যবহার করা হয়, তখন সাধারণত সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে অবচয়ের কারনে গাড়ির মূল্যও কম (Depreciation) হতে থাকে। এজন্য অর্থায়নকারীর বিভিন্ন ইউনিটসমূহের মূল্য নির্ধারণের সময় গাড়ির যে পরিমাণ মূল্য কমে যায় তা অবশ্যই সামনে রাখা উচিত।

সাধারণ ব্যবসায় ক্ষীয়মান অংশীদারিত্ব

পূর্বোল্লেখিত উদাহরণসমূহের তৃতীয় উদাহরণ এই ছিল যে, অর্থায়নকারী ৬০% পার্সেন্ট পুঁজি রেডিমেট গার্মেন্টসের ব্যবসা পরিচালনার জন্য বিনিয়োগ করেছে, এই পদ্ধতি দু'টি বিষয়কে শামিল করে।

(১) প্রথম ধাপে এটি একটি সাধাসিধা মুশারাকা, যার মাধ্যমে দু'জন অংশীদার একটি যৌথ ব্যবসায় বিভিন্ন পরিমাণে স্বীয় পুঁজি বিনিয়োগ করে। এটা সুস্পষ্ট যে, এই বিষয় ঐসব শর্তের সাথে বৈধ যা এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই বর্ণনা করা হয়েছে।

(২) গ্রাহক অর্থায়নকারীর অংশের বিভিন্ন ইউনিটসমূহকে ক্রয় করা, যা গ্রাহকের পক্ষ থেকে পৃথক অঙ্গীকারের মাধ্যমে হবে। এই অঙ্গীকার সম্পর্কে শর'য়ী শর্তাবলী সেগুলোই যা হাউজ ফিন্যান্সিং-এর আলোচনায় বর্ণনা করা হয়েছে। তবে উভয়ের মাঝে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। তা এই যে, এই উদাহরণে অর্থায়নকারীর অংশের মূল্য ক্রয়ের অঙ্গীকারনামায় নির্ধারণ করা যায় না। মূল্য যদি মুশারাকায় অন্তর্ভুক্তির সময়ই আগাম নির্ধারণ করে নেয়া হয়, তাহলে কার্যত এর অর্থ এই হবে যে, গ্রাহক অর্থায়নকারীর বিনিয়োগকৃত আসল পুঁজিকে মুনাফাসহ কিংবা মুনাফা ব্যতীত ফেরতের নিশ্চয়তা প্রদান করে দিয়েছে, যা মুশারাকার ক্ষেত্রে শরীয়তের দৃষ্টিতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এ কারণে গ্রাহক যে ইউনিটসমূহ ক্রয় করবে সেগুলোর মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে অর্থায়নকারীর নিকট দু'টি সুযোগ (Options) রয়েছে। প্রথমটি হল- সে এ মর্মে চুক্তি করে নিবে যে, প্রত্যেক ইউনিট ক্রয়ের সময় ব্যবসার মূল্য ধার্য করে তার ভিত্তিতে সেই ইউনিটসমূহ বিক্রি করা হবে। ব্যবসার মূল্য যদি বেড়ে যায়, তাহলে সেই ইউনিটের মূল্যও বেড়ে যাবে। আর ব্যবসার মূল্য কমে গেলে ইউনিটের মূল্যও কমে যাবে। এই মূল্য ধার্য করা অভিজ্ঞ লোকের মাধ্যমে প্রচলিত রীতি অনুযায়ীও হতে পারে। সেই অভিজ্ঞ লোকদের চিহ্নিত করা অঙ্গীকারে স্বাক্ষরের সময়ও করা যেতে পারে। দ্বিতীয়টি এই যে, অর্থায়নকারী গ্রাহককে সেই ইউনিটসমূহকে যে কোন মূল্যে সম্ভব অন্য কোন লোকের কাছে বিক্রি করে দেয়ার অনুমতি প্রদান করবে। এর সাথে সাথে অর্থায়নকারী স্বয়ং গ্রাহককে একটি বিশেষ মূল্যের প্রস্তাব করবে। তার অর্থ এই হবে যে, সে যদি এর থেকে অধিক মূল্যে বিক্রির কোন গ্রাহক পেয়ে যায় তাহলে সে তা বিক্রি করে দিবে।

যদিও শরীয়তের দৃষ্টিতে উভয় সুযোগ-ই গ্রহণযোগ্য, কিন্তু দ্বিতীয় সুযোগটি অর্থায়নকারীর জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, এর অর্থ একজন নতুন অংশীদারের মুশারাকায় শামিল হওয়া। যার দ্বারা পূর্ণ ব্যবসা প্রভাবিত হবে এবং ক্ষীয়মান অংশীদারিত্বের উদ্দেশ্যও শেষ হয়ে যাবে, যে অনুযায়ী অর্থায়নকারী তার অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়ে ফেরত নিতে চাচ্ছিল। এজন্য ক্ষীয়মান অংশীদারিত্বের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য শুধুমাত্র প্রথম সুযোগ-ই গ্রহণযোগ্য।

মুরাবাহা

অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান মুরাবাহাকে একটি ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করছে এবং তাদের অধিকাংশ অর্থায়ন কার্যক্রম (Financial Operations) মুরাবাহার ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়ে থাকে। এ কারণেই বর্তমানে এই পরিভাষাটি অর্থনীতির পরিধিতে একটি ব্যংকিং পদ্ধতি হিসেবে প্রচলিত। অথচ মুরাবাহার প্রকৃত রূপ এই ধারণা থেকে ব্যতিক্রম।

মুরাবাহা মূলত ইসলামী ফিক্‌হের একটি পরিভাষা। এর দ্বারা এক বিশেষ প্রকারের ক্রয়-বিক্রয় উদ্দেশ্য হয়। যার প্রকৃত রূপে অর্থায়নের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। যদি কোন বিক্রেতা তার ক্রেতার সাথে এই চুক্তি করে নেয় যে, সে তাকে একটি নির্দিষ্ট পণ্য নির্দিষ্ট মুনাফার ভিত্তিতে প্রদান করবে, সে মুনাফা ঐ পণ্যের ক্রয় মূল্যের উপর বর্ধিত করা হবে। তাহলে এই ক্রয়-বিক্রয়কে "মুরাবাহা" বলা হয়। মুরাবাহার মূল উপাদান এই যে, বিক্রেতার পণ্য সামগ্রী সংগ্রহ করতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে, তা ক্রেতাকে অবগত করে তার উপর কিছু মুনাফা সংযোজন করে নেয়া। এই মুনাফা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থের আকৃতিতেও হতে পারে এবং শতকরার ভিত্তিতেও হতে পারে।

মুরাবাহার ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধ নগদেও হতে পারে এবং উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে পরবর্তী যেকোন তারিখেও হতে পারে। এ কারণে মুরাবাহা অপরিহার্যভাবে শুধুমাত্র বাকিতে পরিশোধ (Deffered Payment) করাকেই বুঝায় না। যা সাধারণত ঐ সকল লোকেদের ধারণা যারা ইসলামী ফিক্‌হের ব্যাপারে অধিক জ্ঞান রাখেনা এবং যারা শুধুমাত্র ব্যাংকিং লেনদেনের সুবাদেই মুরাবাহার নাম শুনে থাকে।

মৌলিক ভাবে মুরাবাহা একটি সাধাসিধা ক্রয়-বিক্রয়। যে বৈশিষ্ট্যটি তাকে ক্রয়-বিক্রয় অন্যান্য প্রকারসমূহ থেকে পৃথক করে দেয় তা এই যে, মুরাবাহায় বিক্রেতা সুস্পষ্টভাবে ক্রেতাকে এ কথা বলে দেয় যে, তার কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং ব্যয়ের উপর কি পরিমাণ মুনাফা নিতে চায়। যদি কোন ব্যক্তি ব্যয়ের কথা উল্লেখ করা ব্যতীত কোন জিনিস একটি নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রি করে, তাহলে তা মুরাবাহা হবে না। যদিও সে তার ব্যয়ের উপর মুনাফাও অর্জন করে। কেননা, এই ক্রয়-বিক্রয় ব্যয়ের উপর কিছু অতিরিক্ত সংযোজন ("Cost-Plus") করার উপর ভিত্তি নয়। এ ক্ষেত্রে তাকে "দর কষাকষি" ক্রয়-বিক্রয় বলা হয়।

এটা হল মুরাবাহা পরিভাষার প্রকৃত অর্থ, যা একটি নির্ভেজাল এবং সাধাসিধা ক্রয়-বিক্রয়। কিন্তু অন্যান্য আরো কিছু নিয়ম-নীতি বৃদ্ধি করে একে ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তবে এধরনের চুক্তি বিশুদ্ধ হওয়া কিছু শর্তের উপর নির্ভরশীল, যেগুলোর প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য, যাতে করে এই চুক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হয়।

এসব শর্তসমূহকে সঠিকভাবে বুঝার জন্য সর্বপ্রথম এ কথা মনে রাখা জরুরী যে, মুরাবাহা সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এক প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়ই। যার কারণে বিশুদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়ের সকল আনুষঙ্গিক বিষয়াবলী তাতে পাওয়া যাওয়া অপরিহার্য। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয়ের কয়েকটি মৌলিক বিধি-বিধান বর্ণনার মাধ্যমে এই আলোচনার সূচনা করা হচ্ছে, যেগুলো ব্যতীত কোন প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়ই শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হতে পারে না। এরপর আমরা ঐসব বিধানাবলী সম্পর্কে আলোচনা করব যেগুলো "মুরাবাহা"র সাথে সম্পর্ক রাখে। অতঃপর ব্যাখ্যার দ্বারা এ কথা বর্ণনা করা হবে যে, মুরাবাহাকে গ্রহণযোগ্য অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করার পদ্ধতি কি।

এক্ষেত্রে বিস্তারিত নীতিমালাসমূহকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যে বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে যেন আলোচ্য বিষয়ের মৌলিক সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়ে যায় এবং সূত্র প্রদানে সহজতার জন্য সংরক্ষণ করা যায়।

ক্রয়-বিক্রয়ের কয়েকটি বিধি-বিধান

ইসলামে ক্রয়-বিক্রয়ের এই সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে যে, "মূল্যবান জিনিসকে মূল্যবান জিনিসের-ই বিনিময়ে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে আদান-প্রদান করা।" মুসলিম ফিক্‌হবিদগণ ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির ব্যাপারে অনেক বিধি-বিধান উল্লেখ করেছেন এবং সেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বর্ণনা করার জন্য কয়েক খণ্ডে অনেক গ্রন্থও রচনা করেছেন। এখানে শুধুমাত্র সেসব বিধি-বিধানের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা উদ্দেশ্য যেগুলোর সম্পর্ক বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত মুরাবাহার সাথে রয়েছে।

বিধান নং-১ ঃ যে পণ্য বিক্রি করা হবে, বিক্রির সময় তা বিদ্যমান থাকতে হবে। সুতরাং যে পণ্য এখনো অস্তিত্বে আসেনি, তা বিক্রি করা যাবে না। সুতরাং পারস্পরিক সন্তুষ্টিতেও যদি কোন অস্তিত্বহীন পণ্য বিক্রি করা হয়, তাহলে এই বিক্রি শরীয়তের দৃষ্টিতে বাতিল বলে গণ্য হবে।

যেমন ঃ "ক" তার গাভীর বাচ্চা যা এখনো জন্ম হয়নি "খ" এর নিকট বিক্রি করছে, এই বিক্রি বাতিল বলে গণ্য হবে।

বিধান নং-২ ঃ যে পণ্য বিক্রি করা হবে, বিক্রির সময় তা বিক্রেতার মালিকানায় থাকতে হবে। সুতরাং যে পণ্য বিক্রেতার মালিকানায় নেই তা বিক্রি করা যাবে না। যদি মালিকানা প্রতিষ্ঠার পূর্বে তা বিক্রি করা হয়, তাহলে বিক্রি বাতিল বলে গণ্য হবে।

যেমন ঃ "ক" "খ" এর নিকট একটি গাড়ি বিক্রি করছে, যা এখনো "গ" এর মালিাকনায় রয়েছে। কিন্তু সে আশাবাদী, গাড়িটি "গ" থেকে ক্রয় করে "খ" এর নিকট হস্তান্তর করে দিবে। যেহেতু গাড়িটি বিক্রির সময় "ক" এর মালিকানায় ছিল না, সেহেতু এই বিক্রি বাতিল বলে গণ্য হবে।

বিধান নং-৩ ঃ যে পণ্য বিক্রি করা হবে, বিক্রির সময় তা বিক্রেতার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কব্জায় থাকতে হবে। "পরোক্ষ" কব্জা দ্বারা উদ্দেশ্য এমন অবস্থা, যে অবস্থায় কব্জাকারী উক্ত পণ্য বাহ্যিকভাবে তার অধীনে নেয়নি কিন্তু তার নিয়ন্ত্রণে এসে গিয়েছে এবং পণ্যের যাবতীয় দায়-দায়িত্বও তার উপর ন্যস্ত হয়ে গিয়েছে। সেসব দায়-দায়িত্বের মধ্যে উক্ত

পণ্যের ধ্বংসের আশংকা এবং ঝুঁকিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ, এই পণ্য যদি ধ্বংস বা ক্ষতি হয়ে যায়, তাহলে এ কথা মনে করা হবে যে, তা ক্রেতার ক্ষতি হয়েছে।

যেমন ঃ (১) "ক" "খ" থেকে একটি গাড়ি ক্রয় করেছে, "খ" এখনো ঐ গাড়িটি "ক" বা তার উকিলের কাছে হস্তান্তর করেনি। এমতাবস্থায় "ক" এই গাড়িটি "গ" এর নিকট বিক্রি করতে পারবে না। যদি সে গাড়িটি কব্জা করার পূর্বে বিক্রি করে দেয়, তাহলে বিক্রি শুদ্ধ হবে না।

(২) "ক" "খ" থেকে একটি গাড়ি ক্রয় করেছে, "খ" ঐ গাড়িটি নির্দিষ্ট এবং চিহ্নিত করার পর তা এমন একটি গ্যারেজে রেখে দিয়েছে, যেখানে "ক" এর স্বাধীনভাবে প্রবেশ করার অনুমতি রয়েছে এবং "খ" তাকে অনুমতি প্রদান করেছে যে, সে গাড়িকে গ্যারেজ থেকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিয়ে যেতে পারবে এ পর্যায়ে গাড়ির দায়ভার "ক" এর উপর ন্যস্ত হয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় গাড়ি "ক" এর পরোক্ষ কব্জায় (Constructive Possession) হয়ে গিয়েছে। সুতরাং এ পর্যায়ে "ক" যদি গাড়ির উপর বাহ্যিক এবং প্রত্যক্ষ কব্জা ব্যতীত "গ" এর নিকট বিক্রি করে দেয়, তাহলে বিক্রি শুদ্ধ হবে।

ব্যাখ্যা নং-১ ঃ ১ থেকে ৩ নং বিধানের সারাংশ হল কোন ব্যাক্তি এমন জিনিস বিক্রি করতে পারবে না, যা-

(১) এখনো অস্তিত্বে আসেনি।

(২) বিক্রেতার মালিকানায় নেই।

(৩) বিক্রেতার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কব্জায় নেই।

ব্যাখ্যা নং-২ ঃ প্রকৃত বিক্রি (Actual Sale) এবং শুধুমাত্র বিক্রির অঙ্গীকারের মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। প্রকৃত বিক্রি ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত উপরোক্ত তিনটি শর্ত পূর্ণ না করা হয়। তবে কোন ব্যক্তি এমন জিনিসের বিক্রির অঙ্গীকার করতে পারে যা তার মালিকানায় কিংবা কব্জায় নেই। মূলত বিক্রির অঙ্গীকার দ্বারা অঙ্গীকারকারীর উপর শুধুমাত্র চারিত্রিকভাবে তার অঙ্গীকার পূরণের দায়িত্ব অর্পিত হয়। এই অঙ্গীকার পূরণে সাধারণত আদালতের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি

করা যায় না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ করে যখন অঙ্গীকার করার কারণে দ্বিতীয় পক্ষের উপর কিছু দায়-দায়িত্ব অর্পিত হয়ে যায়, তখন এই অঙ্গীকার আদালতের মাধ্যমেও পূরণ করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় আদালত অঙ্গীকারকারীকে তার কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করার ব্যাপারে অর্থাৎ কার্যত বিক্রির জন্য বাধ্য করবে। সে যদি অঙ্গীকার পূরণ করতে না পারে, তাহলে ওয়াদা খেলাফীর কারণে দ্বিতীয় পক্ষের প্রকৃত যে ক্ষতি হয়েছে আদালত অঙ্গীকারকারীকে তা আদায়ের নির্দেশ দিবে[১]। কিন্তু কার্যত বিক্রি সেসময় সংঘটিত হবে যখন উক্ত পণ্য বিক্রেতার কব্জায় আসবে। তখন নতুন করে ইজাব-কবুলের (প্রস্তাব-না ও প্রস্তাব গ্রহণের) প্রয়োজন হবে। যতক্ষন পর্যন্তএভাবে বিক্রি না হবে ততক্ষন পর্যন্ত তার আইনগত ফলাফল কার্যকর হবে না।

বর্জন ঃ

বিধান নং- ১-৩ এ উল্লেখিত নিয়মে দু'প্রকারের বিক্রি বর্জন করা হয়েছে। (১) বাইয়ে সালাম (২) ইসতিসনা'।

এই উভয় প্রকারের বিক্রি সম্পর্কে সামনে একটি পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

বিধান নং-৪ ঃ বিক্রি বিনা শর্তে এবং তাৎক্ষণিকভাবে সংঘটিত হতে হবে। সুতরাং যে বিক্রি ভবিষ্যতের কোন তারিখের সাথে সম্পৃক্ত হবে কিংবা আগত কোন ঘটনার উপর নির্ভরশীল হবে, সে বিক্রি বাতিল বলে গণ্য হবে। উভয়পক্ষ যদি ক্রয়-বিক্রয়কে বিশুদ্ধ করতে চায়, তাহলে তাদেরকে তখন নতুনভাবে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করতে হবে, যখন ভবিষ্যতের সে তারিখ এসে যাবে কিংবা আরোপিত শর্ত পাওয়া যাবে, যার উপর বিক্রি নির্ভরশীল ছিল।

যেমন ঃ (১) "ক" পহেলা জানুয়ারী "খ"কে বলল যে, আমি তোমার নিকট আমার গাড়ি পহেলা ফেব্রুয়ারী থেকে বিক্রি করলাম, তাহলে এই

---

১. اسلامي فقه اكيدمي كي قرارداد نمبر ۲،۳ منظور كرده اجلاس چهارم منعقده كويت ۱٤۰۹ھ ، ملاحظة: مجلة مجمع الفقه الاسلامي، شماره: ۱۵۹۹/۲،۵

বিক্রি বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা তাকে ভবিষ্যতের একটি তারিখের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

(২) "ক" "খ"কে বলল যে, অমুক পার্টি যদি নির্বাচনে জয়লাভ করে, তাহলে মনে করা হবে আমার গাড়ি তোমার কাছে বিক্রি হয়েছে। এই বিক্রিও বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা, তাকে ভবিষ্যতের একটি ঘটনার উপর নির্ভরশীল করা হয়েছে।

বিধান নং-৫ ঃ বিক্রিয় পণ্য মূল্যবান হতে হবে। সুতরাং ব্যবসায়িক প্রথায় যেসব জিনিসের কোন মূল্য নেই, তা বিক্রি করা যাবে না।

বিধান নং-৬ ঃ বিক্রিয় পণ্য এমন না হতে হবে, যা শুধুমাত্র হারাম উদ্দেশ্যেই ব্যবহার হয়ে থাকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার হয় না।

বিধান নং-৭ ঃ যে জিনিস বিক্রি করা হচ্ছে, তা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানা থাকতে হবে এবং ক্রেতাকে সে জিনিস সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান প্রদান করতে হবে।

ব্যাখ্যা নং-৩ ঃ

বিক্রিয় পণ্য নির্ধারণ ইঙ্গিতের মাধ্যমেও হতে পারে এবং এমন বিস্ত ারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমেও হতে পারে যার দ্বারা বিক্রিয় পণ্য ঐসব পণ্য থেকে পৃথক হয়ে যায় যেগুলোর বিক্রি উদ্দেশ্য নয়।

যেমন ঃ একটি বিল্ডিং, যে বিল্ডিং-এ একই সাইজে নির্মিত কয়েকটি এ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। বিল্ডিং-এর মালিক "ক" "খ"কে বলল যে, "আমি তোমার নিকট এসব এ্যাপার্টমেন্ট থেকে একটি এ্যাপার্টমেন্ট বিক্রি করছি", "খ"ও গ্রহণ করে নিয়েছে, এ বিক্রি ততক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মৌখিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কিংবা সরাসরি ইঙ্গিতের মাধ্যমে একটি এ্যাপার্টমেন্ট নির্দিষ্ট করে না দেয়া হয়।

বিধান নং-৮ ঃ বিক্রিত পণ্য ক্রেতার কব্জায় আসা নিশ্চিত হতে হবে। এ কব্জা শুধুমাত্র ঘটনাক্রমের উপর ভিত্তি কিংবা কোন শর্ত পাওয়া যাওয়ার সাথে নির্ভরশীল না হতে হবে।

যেমন ঃ "ক" তার এমন একটি গাড়ি বিক্রি করছে, যা কোন অপরিচিত ব্যক্তি চুরি করে নিয়ে গিয়েছে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি এ আশায় ক্রয় করছে যে, "ক" তার গাড়িটি পুনরায় পেয়ে যাবে, এই বিক্রি শুদ্ধ হবে না।

বিধান নং-৯ ঃ মূল্য নির্ধারণ করাও বিক্রি শুদ্ধ হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত। মূল্য যদি নির্ধারিত না হয়, তাহলে বিক্রয় শুদ্ধ হবে না।

যেমন ঃ "ক" "খ"কে বলল যে, মূল্য এক মাসের মধ্যে পরিশোধ করা হলে পঞ্চাশ টাকা এবং দু'মাসের মধ্যে পরিশোধ করা হলে পঞ্চান্ন টাকা হবে। "খ"ও একথার উপর একমত হয়ে যায়, এক্ষেত্রে মূল্য অনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে বিক্রি শুদ্ধ হবে না। তবে পর্যায়ক্রমিক দু'টি মূল্যের যে কোন একটিকে বিক্রির সময় নির্ধারণ করে নেয়া হলে শুদ্ধ হবে।

বিধান নং-১০ ঃ বিক্রিতে কোনরূপ শর্ত থাকতে পারবে না। যে বিক্রিতে কোন শর্তারোপ করা হবে তা ফাসিদ হবে। তবে যে শর্ত ব্যবসায়িক প্রথায় প্রচলিত এবং ব্যবহৃত থাকে তাতে কোন অসুবিধা নেই।

যেমন ঃ (১) "ক" "খ" থেকে একটি গাড়ি এ শর্তে ক্রয় করছে যে, সে তার ছেলেকে স্বীয় ফার্মে কর্মচারি হিসেবে রাখবে। এ বিক্রি শর্তযুক্ত হওয়ার কারণে ফাসিদ হয়ে যাবে।

(২) "ক" "খ" থেকে একটি ফ্রিজ এ শর্তে ক্রয় করছে যে, "খ" দু'বছর পর্যন্ত এর ফ্রী সার্ভিস প্রদান করবে। এই শর্তটি যেহেতু এ ধরনের লেনদেনের অংশ হিসেবে পরিচিত, তাই এই শর্তারোপ করা সহীহ আছে এবং বিক্রিও শুদ্ধ হবে।

বাইয়ে মুয়াজ্জাল
(মূল্য বাকিতে পরিশোধের ভিত্তিতে বিক্রি)

(১) যে ক্রয়-বিক্রয়ে উভয়পক্ষ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করে যে, মূল্য পরে পরিশোধ করা হবে তাকে "বাইয়ে মুয়াজ্জাল" বলা হয়।

(২) বাইয়ে মুয়াজ্জালও বৈধ তবে শর্ত হল মূল্য পরিশোধের তারিখ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত করে নিতে হবে।

(৩) মূল্য পরিশোধের সময় নির্দিষ্ট তারিখের ভিত্তিতেও নির্ধারণ করা যেতে পারে (যেমন- পহেলা জানুয়ারী পরিশোধ করা হবে) এবং নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতেও হতে পারে, যেমন- তিন মাস পর পরিশোধ করা হবে। কিন্তু মূল্য পরিশোধের সময় ভবিষ্যতের এমন কোন ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট করে নির্ধারণ করা যাবে না যার চূড়ান্ত তারিখ অজ্ঞাত এবং অনিশ্চিত যদি পরিশোধের তারিখ অনির্দিষ্ট কিংবা অনিশ্চিত হয়, তাহলে বিক্রি শুদ্ধ হবে না।

(৪) যদি মূল্য পরিশোধের জন্য একটি বিশেষ সময় নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে, যেমন- এক মাস, তাহলে সময়ের হিসাব ক্রেতা বিক্রয় পন্য হস্তগত করার সময় থেকে শুরু হবে। তবে উভয়পক্ষ যদি অন্য কোন চুক্তির উপর একমত হয়ে থাকে, তাহলে চুক্তি অনুযায়ী শুরু হবে।

(৫) বাকির ক্ষেত্রে মূল্য নগদ অপেক্ষা অধিকও হতে পারে। তবে চুক্তির সময়ই তা নির্ধারণ করতে হবে।

(৬) একবার যে মূল্য নির্ধারিত হয়ে যায়, নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পরিশোধের কারণে কিংবা নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বে পরিশোধের কারণে তাতে কম- বেশী করা বৈধ নয়।

(৭) কিস্তি সময়মত পরিশোধের জন্য ক্রেতার উপর চাপ সৃষ্টি করার সুবিধার্থে তাকে এই অঙ্গীকার করার জন্য বলা যেতে পারে যে, সময় মত পরিশোধ না করার ক্ষেত্রে সে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কোন জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য দান করবে, এমতাবস্থায় বিক্রেতা সে অর্থ ক্রেতা থেকে উসূল করতে পারবে কিন্তু নিজের আয়ের অংশ হিসেবে নয় বরং ক্রেতার পক্ষ হতে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার জন্য। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে এই অধ্যায়েই আসবে।

(৮) মূল্য কিস্তিতে পরিশোধের ভিত্তিতে যদি পণ্য বিক্রি করা হয়, তাহলে বিক্রেতা এই শর্তও আরোপ করতে পারে যে, ক্রেতা যদি কোন একটি কিস্তিও সময়মত পরিশোধ না করে, তাহলে অবশিষ্ট সকল কিস্তি তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করা আবশ্যকীয় হয়ে যাবে।

(৯) সময়মত মূল্য পরিশোধ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিক্রেতা ক্রেতা থেকে কোন সিকিউরিটি প্রদানের দাবী করতে পারে, তা বন্ধকের আকৃতিতেও হতে পারে কিংবা অন্য কোন মাধ্যমেও হতে পারে।

(১০) ক্রেতা থেকে প্রমিসরী নোট বা বিনিময় বিল (Bill of exchange) স্বাক্ষরের দাবীও করতে পারে। তবে এই প্রমিসরী নোট বা হুন্ডিকে তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট তার গায়ে লিখিত মূল্যের চেয়ে কম বা অধিক মূল্যে বিক্রি করতে পারবে না।

মুরাবাহা

(১) মুরাবাহা ক্রয়-বিক্রয়ের এক বিশেষ প্রকার। যে ক্রয়-বিক্রয়ে বিক্রেতা বিক্রিত পণ্যের ব্যয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেয় এবং তার উপর কিছু মুনাফা সংযোজন করে অন্যের নিকট বিক্রি করে।

(২) মুরাবাহায় মুনাফা (Mark Up) নির্ধারণ পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে দু'পন্থার কোন এক পন্থায় করা যেতে পারে। হয়ত নির্দিষ্ট পরিমাণের অংক সাব্যস্ত করে নিবে (যেমন- মূল ব্যয়ের উপর এত টাকা অতিরিক্ত) অথবা মূল ব্যয়ের উপর বিশেষ আনুপাতিক হার সাব্যস্ত করে নিবে (অর্থাৎ- মূল ব্যয়ের উপর এত পার্সেন্ট অতিরিক্ত)।

(৩) বিক্রিত পণ্য সংগ্রহ করতে বিক্রেতার যে পরিমাণ টাকা ব্যয় হয়েছে যেমন- মালের ভাড়া, কাস্টম ডিউটি ইত্যাদি সব কিছু ব্যয়ে সংযোজন হবে এবং মুনাফা (Mark Up) সামগ্রিক ব্যয়ের উপর ধার্য করা হবে। কিন্তু ব্যবসার ঐসব খরচ যা শুধুমাত্র একবার পণ্য সংগ্রহ করতে ব্যয় হয় না, বরং বারংবার হতে থাকে যেমন- কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, বিল্ডিং ভাড়া ইত্যাদি এসব ব্যয়কে একক লেনদেনের ব্যয়ে সংযোজন করা যাবে না। তবে মূল ব্যয়ের উপর যে মুনাফা নির্ধারণ করা হবে তাতে সব ধরনের খরচের প্রতিও লক্ষ্য রাখা যাবে।

(৪) মুরাবাহা ঐ ক্ষেত্রে শুদ্ধ হবে যখন পণ্যের পূর্ণ ব্যয় নির্ধারণ করা যাবে। যদি পণ্যের পূর্ণ ব্যয় নির্ধারণ করা না যায়, তাহলে তাকে মুরাবাহা

হিসেবে বিক্রি করা যাবে না। সে ক্ষেত্রে উক্ত পণ্য দর কষাকষির (Bargaining) ভিত্তিতে বিক্রি করা যাবে। অর্থাৎ- এ ক্ষেত্রে পণ্যের ব্যয় এবং তার উপর নির্ধারিত মুনাফার পরিমাণ ক্রেতাকে জানানো হবে না। এ সময় পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য ধার্য করা হবে।

যেমন ঃ (১) "ক" এক জোড়া জুতা একশ' টাকায় ক্রয় করেছে, সে উক্ত জুতা দশ পার্সেন্ট মুনাফার ভিত্তিতে মুরাবাহায় বিক্রি করতে চায়। এখানে মূল ব্যয় যেহেতু পূর্ণভাবে জানা আছে, সেহেতু মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করা শুদ্ধ হবে।

(২) "ক" একই চুক্তিতে একটি রেডিমেট স্যুট এবং এক জোড়া জুতা পাঁচ টাকায় ক্রয় করেছে। এখানে স্যুট এবং জুতা উভয়টি এক সাথে মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করতে পারবে। কিন্তু শুধুমাত্র জুতাকে মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করতে পারবে না। কেননা, শুধুমাত্র জুতার ব্যয় নির্ধারণ করা যাচ্ছে না। সে যদি শুধুমাত্র জুতাকেই বিক্রি করতে চায়, তাহলে তাকে জুতার ব্যয় এবং তার উপর মুনাফার পরিমাণ ক্রেতাকে বলা ব্যতীত একটি নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রি করতে হবে।

মুরাবাহা পদ্ধতিতে অর্থায়ন

মূলত মুরাবাহা অর্থায়ন পদ্ধতি নয় বরং ক্রয়-বিক্রয়ের একটি বিশেষ প্রকার। শরীয়তের দৃষ্টিতে অর্থায়নের আদর্শিক পদ্ধতি হচ্ছে মুশারাকা এবং মুদারাবা। যার ব্যাপারে পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান অর্থনৈতিক সেট-আপের দৃষ্টিতে অর্থায়নের কোন কোন অধ্যায়ে মুশারাকা এবং মুদারাবাকে ব্যবহার করার মধ্যে কিছু প্রয়োগিক জটিলতা রয়েছে। যার কারণে এ যুগের অভিজ্ঞ ফিক্হবিদগণ বিশেষ কিছু শর্ত সাপেক্ষে বাকিতে পরিশোধের ভিত্তিতে মুরাবাহাকে অর্থায়নের পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে দু'টি মৌলিক বিষয় ভালভাবে জেনে নেয়া জরুরী।

(১) এ কথা মনে রাখা জরুরী যে, মুরাবাহা তার প্রকৃতরূপে অর্থায়ন পদ্ধতি নয়। এটা শুধুমাত্র সুদ থেকে বাঁচার একটি মাধ্যম এবং কৌশল। এটা এমন আদর্শিক অর্থায়ন পদ্ধতি নয়, যা ইসলামের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য পূর্ণ করে। এ জন্য অর্থ ব্যবস্থাকে ইসলামী আদর্শে সাজানোর লক্ষ্যে মুরাবাহাকে একটি সাময়িক ধাপ হিসেবে ব্যবহার করা উচিত এবং মুরাবাহার ব্যবহার সেসব ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত যেখানে মুশারাকা এবং মুদারাবাকে প্রয়োগ করা যায় না।

(২) গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় বিষয়টি হল, শুধুমাত্র সুদের স্থলে মুনাফা কিংবা মার্কআপ শব্দ ব্যবহার করলেই মুরাবাহা বাস্তবায়ন হয় না। মূলত শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণ মুরাবাহাকে অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে কয়েকটি শর্তের সাথে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সে সব শর্ত পরিপূর্ণভাবে পালন না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুরাবাহা বৈধ হবে না। হাকীকত এই যে, সে সব শর্ত পালন করার দ্বারাই সুদী ঋণ এবং মুরাবাহার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যদি সে সব শর্ত পালন না করা হয়, তাহলে এই চুক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ হবে না।

মুরাবাহা পদ্ধতিতে অর্থায়নের মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

(১) মুরাবাহা সুদভিত্তিক প্রদেয় ঋণ নয়। বরং মুরাবাহা হচ্ছে, মূল্য বাকিতে পরিশোধের ভিত্তিতে কোন পণ্য বিক্রি করা, যার মূল্যে ব্যয় ব্যতীত নির্ধারিত মুনাফাও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(২) মুরাবাহা যেহেতু একটি ক্রয়-বিক্রয়, ঋণ প্রদান করা নয়, সেহেতু তাতে ঐসব শর্ত পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যাওয়া অপরিহার্য, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য নির্ধারিত। বিশেষ করে সে সব শর্ত যা এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে বর্ণনা করা হয়েছে।

(৩) মুরাবাহাকে অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে শুধুমাত্র তখনই ব্যবহার করা যেতে পারে, যখন বাস্তবিকপক্ষে গ্রাহকের কোন পণ্য ক্রয়ের জন্য ফান্ড-এর প্রয়োজন হবে। যেমন- গ্রাহকের জিনেং ফ্যাক্টরির জন্য কাঁচা মাল

হিসেবে তুলার প্রয়োজন, তখন তার নিকট মুরাবাহার ভিত্তিতে তুলা বিক্রি করা যাবে। কিন্তু যেখানে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ফ্যান্ড-এর প্রয়োজন হয়, যেমন- যেসব মাল পূর্বে ক্রয় করা হয়েছে, সেগুলোর মূল্য পরিশোধ, বিদুৎ বিল কিংবা অন্য বিলসমূহ আদায়, অথবা কর্মচারীদের বেতন-ভাতার জন্য অর্থের প্রয়োজন। এমতাবস্থায় মুরাবাহা প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা, মুরাবাহায় শুধুমাত্র ঋণ প্রদান করা যথেষ্ট হয় না, বরং প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হওয়া অপরিহার্য।

(৪) কোন পণ্য গ্রাহকের নিকট বিক্রির পূর্বে অর্থায়নকারীর তাতে মালিকানা প্রতিষ্ঠা হওয়া অপরিহার্য।

(৫) বিক্রির পূর্বে সে পণ্য অর্থায়নকারীর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কব্জায় থাকতে হবে। অর্থাৎ- সে পণ্য কিছুক্ষণের জন্য চাই তা একেবারে স্বল্প সময়ই হোক না কেন, তার দায়ভারে থাকতে হবে।

(৬) শরীয়তের দৃষ্টিতে মুরাবাহার সর্বোত্তম পদ্ধতি এই যে, অর্থায়নকারী স্বয়ং উক্ত পণ্য ক্রয় করে নিজের কব্জায় নিয়ে নিবে। অথবা এ কাজ তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে উকিল নিয়োগ করে তার মাধ্যমে করাবে। অতঃপর সে পণ্য গ্রাহকের নিকট বিক্রি করবে। তবে যে ক্ষেত্রে কোন কারণে সরবরাহ কারী থেকে সরাসরি ক্রয় করা সম্ভব না হয়, সে ক্ষেত্রে এই অনুমতিও আছে যে, অর্থায়নকারী গ্রাহককে নিজের উকিল হিসেবে নিয়োগ করবে। গ্রাহক অর্থায়নকারীর পক্ষ হতে সে পণ্য ক্রয় করবে। এ ক্ষেত্রে গ্রাহক প্রথমে উক্ত পণ্য অর্থায়নকারীর পক্ষ হতে উকিল হিসেবে ক্রয় করবে এবং তাতে তার প্রতিনিধি হিসেবে কব্জা করবে। অতঃপর তার থেকে বাকি মূল্যে ক্রয় করবে। প্রথম পর্যায়ে উক্ত পণ্যে গ্রাহকের কব্জা অর্থায়নকারীর উকিল হিসেবে হবে। এ সময় পণ্যটি গ্রাহকের কব্জায় শুধুমাত্র আমানত হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে, মালিকানা থাকবে অর্থায়নকারীর। ফলে এর দায়ভারও অর্থায়নকারীর উপরই থাকবে। তবে গ্রাহক যখন অর্থায়নকারী থেকে সে পণ্য ক্রয় করে নিবে, তখন মালিকানা এবং দায়ভার গ্রাহকের দিকে প্রত্যাবর্তন হয়ে যাবে।

(৭) পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন পণ্য বিক্রেতার কব্জায় না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার বিক্রি সঠিক হবে না। কিন্তু সে পণ্য

যদি বিক্রেতার কব্জায় না থাকে, তাহলে বিক্রির অঙ্গীকার করতে পারবে। এই নীতিমালা মুরাবাহায়ও গ্রহণযোগ্য।

(৮) উল্লেখিত নীতিমালাসমূহের আলোকে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিম্ন বর্ণিত প্রক্রিয়া গ্রহণ করে মুরাবাহাকে অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে।

প্রথম ধাপ ঃ

আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং গ্রাহক একটি বহুমুখী চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করবে, যার আলোকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান কাংক্ষিত পণ্যের বিক্রি এবং গ্রাহক উক্ত পণ্য যথাসময়ে একটি নির্ধারিত মুনাফা অনুপাতে ক্রয় করার অঙ্গীকার করবে। চুক্তিনামায় এই ক্রয়-বিক্রয় বাস্তবায়নের সর্বশেষ সময়ও নির্ধারণ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় ধাপ ঃ

গ্রাহকের (Client) যখন নির্দিষ্ট পণ্যের প্রয়োজন হবে, তখন আর্থিক প্রতিষ্ঠান সে পণ্য ক্রয়ের জন্য গ্রাহককে তার উকিল নিয়োগ করবে। ওকালতির এই চুক্তিনামায় উভয়পক্ষের স্বাক্ষর থাকতে হবে।

তৃতীয় ধাপ ঃ

গ্রাহক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে সে পণ্য ক্রয় করবে এবং প্রতিষ্ঠানের উকিল হিসেবে তা কব্জা করবে।

চতুর্থ ধাপ ঃ

গ্রাহক প্রতিষ্ঠানকে পণ্য ক্রয়ের ব্যাপারে অবগত করবে এবং সে পণ্য তার থেকে ক্রয় করার প্রস্তাব করবে।

পঞ্চম ধাপ ঃ

আর্থিক প্রতিষ্ঠান সে প্রস্তাব গ্রহণ করবে, তাতে ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণ হয়ে যাবে। যার ফলে উক্ত পণ্যের মালিকানা এবং দায়ভার উভয়টি গ্রাহকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে যাবে।

সঠিক মুরাবাহার জন্য এই পাঁচটি ধাপ অপরিহার্য। আর্থিক প্রতিষ্ঠান যদি সে পণ্য সরবরাহকারী (Supplier) থেকে সরাসরি ক্রয় করে নেয় (এবং এটাই সর্বোত্তম) তাহলে ওকালতি চুক্তির প্রয়োজন থাকবে না। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ধাপ থাকবে না। তৃতীয় ধাপে আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্বয়ং সাপ্লাইকারী থেকে ক্রয় করবে এবং চতুর্থ ধাপে শুধুমাত্র গ্রাহকের পক্ষ হতে প্রস্তাব হবে।

এই চুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই, যে পণ্যে মুরাবাহা হচ্ছে, সে পণ্য তৃতীয় এবং পঞ্চম ধাপের মধ্যবর্তী সময়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি এবং দায়ভারে থাকে।

এই একটি বৈশিষ্ট্য, যা মুরাবাহাকে সুদি ঋণ থেকে ভিন্ন করে দেয়, এ জন্য প্রত্যেক মূল্যে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য। নচেৎ মুরাবাহা চুক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক হবে না।

(৯) মুরাবাহা সঠিক হওয়ার জন্য এটাও জরুরী যে, সে পণ্য তৃতীয় কোন পার্টি থেকে ক্রয়কৃত হতে হবে। পণ্যটি স্বয়ং গ্রাহক থেকে buy back এর ভিত্তিতে ক্রয় করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। কেননা, বাই ব্যাক-এর ভিত্তিতে মুরাবাহা সুদভিত্তিক ঋণ-ই।

(১০) মুরাবাহার উল্লেখিত প্রক্রিয়া একটি জটিল চুক্তি, যে চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষ এক এক ধাপে এক এক রূপ ধারণ করে।

(ক) প্রথম ধাপে আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং গ্রাহক ভবিষ্যতে কোন পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে অঙ্গীকার করে, এটা প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয় নয়। এটা শুধুমাত্র ভবিষ্যতে মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রির একটি অঙ্গীকার। এ জন্য উভয়ের মাঝে অঙ্গীকারকারী (promisor) এবং অঙ্গীকার গ্রহণকারীর (promisee) সম্পর্ক হয়।

(খ) দ্বিতীয় ধাপে উভয়পক্ষের মাঝে মক্কেল এবং উকিলের সম্পর্ক হয়।

(গ) তৃতীয় ধাপে আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সরবরাহকারীর (supplier) মাঝে বিক্রেতা এবং ক্রেতার সম্পর্ক হয়।

(ঘ) চতুর্থ এবং পঞ্চম ধাপে গ্রাহক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাঝে বিক্রেতা এবং ক্রেতার সম্পর্ক শুরু হয়ে যায়। বিক্রি যেহেতু বাকি মূল্যে হচ্ছে, সেহেতু বিক্রির সাথে সাথে ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহিতার সম্পর্কও শুরু হয়ে যায়।

এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং সেগুলোর যথা সময়ে স্বীয় পরিণামের সাথে বাস্তবায়ন হওয়া জরুরী। এ বিষয়গুলো পরস্পরে বিমিশ্রিত ও তালগোল পাকানো অবস্থা সৃষ্টি না হওয়া উচিত।

(১১) মূল্য সময়মত পরিশোধের আশ্বস্ততার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রাহক থেকে কোন ধরনের জামানতের দাবীও করতে পারবে। সে বিল অফ একচেঞ্জ কিংবা প্রমিসরী নোটে স্বাক্ষরেরও দাবী করতে পারবে। কিন্তু এ দাবী তখন করতে পারবে, যখন কার্যত ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন হয়ে যাবে। অর্থাৎ- পঞ্চম ধাপে। তার কারণ হল, প্রমিসরী নোটে স্বাক্ষর ঋণগ্রহিতা ঋণদাতার অধিকারের উপর করে। আর আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং গ্রাহকের মাঝে এ সম্পর্ক পঞ্চম ধাপেই বাস্তবায়ন হয়, যখন কার্যত ক্রয়-বিক্রয় অস্তিত্বে এসে যায়।

(১২) ক্রেতা যদি সময়মত মূল্য পরিশোধ করতে না পারে, তাহলে এ কারণে মূল্যে বৃদ্ধি করা যাবে না। তবে ক্রেতা এ চুক্তি করেছিল যে, সে এক্ষেত্রে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে অর্থ প্রদান করবে, তাই এ অর্থ পরিশোধ করা তার কর্তব্য হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে বাইয়ে মুয়াজ্জালের বিধি-বিধান বর্ণনা করার সময় ৭ নং বিধানে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ক্রেতা থেকে গ্রহণকৃত এই অর্থ অর্থায়নকারী কিংবা বিক্রেতা তাদের আয়ের অংশ বানাতে পারবে না। বরং তাদের কর্তব্য হবে সে অর্থ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা। এ ব্যাপারে আরো বিশদ বর্ণনা সামনে আসবে।

মুরাবাহা সম্পর্কে কয়েকটি আলোচনা

মুরাবাহার মৌলিক ধারণা সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পর যথাযোগ্য মনে হচ্ছে যে, মুরাবাহায় ঘটমান কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসাআলার উপর

ইসলামী নীতিমালা এবং তা আমলযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করা। কেননা এসব মাসআলাকে সঠিকভাবে বুঝা ব্যতীত মুরাবাহার ধারণা অস্পষ্ট থেকে যায় এবং প্রয়োগক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে।

(১) বাকি এবং নগদের জন্য পৃথক পৃথক মূল্য নির্ধারণ করা

মুরাবাহা সম্পর্কে সর্বপ্রথম প্রশ্ন হল, যখন মুরাবাহাকে অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তখন বিক্রি সর্বদা বাকি মূল্যে হয়। অর্থায়নকারী কাংক্ষিত পণ্য নগদ মূল্যে ক্রয় করে এবং তার গ্রাহকের নিকট বাকিতে বিক্রি করে। বাকিতে বিক্রির ক্ষেত্রে যতদিন পর গ্রাহক মূল্য পরিশোধ করে, সে সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখা হয় এবং সে অনুপাতে অর্থায়নকারী মূল্যও বৃদ্ধি করে দেয়। মুরাবাহার পরিপক্বতার সময় (মূল্য পরিশোধের তারিখ) যত বেশি হবে মূল্যও তত বেশি হবে। এ কারণে ইসলামী ব্যাংকসমূহে মুরাবাহায় পণ্যের মূল্য বাজারদর অপেক্ষা বেশি হয়। গ্রাহক যদি সেই পণ্যটি বাজার থেকে নগদ মূল্যে ক্রয় করত, তাহলে মুরাবাহার বাকি মূল্যের থেকে অধিক সস্তায় পেত। এখন প্রশ্ন হল, বাকি বিক্রয়ে কোন জিনিসের মূল্য নগদ মূল্যের তুলনায় অধিক ধার্য করা যাবে কি না। কেউ কেউ বলেন ক্রেতাকে প্রদেয় অবকাশের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাকি মূল্যে যে অতিরিক্ত সংযোজন করা হয় তাকে ঋণের উপর গৃহীত সুদেরই সাদৃশ্য মনে করা উচিত। কেননা, উভয় অবস্থায় অতিরিক্ত অর্থ বাকিতে মূল্য পরিশোধ হওয়ার কারণে গ্রহণ করা হয়। এই যুক্তির ভিত্তিতে তারা বলেন যে, ইসলামী ব্যাংকসমূহে মুরাবাহার উপর যেভাবে আমল হচ্ছে, তা মূলত আধুনিক ব্যাংকসমূহের সুদি ঋণ থেকে ভিন্ন নয়।

এই যুক্তিটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে যৌক্তিক মনে হলেও মূলত তা শরীয়তে সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার উসূলের ভুল বুঝাবুঝির উপর নির্ভরশীল। ব্যাপারটি সঠিকভাবে বুঝার জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো মনে রাখা জরুরী।

(১) আধুনিক পুঁজিবাদি দৃষ্টিভঙ্গী ব্যবসায়িক লেনদেনে পণ্য এবং মুদ্রার (নগদ টাকার) মাঝে কোন পার্থক্য করে না। পারস্পরিক লেনদেনে

পণ্য এবং মুদ্রার সাথে সমান আচরণ করা হয়। উভয়টিই ব্যবসাযোগ্য, উভয়টিরই ক্রয়-বিক্রয় ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মতিক্রমে যে কোন মূল্যে হতে পারে। কোন ব্যক্তি এক ডলারকে দু'ডলারের বিনিময়ে নগদ বা বাকিতে এমনিভাবে বিক্রি করতে পারে যেমনিভাবে এক ডলার মূল্যের কোন পণ্যকে দু'ডলারের বিনিময়ে বিক্রি করতে পারে। শর্ত শুধু উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে হওয়া।

ইসলামী নীতিমালা এই দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন করে না। ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী মুদ্রা (নগদ টাকা) এবং পণ্যের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ কারণে এগুলোর উপর আহকামও পৃথক পৃথক প্রয়োগ করা হয়। মুদ্রা (Money) এবং পণ্যের (Commodity) মাঝে পার্থক্যের মৌলিক বিষয়গুলো নিম্নে বর্ণিত হচ্ছে।

(১) মুদ্রার নিজস্ব কোন ভ্যালু নেই। এর দ্বারা সরাসরি মানুষের প্রয়োজন পূরণ করা যায় না। এগুলোকে শুধুমাত্র পণ্য এবং সেবা অর্জনের জন্য ব্যবহার করা হয়। পক্ষান্তরে পণ্যের নিজস্ব ভ্যালু রয়েছে। এগুলোকে অন্য কোন জিনিসে রূপান্তরিত করা ব্যতীত সরাসরিও এর দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়।

(২) পণ্য মানদণ্ড এবং গুণগত দিক থেকে বিভিন্ন রকমের হতে পারে। পক্ষান্তরে মুদ্রা শুধুমাত্র মূল্য নির্ধারণ এবং আদান-প্রদানের মাধ্যম। এজন্যই মুদ্রার যে কোন মূল্যমানের একটি একক তার আরেকটি এককের একশ' পার্সেন্ট সমান। পাঁচশ টাকার পুরাতন এবং ময়লাযুক্ত একটি নোট পাঁচশ টাকার নতুন আরেকটি নোটের একশ' পার্সেন্ট সমতুল্য। অথচ পণ্য বিভিন্ন মানদণ্ডের হতে পারে। একটি ব্যবহৃত পুরাতন গাড়ির মূল্য একটি নতুন গাড়ির মূল্য অপেক্ষা অনেক কম হয়।

(৩) পণ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি একটি নির্দিষ্ট জিনিসের উপর হয় অথবা কমপক্ষে সে জিনিসের গুণাগুণ নির্দিষ্ট হয়। (যেমন এমন ধরনের গম)। 'ক' যদি একটি নির্দিষ্ট গাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে তা ক্রয় করে এবং বিক্রেতাও তাতে একমত পোষণ করে, তাহলে সেই গাড়িটি গ্রহণে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। বিক্রেতা এর স্থলে অন্য কোন গাড়ি নেয়ার

জন্য তাকে বাধ্য করতে পারবে না। যদিও অন্য গাড়িটি সেই জাতীয় এবং একই মানদণ্ডের হয়। এরকম শুধু তখন হতে পারে যখন ক্রেতাও এব্যাপারে একমত পোষণ করবে। যার প্রয়োগিক অর্থ হবে এই যে, প্রথম ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে গিয়েছে এবং পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে নতুন ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে মুদ্রা কোন আদান-প্রদানের লেনদেনে নির্দিষ্ট করা যায় না। "ক" যদি "খ" থেকে কোন জিনিস তাকে পাঁচশ টাকার একটি নির্দিষ্ট নোট দেখিয়ে ক্রয় করে, তাহলেও সে উক্ত নোটের স্থলে সেই মূল্যমানের অন্য নোট প্রদান করতে পারবে। বিক্রেতা তাকে এ কথার উপর বাধ্য করতে পারবে না যে, সে শুধুমাত্র সেই নোটটিই নিবে, যা বিক্রির সময় তাকে দেখানো হয়েছিল।

এসব পার্থক্যকে সামনে রেখে ইসলাম মুদ্রা এবং পণ্যের সাথে পৃথক পৃথক আচরণ করে। মুদ্রার যেহেতু নিজস্ব কোন ভ্যালু নেই, সে শুধুমাত্র আদান-প্রদানের মাধ্যম, যার মানদণ্ড এবং গুণগত দিক বলতে কিছুই নেই। সেজন্য মুদ্রার একটি একক সেই মূল্যমানের আরেকটি এককের বিনিময়ে আদান-প্রদান শুধুমাত্র সমান সমান এর ক্ষেত্রে-ই হতে পারে। যদি পাকিস্তানী এক হাজার টাকার একটি নোটের আদান-প্রদান পাকিস্তানী আরেকটি নোটের বিনিময়ে করা হয়, তাহলে দ্বিতীয় নোটটিও এক হাজার টাকার-ই হতে হবে। তার মূল্যমান এক হাজার টাকা থেকে কমবেশি হতে পারবে না। যদি ও ক্রয়-বিক্রয় নগদ হোক না কেন। কেননা, কারেন্সি নোটের না নিজস্ব কোন ভ্যালু আছে এবং না তার যা শরীয়ত সমর্থিত কোয়ালিটিগত কোন পার্থক্য আছে। এ কারণে যে কোন দিকে যে কোন মূল্যমান অতিরিক্ত হবে তা বিনিময় বিহীন হবে, ফলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয হবে। যখন উভয় দিকে মুদ্রার লেন-দেন হবে তখন বিষয়টি যেমনিভাবে নগদ ক্রয়-বিক্রয়ের উপর প্রযোজ্য হয়, তেমনিভাবে বাকি ক্রয়-বিক্রয়ের উপরও প্রযোজ্য হবে। কেননা, টাকার আদান-প্রদান টাকার বিনিময়ে বাকিতে করার সময় যদি একদিক থেকে অতিরিক্ত অর্থ নেয়া হয়, তাহলে তা শুধুমাত্র বাকির সময় এবং মেয়াদের বিনিময়েই হবে।

সাধারণ পণ্যে অবস্থা এর চেয়ে ভিন্নরূপ। কেননা, পণ্যের নিজস্ব ভ্যালু রয়েছে এবং পণ্যের মানদণ্ডেও পার্থক্য হয়ে থাকে। এজন্য মালিকের এই অধিকারও রয়েছে যে, চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধি অনুযায়ী যে কোন মূল্যে বিক্রি করতে পারবে। বিক্রেতা যদি কোন ধরনের প্রতারণা এবং মিথ্যা বর্ণনা না করে, তাহলে সে ক্রেতার সম্মতিক্রমে পণ্যকে বাজারদরের চেয়ে অধিক মূল্যেও বিক্রি করতে পারবে। ক্রেতা যদি সেই অতিরিক্ত মূল্যে সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে বিক্রেতার জন্য এই অতিরিক্ত অর্থও একেবারে বৈধ হবে[১]। যখন নগদ সওদায় পণ্য অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি করতে পারে, তাহলে বাকি সওদার ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ করতে পারবে। শর্ত শুধু এই যে, বিক্রেতা ক্রেতাকে কোন ধরনের ধোঁকা দিতে পারবে না এবং ক্রেতাকে সেই পণ্য ক্রয়ের ব্যাপারে বাধ্যও করতে পারবে না। বরং সে এই পরিমাণ মূল্য প্রদানে স্বীয় স্বাধীন সন্তুষ্টিতে একমত হতে হবে।

কোন কোন সময় একথা বলা হয় যে, ক্রয়-বিক্রয় নগদ হওয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মূল্য বাকিতে আদায়ের উপর নির্ভরশীল নয়, তাই এর তো অনুমতি হওয়া উচিত। কিন্তু যেখানে ক্রয়-বিক্রয় বাকিতে হয় সেখানে অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন একমাত্র সময়ের বিনিময়ে হয়, যার কারণে তাকে সুদেরই সাদৃশ্য করে দেয়। কিন্তু এই যুক্তিও সেই ভ্রান্ত ধারণার উপর নির্ভরশীল যে, যেখানেই পরিশোধের সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন করা হয়, সেই লেনদেন সুদের আওতার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এই ধারণা করাই সঠিক নয়। বাকিতে পরিশোধের বিনিময়ে গৃহীত অতিরিক্ত পরিমাণ তখনই সুদ হবে, যখন উভয়দিক থেকে চুক্তি মুদ্রার উপর হবে। কিন্তু যদি পণ্যকে মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করা হয়, তাহলে বিক্রেতা মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে কয়েকটি দিককে সামনে রাখে। যার মধ্যে পরিশোধের সময়ও অন্তর্ভুক্ত থাকে। এজন্য সে অতিরিক্ত মূল্যও চাইতে পারে এবং ক্রেতা বিভিন্ন কারণের ভিত্তিতে তার সাথে একমত পোষণ করতে পারে।

---

১. যেহেতু সেই সমুদয় অর্থ বিক্রিত পণ্যের বিনিময়ে এবং তার কোন অংশও বিনিময় বিহীন নয়।

(ক) যে ক্রেতা মার্কেট কিছুটা দূরে হওয়ার কারণে মার্কেটে যেতে চায় না, বিক্রেতার দোকান সেই ক্রেতার খুব নিকটবর্তী।

(খ) ক্রেতার দৃষ্টিতে এই বিক্রেতা অন্যদের তুলনায় অধিক বিশ্বস্ত এবং ক্রেতা বিক্রেতার উপর এ ব্যাপারে অধিক আশ্বস্ত যে, সে তাকে তার কাংক্ষিত বস্তু নির্ভেজাল সরবরাহ করবে।

(গ) যে সব জিনিসের চাহিদা বেশি হয় (এ জন্য তা অপ্রতুল ও হয়ে যায়) সে সব জিনিস বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতা এই ক্রেতাকে প্রাধান্য দেয়, যার কারণে এই ক্রেতাও তার থেকে ক্রয় করা পছন্দ করে, যাতে ঐ জিনিস বাজারে স্বল্প হলেও তা পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে।

(ঘ) এর দোকানের পরিবেশ অন্যান্য দোকানের তুলনায় অধিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং আরামদায়ক।

বিক্রেতা গ্রাহক থেকে অধিক মূল্য গ্রহণের জন্য এ জাতীয় আরো অন্যান্য বিষয় স্বীয় কৌশল হিসেবে অবলম্বন করে। এমনিভাবে যদি কোন বিক্রেতা তার গ্রাহক থেকে অতিরিক্ত মূল্য এ জন্য গ্রহণ করে যে, সে তাকে বাকির সুযোগ প্রদান করছে, তাহলে তাও শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয হবে না। তবে শর্ত হল সে ধোঁকা দিতে পারবে না এবং ক্রেতা সে পণ্য স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে গ্রহণ করতে হবে। কেননা, মূল্যে অতিরিক্তের কারণ যাই হোক না কেন, সম্পূর্ণ মূল্য ঐ জিনিসের বিনিময়েই হয় মুদ্রার বিনিময়ে নয়। একথা সঠিক যে, মূল্য নির্ধারণ করার সময় সে পরিশোধের সময়কে লক্ষ্য রেখেছে। কিন্তু যখন মূল্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে, তখন এই মূল্য উক্ত পণ্যের দিকেই অর্পিত হবে, সময়ের দিকে নয়। একারণেই ক্রেতা যদি নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করতে না পারে, তাহলে মূল্য সেই পরিমাণেই থাকে, বিক্রেতা পরিমান বৃদ্ধি করতে পারে না। মূল্য যদি সময়ের বিনিময়ে হত, তাহলে বিক্রেতা যখন তাকে অতিরিক্ত সময় দেয়, তখন সে মূল্যও বৃদ্ধি করতে পারতো।[১]

---

১. সার কথা হল এই যে, মূল্য এ জন্য বৃদ্ধি করা হয় যে, গ্রাহকের এই ব্যক্তি থেকে ক্রয়ের ব্যাপারে আগ্রহ এবং চাহিদা বেশি থাকে, এই আগ্রহের বিভিন্ন কারণ হতে পারে।

অন্যভাবে এটাও বলা যেতে পারে যে, টাকার আদান-প্রদান যেহেতু শুধুমাত্র সমান সমান হলেই হতে পারে, এজন্য পূর্ব বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী ক্রয়-বিক্রয় বাকি হওয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ যে পরিমাণই নেয়া হবে (যখন টাকাকে টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা হবে) তা শুধুমাত্র সময়ের বিনিময়েই হবে। এ কারণেই সুদি পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময় আসার পর ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে অতিরিক্ত সময়ের সুযোগ প্রদান করে তার থেকে অতিরিক্ত অর্থও গ্রহণ করে নেয়। পক্ষান্তরে একটি বাকি ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্য নির্ধারণে সময় একক উপাদান নয়, মূল্য সেই জিনিসের বিনিময়েই ধার্য করা হয়, সময়ের বিনিময়ে নয়। তদুপরি পূর্বোল্লেখিত অন্যান্য উপাদানের ন্যায় সময়ও মূল্য নির্ধারণে আংশিক সংযোজনের কাজ করেছে, কিন্তু এই উপাদান যখন একবার তার কাজ আদায় করে ফেলেছে, তখন মূল্যের প্রত্যেক অংশ সেই জিনিসের দিকেই অর্পিত হবে[১]।

এসব আলোচনার সারাংশ এই যে, যখন টাকার বিনিময়ে টাকার লেনদেন করা হবে, তখন ক্রয়-বিক্রয় নগদ হোক কিংবা বাকি হোক কোন অবস্থায়ই কম-বেশি করা জায়েয হবে না। কিন্তু যখন টাকার বিনিময়ে কোন পণ্য বিক্রি করা হবে, ক্রয়-বিক্রয় নগদ হোক কিংবা বাকি হোক, তখন উভয়পক্ষের মাঝে নির্ধারিত মূল্য বাজারমূল্য অপেক্ষা বেশিও হতে পারবে। পরিশোধের সময়ের ব্যবধান, মূল্য নির্ধারণে একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় এবং তা পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে। টাকার বিনিময়ে টাকার লেনদেনের মত নয়, কেননা এক্ষেত্রে অতিরিক্ত টাকা শুধুমাত্র সময়ের ব্যবধানের বিনিময়েই হয়ে থাকে।

এই মাসআলাটি চার মাযহাবের ইমামগণের নিকট সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য। তাঁরা বলেন যে, বিক্রেতা যদি কোন জিনিসের নগদ এবং কোনরূপ বাকি বিক্রির জন্য পৃথক পৃথক দু'টি মূল্য নির্ধারণ করে এবং বাকি বিক্রির মূল্য নগদ মূল্য অপেক্ষা বেশি হয়, তাহলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে। শর্ত শুধু এই যে, চুক্তির সময়ই সওদা নগদ হবে না

---

১. সার কথা হল, বেশির চেয়ে এ কথা বলা যেতে পারে যে, এটা সময়ের বিনিময়ে পরোক্ষভাবে প্রত্যক্ষভাবে নয়।

বাকি হবে, দু'টির যে কোন একটিকে নির্ধারণ করে নিতে হবে। তাতে অস্পষ্টতা বিদ্যমান থাকতে পারবে না। উদারহরণস্বরূপ ক্রয়-বিক্রয়ে দর কষাকষির (Bargaining) সময় বিক্রেতা ক্রেতাকে বলল, তুমি যদি এই জিনিস নগদ মূল্যে ক্রয় কর, তাহলে একশ' টাকা, আর যদি ছয় মাসের বাকিতে ক্রয় কর, তাহলে মূল্য হবে একশ' দশ টাকা। কিন্তু ক্রেতাকে দু'টির যে কোন একটিকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত তখনই গ্রহণ করতে হবে। যেমন সে বলল, এই জিনিস বাকি মূল্যে একশ' দশ টাকায় ক্রয় করেছে, তাহলে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদনের সময় মূল্য উভয়পক্ষের মাঝে নির্ধারিত থাকে।

কিন্তু দু'টির যে কোন একটিকে যদি সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট না করা হয়, তাহলে ক্রয়-বিক্রয় সঠিক হবে না। এমনটি কিস্তিতে পরিশোধের ঐসব ক্রয়-বিক্রয়ও সম্ভব, যেখানে পরিশোধের সময় পৃথক পৃথক হওয়ার কারণে পৃথক পৃথক মূল্যের দাবী করা হয়। তখন বিক্রেতা পরিশোধের সিডিউল হিসেবে মূল্যের একটি সিডিউল তৈরি করে। যেমন তিন মাস বাকির ক্ষেত্রে এক হাজার টাকা নেয়া হবে, ছয় মাস বাকির ক্ষেত্রে এগারশ' টাকা, নয় মাস বাকির ক্ষেত্রে বারশ' টাকা ইত্যাদি। এমতাবস্থায়, ক্রেতা তিনটির কোন একটিকে গ্রহণ করবে তা নির্ধারিত করা ব্যতীত সে জিনিসটি নিয়ে নেয়। আর মনে মনে ভাবে যে, ভবিষ্যতে পরিশোধ নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী করবে। (অর্থাৎ যদি তিন মাসে পরিশোধ সম্ভব হয়, তাহলে এক হাজার টাকা দিবে আর যদি ছয় মাসে সম্ভব হয়, তাহলে এগারশ' টাকা দিবে) এই চুক্তি সঠিক হবে না [১]। কেননা, মূল্য এবং পরিশোধের সময় উভয়টি অজানা, কিন্তু সে যদি যে কোন একটিকে সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে নেয়, যেমন সে বলল-এই জিনিসটি ছয় মাসের বাকিতে এগারশ' টাকায় ক্রয় করেছে, তাহলে ক্রয়-বিক্রয় সঠিক হবে।

এখানে আরেকটি কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, উপরে যে পদ্ধতির বৈধতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাহল এই যে, নগদ ক্রয়-বিক্রয়

১. ইবন কুদামা, আল-মুগনী ৪/২৯০, আস্‌সারাখসী, আল-মাবসূত ১৩/৮, আদ্‌দুসূকী, ৩/৮৫, মুগনীল মুহতাজ, ২/৩১।

অপেক্ষা বাকি ক্রয়-বিক্রয় মূল্য অধিক ধার্য করা যাবে। তবে বিক্রি যদি নগদই হয়ে থাকে, কিন্তু বিক্রেতা এই শর্তারোপ করে দেয় যে, ক্রেতা যদি মূল্য পরিশোধে বিলম্ব করে, তাহলে সে বার্ষিক দশ পার্সেন্ট অতিরিক্ত জরিমানা হিসেবে কিংবা সুদ হিসেবে গ্রহণ করবে, তাহলে এটা নিশ্চিতরূপে নাজায়েয। কেননা, এখন যে অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করা হচ্ছে, তা ঋণের উপর গৃহীত সুদ ছাড়া কিছুই নয়[১]।

উভয় পদ্ধতির মাঝে প্রয়োগিক পার্থক্য এই, যেখানে অতিরিক্ত টাকা পণ্যের মূল্যেরই একটি অংশ হবে, সেখানে এই অতিরিক্ত টাকা একবারেই উসূল করা হবে, দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয়বারে নয়। ক্রেতা যদি সময়মত পরিশোধ না করে, তাহলে একারণে বিক্রেতা অতিরিক্ত টাকার দাবী করতে পারবে না, বরং মূল্য ততটুকুই থাকবে। পক্ষান্তরে যেখানে বাজারমূল্যের উপর অতিরিক্ত টাকা পণ্যের মূল্যের অংশ হয় না, সেখানে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে এই অতিরিক্ত টাকা বাড়তে থাকবে।

(২) প্রচলিত সুদের হারকে নমুনা বানানো

মুরাবাহার মাধ্যমে অর্থায়নকারী অনেক আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের মুনাফার নির্ধারণ প্রচলিত সুদের হারের ভিত্তিতে করে থাকে। যার জন্য সাধারণত LIBOR[২] অর্থাৎ লন্ডনে ব্যাংকসমূহের পারস্পরিক সুদের হারকে নমুনা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেমন, LIBOR যদি ছয় পার্সেন্ট

---

১. এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, ক্রয়-বিক্রয় যদি নগদ কিংবা বাকির কোন উল্লেখ না থাকে, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে সেই বিক্রিকে নগদই মনে করা হবে এবং বিক্রেতা যখন ইচ্ছা মূল্য দাবী করতে পারবে।

২. কোন কোন ব্যাংকের কাছে প্রয়োজনাতিরিক্ত নগদ অর্থ থাকে এবং কোন কোন ব্যাংকের কাছে ঋণ প্রদানের জন্য অর্থ কম থাকে, এ ধরনের ব্যাংক প্রথম ধরনের ব্যাংক হতে সাধারণত ঋণ গ্রহণ করে, এর দ্বারা ব্যাংকসমূহের পারস্পরিক মার্কেট অস্তিত্বে আসে, এই মার্কেটে বিশেষ কোন মেয়াদের জন্য যে হারে সুদ নির্ধারণ করা হয়, তাকে Inter-Bank Market Offered Rate বলা হয়। যার সংক্ষিপ্ত হল "IBOR"। লন্ডনে ব্যাংকসমূহের মার্কেটের এ ধরনের সুদের হারকে London Inter-Bank Market Offered Rate বলা হয়। যার সংক্ষিপ্ত হল "LIBOR"। ঋণের আদান-প্রদানে এর নাম খুব বেশি আসে।

হয়, তাহলে এই ব্যাংক তার মুনাফা ছয় পার্সেন্ট কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশি ধার্য করে নেয়। এই পদ্ধতির উপরও এই অভিযোগ করা হয় যে, যে মুনাফা সুদের হারের উপর নির্ভরশীল হবে, তাও সুদের ন্যায় হারাম হওয়া উচিত।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হালাল মুনাফা নির্ধারণের জন্য সুদের হারকে ব্যবহার করা অপছন্দনীয় এবং এর দ্বারা এই লেনদেন কমপক্ষে বাহ্যিকভাবে হলেও সুদি ঋণের সাদৃশ্য হয়ে যায়। আর সুদ কঠোরভাবে হারাম হওয়ার দাবি হল এই বাহ্যিক সাদৃশ্যতা থেকেও যথাসম্ভব বেঁচে থাকা উচিত। কিন্তু এই বাস্তবতাও ভুলবার নয় যে, মুরাবাহা সঠিক হওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবি এই যে, তা একটি প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয় হতে হবে যেখানে ক্রয়-বিক্রয়ের সকল আনুষঙ্গিক বিষয় পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায়। যদি কোন মুরাবাহায় পূর্ব বর্ণিত সেই সব শর্ত পাওয়া যায়, তাহলে শুধুমাত্র মুনাফা নির্ধারণের জন্য সুদের হারকে নমুনা হিসেবে ব্যবহার করার দ্বারা এই চুক্তি অশুদ্ধ এবং হারাম হয়ে যাবে না। কেননা, লেনদেন মূলত সুদের উপর নয়, সুদের হারকে তো শুধুমাত্র নমুনা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এ কথাটি একটি উদাহরণের দ্বারা বুঝা যেতে পারে।

"ক" এবং "খ" দু'ভাই। "ক" মদের ব্যবসা করে, যা একেবারে হারাম। "খ" একজন আল্লাহওয়ালা মুসলমান, তাই সে এই ব্যবসাকে পছন্দ করে না। এজন্য সে নেশাবিহীন হালাল পানীয়-এর ব্যবসা শুরু করেছে। কিন্তু সে চায়, তার ব্যবসায়ও সে পরিমাণ মুনাফা হোক, যে পরিমাণ অন্য ভাই মদের ব্যবসায় অর্জন করে। এ জন্য সে মনস্থির করেছে যে, সে তার গ্রাহকদের থেকে ঐ অনুপাতে মুনাফা নিবে, যে অনুপাতে "ক" মদের উপর নেয়। তাহলে সে তার মুনাফার অনুপাতকে "ক" এর নাজায়েয ব্যবসার মুনাফার সাথে সম্পৃক্ত করে নিয়েছে। কোন ব্যক্তি এমন করাটাকে পছন্দ হওয়া বা না হওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করতে পারে, কিন্তু এ কথা সুস্পষ্ট যে, কেউ এ কথা বলতে পারবে না, এই বৈধ ব্যবসা থেকে উপার্জিত মুনাফা হারাম। কেননা, সে মদের মুনাফাকে শুধুমাত্র নমুনা হিসেবে ব্যবহার করেছে।

এমনিভাবে মুরাবাহা যদি ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে হয়ে থাকে এবং তার অপরিহার্য শর্তসমূহও পূরণ করা হয়, তাহলে মুনাফার হারকে প্রচলিত সুদের হারের নমুনায় নির্ধারণ করার দ্বারা এই চুক্তি নাজায়েয হবে না।

তবে এ কথা সত্য যে, ইসলামী ব্যাংকসমূহ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য যত দ্রুত সম্ভব এই পদ্ধতি থেকে নিস্কৃতি লাভ করা উচিত। কেননা, প্রথমত এতে সুদের হারকে বৈধ ব্যবসার জন্য আদর্শ এবং মানদণ্ড মনে করা হয়, যা অপছন্দনীয়। দ্বিতীয়ত এর দ্বারা ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক দর্শনের অগ্রগতি ও উন্নয়নে চরমোৎকর্ষণ সাধিত হয় না। কেননা, এর দ্বারা সম্পদ বণ্টন নীতিতে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করে না। এজন্য ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উচিত তারা যেন তাদের মানদণ্ড এবং নমুনা গঠন করে। এর একটি পদ্ধতি এটা হতে পারে যে, ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে তাদের ইন্টার ব্যাংক মার্কেট গঠন করবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি যৌথ শাখা বানানো যেতে পারে, যা প্রকৃত সম্পদের ভিত্তিতে আদান-প্রদান যোগ্য ডকুমেন্টে পুঁজি বিনিয়োগ করবে। যেমন, মুশারাকা, ইজারা ইত্যাদি। যদি সেই শাখার সম্পদ জড় পদার্থ আকৃতির হয় যেমন ইজারাকৃত সম্পদ (Lease) সম্পদ, আসবাবপত্র এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের অংশসমূহ। তাহলে এই শাখার ইউনিটসমূহের ক্রয়-বিক্রয় তার সম্পদের প্রকৃত মূলধনের ভিত্তিতে হতে পারে। যা ধীরে ধীরে নির্ধারণ করা যাবে। এই ইউনিট আদান-প্রদানযোগ্য হবে এবং সেগুলোকে তাৎক্ষণিক এবং সাময়িক অর্থায়নের (Overnight Finance) জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। যেসব ব্যাংক-এর নিকট প্রয়োজনাতিরিক্ত তারল্য (Liquidity) থাকবে, তারা সেসব ইউনিটসমূহকে ক্রয় করতে পারবে এবং তাদের যখন দ্বিতীয়বার তারল্য অর্জনের প্রয়োজন হবে, তখন সেগুলো তারা বিক্রি করতে পারবে। এই ব্যবস্থাপনায় একটি ইন্টার ব্যাংক মার্কেট অস্তিত্বে এসে যাবে এবং ইউনিটসমূহের প্রচলিত মূল্যকে মুরাবাহা ও ইজারায় (Lease) মুনাফা নির্ধারণে নমুনা হিসেবেও ব্যবহার করা যাবে।

(৩) ক্রয়ের অঙ্গীকার

বর্তমানে শরীয়ত বিদ্বজ্জনদের মাঝে মুরাবাহা সম্পর্কে আরেকটি আলোচনার বিষয় এই যে, গ্রাহক ফিন্যাসের আবেদ করা মাত্রই ব্যাংক/অর্থায়নকারী ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না কেননা, কাংক্ষিত বস্তু তখন ব্যাংক-এর মালিকানায় থাকে না। যেমন পূর্বে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি এমন জিনিস বিক্রি করতে পারবে না যা তার মালিকানায় নেই এবং এমন জিনিসও বিক্রি করতে পারবে না যা ভবিষ্যতে অস্তিত্ব লাভ করবে (Forward Sale)। সুতরাং তাকে অবশ্যই প্রথমে সে জিনিস সাপ্লাইকারী থেকে ক্রয় করতে হবে। অতঃপর তা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কব্জা করে গ্রাহকের নিকট বিক্রি করবে। ব্যাংক কিংবা অর্থায়নকারী সে জিনিস ক্রয় করার পর গ্রাহক যদি তা ক্রয় করার পাবন্দী না করে, তাহলে অর্থায়নকারী এমন অবস্থারও সম্মুখীন হতে পারে যে, সেই কাংক্ষিত বস্তু সংগ্রহ করার জন্য অনেক ব্যয় বহন করেছে, কিন্তু গ্রাহক তা ক্রয় করতে অস্বীকার করে দিয়েছে। এই বস্তুটি এমন ধরনেরও হতে পারে যে, মার্কেটে তার ব্যাপক চাহিদা নেই এবং তা থেকে নিস্কৃতি পাওয়া কঠিন হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে অর্থায়নকারীর অপূরণীয় হয়ে যেতে পারে।

মুরাবাহার এই সমস্যার সমাধান এইরূপে করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, গ্রাহক (Client) একটি চুক্তির উপর স্বাক্ষর করবে, যার আলোকে সে এই অঙ্গীকার করবে যে, অর্থায়নকারী যখন সেই পণ্য সংগ্রহ করবে, তখন সে তা ক্রয় করবে। দু'তরফা হিসেবে ভবিষ্যতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিক্রির (Forward Sale) পরিবর্তে গ্রাহকের পক্ষ থেকে একতরফা ক্রয়ের অঙ্গীকার হবে, যা পালন করার দায়িত্ব গ্রাহকের উপর, অর্থায়নকারীর নয়। এই পদ্ধতি ফরওয়ার্ড সেল থেকে ভিন্ন।

এই সমাধানের উপর আরেকটি প্রশ্ন করা হয় যে, একতরফা অঙ্গীকারের দ্বারা গ্রাহকের উপর শুধুমাত্র চারিত্রিক দায়িত্ব অর্পিত হয়, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে আদালতের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করানো যায় না। এর থেকে আমরা আরেকটি প্রশ্নের দিকে ধাবিত হচ্ছি যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে একতরফা অঙ্গীকার বিচারের দৃষ্টিতেও অপরিহার্য কি না। সাধারণত মনে

করা হয় যে, এটা বিচারের দৃষ্টিতে অপরিহার্য নয়। কিন্তু এ কথাকে বিনাবাক্যব্যয়ে গ্রহণ করার পূর্বে আমরা শরীয়তের মূল উৎসের আলোকে তার পর্যালোচনা করে দেখব।

ইসলামী ফিক্‌হের গ্রন্থাবলীর সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে গভীর অনুসন্ধান করার দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, এই মাসআলায় ফিক্‌হবিদদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে তা উল্লেখ করা হচ্ছে।

(১) অধিকাংশ ফিক্‌হবিদদের মত হল, অঙ্গীকার পূরণ করা একটি উত্তম চরিত্র এবং অঙ্গীকারকারীর তা পূরণ করা উচিত। তা পূরণ না করা ভৎসনা ও তিরস্কার উপযোগী কাজ। কিন্তু তা পূরণ করা অপরিহার্য ও আবশ্যকীয় নয় এবং আদালতের মাধ্যমেও পূরণ করানো যাবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি বর্ণনা করা হয়েছে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফে'য়ী, ইমাম আহমাদ এবং কোন কোন মালেকী ফিক্‌হবিদদের থেকে[১]। তবে সামনে বর্ণনা করা হবে যে, অধিকাংশ হানাফী ও মালেকী ফিক্‌হবিদ এবং কোন কোন শাফে'য়ী ফিক্‌হবিদগণ এই দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে একমত পোষণ করেন না।

(২) অধিকাংশ ফিক্‌হবিদদের মত এই যে, অঙ্গীকার পূরণ করা ওয়াজিব এবং অঙ্গীকারকারীর চারিত্রিক দায়িত্বের সাথে সাথে আইনগত দায়িত্বও হল অঙ্গীকার পূরণ করা। তাদের মাযহাব অনুযায়ী আদালতের মাধ্যমেও অঙ্গীকার পূরণ করানো যাবে। এই মাযহাবটি প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সামুরা ইব্‌ন জুনদুব, উমার ইব্‌ন আব্দিল আজীজ, হাসান বসরী, সায়ীদ ইব্‌নুল আশওয়া, ইসহাক ইব্‌ন রাহ্‌ওয়ায় এবং ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে বর্ণিত।[২] কোন কোন মালেকী ফিক্‌হবিদদের মাযহাবও এটাই। ইবনুল আরাবী এবং ইবনুশ্‌শাত (রহ.) ও এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রসিদ্ধ শাফে'য়ী ফিক্‌হবিদ ইমাম গাযালী (রহ.) ও এর সমর্থন করেছেন।

---

১. উমদাতুল কারী, ১২/১২, মিরকাতুল মাফাতিহ, ৪/৬৫৩, আল-আযকার লিননববী, ২৮২ পৃষ্ঠা, فتح العلى المالك ১/২৫৪।

২. সহীহুল বুখারী, কিতাবুশ শাহাদাত, باب من أمرها بانجاز الوعد ১/৩৮৬।

ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন, অঙ্গীকার যদি পরিপক্কভাবে করা হয়, তাহলে তা পূরণ করা ওয়াজিব। ইব্‌ন শুবরুমা (রহ.)-এর অভিমতও এটাই।[১]

কোন কোন মালেকী ফিক্‌হবিদ তৃতীয় আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গী পেশ করেছেন। তারা বলেন যে, সাধারণ অবস্থায়তো অঙ্গীকার পূরণ করা (বিচারের দৃষ্টিতে) ওয়াজিব নয়। যদি অঙ্গীকারকারীর অঙ্গীকারের কারণে দ্বিতীয় ব্যাক্তির কোনরূপ ব্যয় বহন করতে হয় কিংবা সেই অঙ্গীকারের ভিত্তিতে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে নেয়, তাহলে এধরনের অঙ্গীকার পূরণ করা অপরিহার্য, যা পূরণের জন্য আদালতের মাধ্যমেও চাপ সৃষ্টি করা যাবে।

সমকালীন কোন কোন আলিমের দাবি এই যে, যে সব ফিক্‌হবিদ অঙ্গীকার পূরণ করা ওয়াজিব হওয়াকে সমর্থন করেছেন তা এক তরফা দান কিংবা অন্য কোন জিনিস স্বেচ্ছায় পরিশোধের ব্যাপারে। দু'তরফা ব্যবসায়িক কিংবা আর্থিক চুক্তির অঙ্গীকার সম্পর্কে ঐসব ফিক্‌হবিদ এই ওয়াজিব হওয়াকে সমর্থন করেননি। কিন্তু গভীরভাবে অধ্যয়নের পর এই দৃষ্টিভঙ্গী সঠিক বলে মনে হয় না। কেননা, হানাফী এবং মালেকী ফিক্‌হবিদগণ অঙ্গীকার ওয়াজিব হওয়ার ভিত্তিতে 'বাইউল ওয়াফা'কে বৈধ বলে সাব্যস্ত করেছেন। "বাইউল ওয়াফা" ক্রয়-বিক্রয়ের একটি বিশেষ প্রকার। যার মাধ্যমে কোন স্থাবর সম্পদের ক্রেতা এই অঙ্গীকার করে যে, বিক্রেতা যখন তাকে ঐ সম্পদের মূল্য ফেরত দিয়ে দিবে, তখন সে উক্ত সম্পদকে পুনরায় বিক্রি করে দিবে। বাইউল ওয়াফা বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে প্রথম অধ্যায়ের ক্ষীয়মান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে হাউজ ফিন্যান্সিং-এর ধারণা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। সে আলোচনার সারাংশ এই যে, পুনর্বার ক্রয়কে যদি প্রথম বিক্রির জন্য শর্ত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, তাহলে এই ক্রয়-বিশুদ্ধ হবে না। যদি উভয়পক্ষ প্রথম ক্রয়-বিক্রয়কে নিঃশর্তে করে থাকে, কিন্তু[২] বিক্রেতা

---

১. আল-কুরতুবী, আল জামে লিআহকামিল কুরআন, ১৮/২৯, حاشية ابن الشاط على فروق القراني ৪/২৪, আল-গাযালী, এহয়াউ উলুমিদ্দীন, ৩/১৩৩, ইব্‌ন হাযাম, আল-মহল্লী, ৮/২৮।
২. الفروق للقراني ৪/২৫, فتح العلى المالك ১/২৫৪।

আলাদা এবং পৃথকভাবে উক্ত বিক্রিত সম্পদকে পুনর্বার ক্রয় করার অঙ্গীকারের উপর স্বাক্ষর করে থাকে, তাহলে অঙ্গীকারকারীর উপর এই অঙ্গীকার পূরণ করা অপরিহার্য হয়ে যাবে এবং আদালতের মাধ্যমেও তা বাস্তবায়ন করানো যাবে। এ ক্ষেত্রে অঙ্গীকার পূরণের অপরিহার্যতাকে হানাফী এবং মালেকী উভয় ফিক্হবিদগন সমর্থন করেছেন।[১]

এ কথা সুস্পষ্ট যে, এই অঙ্গীকারের সম্পর্ক দানের সাথে নয়। এটা ভবিষ্যতে বিক্রি করার একটি অঙ্গীকার। এতদসত্ত্বেও হানাফী এবং মালেকী ফিক্হবিদগণ তাকে ওয়াজিব এবং আদালতের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার কথা বলেছেন। এ কথা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, যে সব ফিক্হবিদ অঙ্গীকারকে ওয়াজিব বলেন, তারা দান ইত্যাদির অঙ্গীকারের সাথে এই হুকুমকে বিশিষ্ট করেন না। বরং তাদের নিকট এই উসূল ভবিষ্যতের দু'তরফা চুক্তির অঙ্গীকারের উপরও প্রযোজ্য হবে। বস্তুত কুরআন এবং হাদীস অঙ্গীকার পূরণ করার ব্যাপারে সুস্পষ্ট। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً (بني اسرائيل : ٣٤)

"এবং অঙ্গীকার পূর্ণ কর, নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে (কিয়ামতের দিবসে) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ আয়াত নং-৩৪)

يَـا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَتَفْعَلُونَ (الصف: ٣،٢)

"হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না তা কেন বল? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর নিকট খুবই অসন্তোষজনক।"

(সূরা আস্সাফ ঃ আয়াত নং-২ ও ৩)

ইমাম আবু বাকর জাস্সাস (রহ.) বলেন, কুরআনে কারীমের এই আয়াত বর্ণনা করে যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন কাজ করার দায়িত্ব গ্রহণ

---

১. تحرير الكلام: الحطاب পৃষ্ঠা নং- ২৩৯, বৈরুত ১৪০৪ হিঃ।

করে নেয়, চাই তা ইবাদাতে হোক কিংবা লেনদেনে হোক, তা পূর্ণ করা অপরিহার্য হয়ে যায়[১]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان

"মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি, যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে, যখন তার নিকট কোন আমানত রাখা হয় তাতে খিয়ানত করে[২]।"

এটা তো শুধুমাত্র একটি উদাহরণ। নতুবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসসমূহের এক বিরাট সংখ্যক হাদীস এমন রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে অঙ্গীকার পূরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যুক্তিসঙ্গত কোন ওজর ব্যতীত অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এসব উদ্ধৃতি দ্বারা এতটুকু পরিষ্কার প্রতিভাত হয়েছে যে, অঙ্গীকার পূরণ করা ওয়াজিব। তবে প্রশ্ন হল আদালতের মাধ্যমেও তা পূরণ করানো যাবে কি না, তা অঙ্গীকারের ধরণের উপর নির্ভরশীল। বাস্তবিক পক্ষে কিছু অঙ্গীকার এমন ধরনেরও হয়ে থাকে, যা আদালতের মাধ্যমে পূরণ করানো যায় না। যেমন বাগ্দানের সময় উভয়পক্ষ বিবাহ-শাদীর অঙ্গীকার করে থাকে, এই অঙ্গীকার দ্বারা একটি চারিত্রিক দায়িত্ব অর্পিত হয়ে যায়, কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, এই অঙ্গীকার আদালতের মাধ্যমে পূরণ করানো যায় না। কিন্তু ব্যবসায়িক লেনদেনে যদি কোন পার্টি থেকে কোন জিনিস বিক্রি বা ক্রয় করার অঙ্গীকার করা হয় এবং সে ব্যক্তি এর ভিত্তিতে কিছু দায়দায়িত্বও গ্রহণ করে নেয়, তাহলে এখানে সেই অঙ্গীকারকে আদালতের মাধ্যমে পূরণ না করানোর কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ নেই। সুতরাং ইসলামের সুস্পষ্ট শিক্ষার আলোকে উভয় পক্ষ যদি এ কথার উপর একমত পোষণ করে যে, এই অঙ্গীকার অঙ্গীকারকারীর উপর অপরিহার্য হবে, তাহলে বিচারের দৃষ্টিতেও অপরিহার্য হওয়া উচিত। এই মাসআলার

---

১. আল-জাস্‌সাস, আহকামুল কুরআন, ৩/৪২০।

২. সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান।

সম্পর্ক শুধুমাত্র মুরাবাহার সাথে নয়। ব্যবসায়িক লেনদেনে যদি অঙ্গীকারকে বিচারের দৃষ্টিতে অপরিহার্য না করা হয়, তাহলে এর দ্বারা ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে মারাত্মক ক্ষতি সাধন হতে পারে। এক ব্যক্তি কোন ব্যবসায়ীকে অর্ডার দিচ্ছে যে, আমার জন্য অমুক জিনিস সংগ্রহ করুন এবং এই অঙ্গীকার করে যে, আমি আপনার নিকট থেকে তা ক্রয় করে নিব। ব্যবসায়ী এই অঙ্গীকারের ভিত্তিতে অনেক ব্যয়ভার বহন করে সে জিনিস বিদেশ থেকে সংগ্রহ করে আনে, এখন অঙ্গীকারকারীকে উক্ত জিনিস ক্রয়ে অস্বীকার করার অনুমতি কিভাবে দেয়া যেতে পারে। কুরআন এবং হাদীসে এমন কোন বিধান নেই, যা এধরনের অঙ্গীকারকে অপরিহার্য সাব্যস্ত করার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হবে।

এসব কারণের ভিত্তিতে "মুজাম্মাউল ফিক্হিল ইসলামী জিদ্দাহ" ব্যবসায়িক লেনদেনে অঙ্গীকারকে নিম্ন বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করেছেন।

(১) এই অঙ্গীকার একতরফা হতে হবে।

(২) এই অঙ্গীকারের কারণে অপর ব্যক্তি (যার সাথে অঙ্গীকার করা হয়েছে) কোন দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে নিয়েছে।

(৩) অঙ্গীকার যদি কোন জিনিস ক্রয়-বিক্রয়ের হয়ে থাকে, তাহলে এটা জরুরী যে, নির্ধারিত সময়ে ইজাব-কবুলের মাধ্যমে কার্যত ক্রয়-বিক্রয়ে করতে হবে, শুধুমাত্র অঙ্গীকারকে ক্রয়-বিক্রয়ে মনে করা যাবে না।

(৪) যদি অঙ্গীকারকারী তার অঙ্গীকার পূরণ না করে, তাহলে আদালতের মাধ্যমে তাকে বাধ্য করা হবে যে, হয়ত উক্ত জিনিস ক্রয় করে স্বীয় অঙ্গীকার পূরণ করবে অথবা বিক্রেতার প্রকৃত ক্ষতিপূরণ আদায় করবে। এই ক্ষতিপূরণে বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃত মূলধনের যতটুকু লোকসান হয়েছে, শুধুমাত্র ততটুকু অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রত্যাশিত এবং সম্ভাব্য (Opportunity) মুনাফাকে (অন্যত্র বিনিয়োগের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বিনিয়োগ না করার কারণে যে সম্ভাব্য মুনাফা অর্জনের সুযোগ হারানো হয়) তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না।

এ জন্য গ্রাহকের অর্থায়নকারীর সাথে এই অঙ্গীকার করা জায়েয আছে যে, যখন অর্থায়নকারী সাপ্লাইকারী থেকে মাল সংগ্রহ করে নিবে তখন সে তা ক্রয় করে নিবে। এই অঙ্গীকার পূরণ করা তার উপর অপরিহার্য হবে এবং উপরোল্লেখিত পদ্ধতিতে আদালতের মাধ্যমেও তা পূরণ করানো যাবে। এটা শুধুমাত্র ক্রয়-বিক্রয়ের অঙ্গীকার হবে, তাকে প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয় মনে করা হবে না। প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয় তখন হবে যখন অর্থায়নকারী সংশ্লিষ্ট মাল সংগ্রহ করবে, যার জন্য ইজাব-কবুল জরুরী হবে।

(৪) মুরাবাহার মূল্যের বিপরীতে সিকিউরিটি

মুরাবাহা পদ্ধতিতে অর্থায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি আলোচনা এই যে, মুরাবাহার মূল্য পরবর্তীতে পরিশোধ করা হয়, এ জন্য স্বাভাবিক কথা হল বিক্রেতা (অর্থায়নকারী) সময়মত মূল্য পরিশোধ করার নিশ্চয়তা চাইবে। এই উদ্দেশ্যের জন্য সে তার গ্রাহক থেকে সিকিউরিটির দাবি করতে পারে। এই সিকিউরিটি বন্ধক কিংবা অন্য কোন পন্থায় সম্পদ আটকে রাখার অধিকার ইত্যাদির আকৃতিতে হতে পারে। এই সিকিউরিটি সম্পর্কে কয়েকটি মৌলিক বিধি-বিধান মনে রাখা জরুরী।

(১) সিকিউরিটি শুধুমাত্র ঐ ক্ষেত্রে দাবি করতে পারবে, যখন চুক্তির কারণে কোন ঋণ কিংবা দায়িত্ব অস্তিত্বে এসে যাবে। এমন ব্যক্তি থেকে কোন সিকিউরিটি দাবি করতে পারবে না, যার উপর এখন পর্যন্ত কোন ঋণ নেই কিংবা সে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। যেমন পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুরাবাহা পদ্ধতিতে অর্থায়ন বিভিন্ন চুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। যা বিভিন্ন ধাপে অস্তিত্বে আসে। প্রথম ধাপে গ্রাহকের উপর কোন ঋণ আসে না। ঋণ শুধুমাত্র ঐ সময় আসে যখন অর্থায়নকারী সংশ্লিষ্ট জিনিস তার কাছে বাকি মূল্যে বিক্রি করে। যার ফলে উভয়ের মাঝে ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। এজন্য মুরাবাহা চুক্তির সঠিক পদ্ধতি এই যে, অর্থায়নকারী তার গ্রাহক থেকে সিকিউরিটির দাবি তখন করতে পারবে যখন কার্যত ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সংঘটিত হবে এবং মূল্য পরিশোধ করা গ্রাহকের উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে। কেননা এই ধাপে

গ্রাহক ঋণগ্রহীতা হয়ে যায়। কিন্তু গ্রাহকের জন্য এই ধাপের পূর্বেই সিকিউরিটি প্রদান করা বৈধ। তবে এটা ঐ সময় হওয়া উচিত, যখন মুরাবাহার মূল্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে অর্থায়নকারী যদি সেই সিকিউরিটি অধিকার করে নেয়, তাহলে সিকিউরিটির জিনিস তার দায়ভারে (Risk) থাকবে। যার অর্থ এটা হবে যে, বন্ধকীর সম্পদ যদি কার্যত ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সংঘটিত হওয়ার পূর্বে ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে অর্থায়নকারী হয়ত গ্রাহককে বন্ধকী সম্পদের বাজারমূল্য পরিশোধ করবে এবং মুরাবাহা চুক্তি বাতিল করে দিবে। অথবা কাংক্ষিত জিনিস গ্রাহকের নিকট বিক্রি করবে কিন্তু তার মূল্য থেকে বন্ধকী সম্পদের বাজার মূল্যের সমপরিমাণ কমিয়ে দিবে।

(২) বিক্রিত জিনিসই বিক্রেতাকে গ্যারান্টি (সিকিউরিটি) হিসেবে দিয়ে দেওয়াও বৈধ আছে । কোন কোন আলিমের মতামত এই যে, এমনটি করা শুধুমাত্র ঐ সময় জায়েয হবে যখন ক্রেতা একবার সেই ক্রয়কৃত জিনিস কব্জা করে নিবে। যার অর্থ এই যে, ক্রেতা প্রথমে সেই জিনিস প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কব্জা করবে, অতঃপর সে বিক্রেতাকে বন্ধক হিসেবে প্রদান করবে। যাতে করে বন্ধকীর চুক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যায়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিষয় অধ্যয়নের পর একথা বলা যেতে পারে যে, পূর্ববর্তী ফিক্হবিদগণ প্রথমে কব্জা করে অতঃপর বন্ধক হিসেবে দেওয়ার শর্ত নগদ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আরোপ করেছেন বাকি বিক্রির ক্ষেত্রে নয়[১]। সুতরাং ক্রয়কৃত জিনিস বন্ধক হিসেবে প্রদানের পূর্বে গ্রাহকের প্রথমে তাতে নিজের কব্জা করা জরুরী নয়। তবে শর্ত হল, এ কথা নির্দিষ্ট করে নিতে হবে যে, এই পণ্য কখন থেকে বন্ধকী হিসেবে ধর্তব্য হবে। কেননা, এই বিশেষ নির্দিষ্ট সময়ের পর থেকেই এই পণ্য বিক্রেতার কব্জায় বন্ধকী হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে। এজন্য এ সময়টি সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ পহেলা জানুয়ারী "ক" "খ"

---

১. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমার আরবী কিতাব "بحوث في قضايا فقهية معاصرة" গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

এর নিকট একটি গাড়ি পাঁচ লাখ টাকায় বিক্রি করল, মূল্য পরিশোধ করা হবে ত্রিশে জুন, মূল্য সময়মত পরিশোধকল্পে "ক" "খ" এর কাছ থেকে সিকিউরিটি দাবি করল, "খ" এখনো গাড়িটি কব্জা করেনি, সে "ক" এর নিকট প্রস্তাব করল যে, ২রা জানুয়ারী থেকে সেই গাড়িটিই যেন তার কাছে বন্ধক হিসেবে রেখে দেয়। যদি এই গাড়িটি ২রা জানুয়ারীর পূর্বে ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং "খ"-এর কোন রকম ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব বহন করতে হবে না। কিন্তু গাড়িটি যদি ২রা জানুয়ারীর পরে ধ্বংস হয়, তাহলে ক্রয়–বিক্রয়ের চুক্তি বাতিল হবে না। তবে এখানে বন্ধকী সম্পদ ধ্বংস হওয়ার ক্ষেত্রে যে মূলনীতি নির্ধারিত আছে তা প্রযোজ্য হবে। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী সেই পণ্যের বাজারদর এবং উভয়ের মাঝে সাব্যস্তকৃত মূল্যের মাঝে যেটা কম হবে বিক্রেতা ততটুকু পরিমাণ গাড়ির ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব বহন করবে। সুতরাং যদি গাড়ির বাজারমূল্য সাড়ে চার লাখ টাকা হয় (পক্ষান্তরে সাব্যস্তকৃত মূল্য পাঁচ লাখ টাকা ছিল) তাহলে বিক্রেতা ক্রেতা থেকে শুধুমাত্র অবশিষ্ট মূল্যের দাবি করতে পারবে। অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার টাকা। (সাড়ে চার লাখ টাকা বিক্রেতার ক্ষতি মনে করা হবে)। আর যদি গাড়ির বাজারমূল্য পাঁচ লাখ টাকা হয় বা তার চেয়ে বেশি হয়, তাহলে বিক্রেতা ক্রেতা থেকে কোন কিছুর দাবি করতে পারবে না।[১]

এটা ছিল ফিক্‌হে হানাফীর দৃষ্টিভঙ্গী। শাফেয়ী এবং হাম্বলী ফিক্‌হবিদদের মাযহাব হল গাড়ি যদি বন্ধকগ্রহীতার (যার কাছে বন্ধক

---

[1] ১. যদি বাজারমূল্য সাব্যস্তকৃত মূল্যের সমান সমান হয়, অর্থাৎ উভয়টি পাঁচ লাখ টাকা, তাহলেও বিক্রেতা ক্রেতা থেকে কোন কিছুর দাবি করতে পারবে না, যেহেতু বিক্রেতা পাঁচ লাখ টাকারই দায়ি ছিল। আর যদি বাজারমূল্য সাব্যস্তকৃত মূল্যে চেয়ে বেশি হয়, যেমন বাজারমূল্য ছয় লাখ টাকা, তাহলে বিক্রেতা তো পাঁচ লাখ টাকার দায়ি হবে, সুতরাং পাঁচ লাখ টাকা যা সে ক্রেতা থেকে পাওনাদার ছিল তা শেষ হয়ে যাবে এবং অতিরিক্ত এক লাখ টাকার সম্পদ তার কাছে আমানত হিসেবে ছিল। যদি কোনরূপ অবাঞ্চিত হস্তক্ষেপ ব্যতীত গাড়িটি ধ্বংস হয়, তাহলে সে তার দায়ি হবে না, সুতরাং ক্রেতাও তার কাছ থেকে এক লাখ টাকার দাবি করতে পারবে না। তবে যদি অবাঞ্চিত হস্তক্ষেপ প্রমাণিত হয়ে যায়, তাহলে সে তার দাবি করতে পারবে।

রাখা হয়, এখানে বিক্রেতা) উদাসীনতার কারণে ধ্বংস হয়, তাহলে সে তার বাজার মূল্য সমপরিমাণ ক্ষতি পূরণের দায়িত্ব বহন করবে। কিন্তু গাড়ি ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে তার যদি কোনরূপ হস্তক্ষেপ না থাকে, তাহলে সে কোন কিছুর দায়িত্ব বহন করবে না। এই ক্ষতি ক্রেতা বহন করবে এবং বিক্রেতাকে পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে।[১]

উপরোল্লেখিত উদাহরণ দ্বারা এ কথা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, "ক"-এর গাড়িতে বিক্রেতা হিসেবে কব্জার উপর যে আহকাম প্রযোজ্য হবে তা বন্ধকগ্রহীতা হিসেবে কব্জার উপর প্রযোজ্য আহকাম থেকে ভিন্ন হবে। এজন্য জরুরী হল, সেই সময়কে উত্তমভাবে নির্ধারণ করে নেয়া যখন থেকে গাড়িটি তার কাছে বন্ধকগ্রহীতা হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে। অন্যথায় বিভিন্ন দিক তালগোল পাঠিয়ে যাবে এবং কলহ-কোন্দল সৃষ্টিরও সম্ভাবনা থাকবে, যার ফলে এই সিকিউরিটি সঠিক থাকবে না।

(৫) মুরাবাহায় জামানত

মুরাবাহা পদ্ধতির অর্থায়নে বিক্রেতা ক্রেতার (গ্রাহক) কাছে তৃতীয় কোন পার্টিকে জামিন হিসেবে প্রদানের দাবিও করতে পারবে। ক্রেতা যদি সময়মত মূল্য পরিশোধ না করে, তাহলে বিক্রেতা জামিনদার ব্যক্তির নিকট মূল্য পরিশোধের দাবি করবে। যার দায়িত্ব হবে ঐ অর্থ পরিশোধ করে দেওয়া, যার সে জামিনদার হয়েছে। জামানতের শরয়ী আহকামের উপর ফিক্‌হের গ্রন্থাবলীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তদুপরি আমি ইসলামী ব্যাংকিং-এর সাথে সম্পৃক্ত দু'টি মাসআলার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করাতে চাই।

বর্তমান ব্যবসায়িক পরিবেশে জামিনদার ব্যক্তি সাধারণত আসল ঋণগ্রহীতা থেকে ফিস নেয়া ব্যতীত কোনদায় পরিশোধের জামানত প্রদান করে না। পূর্ববর্তী ফকীহগণ এব্যাপারে প্রায় একমত যে, জামানত একটি স্বেচ্ছায় দায়িত্ব গ্রহণের চুক্তি। যার উপর কোন ফিস নেয়া যায় না। বেশির

---

১. ইবন কুদামা, আল-মুগনী, ৫/৪৪২, আল-গাযালী, আল-ওয়াসীত, ৩/৫০৯, ইবন আবেদীন, রাদ্দুল মুখতার, ৫/৩৪১

চেয়ে বেশি জামিন ব্যক্তি ঐ সকল প্রকৃত অফিসিয়াল ব্যয়ের দাবি করতে পারে। যা তাকে জামানত প্রদানের কাজে বহন করতে হয়েছে। ফিস নাজায়েয হওয়ার কারণ হল, যে ব্যক্তি কাউকে ঋণ প্রদান করেছে, সে ব্যক্তি ঋণের বিনিময়ে কোন ফিস গ্রহণ করতে পারে না। কেননা, এই ফিস রিবা এবং সুদের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। যা নিষিদ্ধ এবং নাজায়েয। জামানত প্রদানকারী এই নিষিদ্ধতায় আরো উত্তমভাবে অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, সে তো ঋণ হিসেবে অর্থ প্রদান করে না, বরং সে তো আসল ঋণগ্রহীতার পক্ষ থেকে সময়মত ঋণ পরিশোধ না হওয়ার ক্ষেত্রে তার স্থলে নির্দিষ্ট অর্থ আদায় করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। যদি প্রকৃত অর্থ প্রদানকারী কোন ফিস উসূল করতে না পারে, তাহলে যে ব্যক্তি শুধুমাত্র পরিশোধের অঙ্গীকার করে, কার্যত কোন কিছু আদায় করে না, সে ব্যক্তি কিভাবে ফিস গ্রহণ করতে পারে।

মনে করুন- যায়েদ আমর থেকে একশ' ডলার ঋণ গ্রহণ করেছে। আমর যায়েদ থেকে জামিন প্রদানের দাবি করছে, বকর যায়েদকে বলল, আমি তোমার ঋণ আমরকে এখনি আদায় করে দিচ্ছি, কিন্তু তুমি পরবর্তী কোন তারিখে আমাকে একশ' দশ ডলার আদায় করবে এটা সুস্পষ্ট যে, যায়েদ থেকে অতিরিক্ত যে দশ ডলার নেয়া হচ্ছে, তা সুদ হওয়ার কারণে নাজায়েয। এখন খালেদ যায়েদের কাছে এসে বলল, আমি তোমার পক্ষ থেকে জামিন হচ্ছি, কিন্তু তুমি আমাকে এই কাজের জন্য দশ ডলার দিবে। আমরা যদি জামানতের ফিসকে জায়েয় বলি, তাহলে এর অর্থ হবে, বকর বাস্তবিক পক্ষে এত অর্থ আদায় করা সত্ত্বেও দশ ডলার নিতে পারে না, কিন্তু খালেদ বাস্তবিক পক্ষে কোন কিছু আদায় করেনি, কেবল যায়েদের সময়মত অনাদায়ের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আদায়ের অঙ্গীকার করেছে, সে দশ ডলার নিতে পারে। যেহেতু এই পদ্ধতি বাহ্যিকভাবে ন্যায় সঙ্গত নয়, এজন্য পূর্ববর্তী ফকীহগণ জামানতের উপর ফিস গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করেছেন, যাতে করে উল্লেখিত উদাহরণে বকর এবং খালেদের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়।

তবে সমকালীন কোন কোন ফকীহগ মাসআলাটিকে কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাদের মত হল, বর্তমানে জামানত একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরিণত হয়ে গিয়েছে। বিশেষত আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে। যেখানে বিক্রেতা এবং ক্রেতার মাঝে একে অপরের সাথে কোন পরিচিতি থাকে না এবং মাল পাওয়ার সাথে সাথেই ক্রেতার পক্ষ থেকে মূল্য পরিশোধও সম্ভব হয় না। এজন্য এমন একটি মাধ্যমের প্রয়োজন হয়, যিনি মূল্য পরিশোধের জামানত প্রদান করবে। কোন বিনিময় ব্যতীত কাংক্ষিত সংখ্যক জামানত প্রদানকারী পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। এসব বাস্তবতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বর্তমান যুগের কোন কোন আলিম ভিন্ন একটি চিন্তা-চিন্তার কথা বলেন। তারা বলেন যে, জামানতের উপর ফিস/ নেওয়ার নিষিদ্ধতা কুরআন এবং হাদীসের সুস্পষ্ট কোন হিদায়াতের উপর নির্ভরশীল নয়। বরং এটা সুদের নিষিদ্ধতার হুকুম থেকে উদ্ভাবন করা হয়েছে। কেননা এটা তার একটি আনুষঙ্গিক বিষয়। অধিকন্তু অতীতকালে জামানত সাধাসিধা ধরনের হত, বর্তমান যুগে জামিন ব্যক্তির অনেক অফিসিয়াল কাজ আঞ্জাম দিতে হয় এবং বিভিন্ন বিষয় যাচাই-বাছাই করতে হয়। এজন্য তাদের দৃষ্টিভঙ্গী হল, জামানতের উপর ফিসের নিষিদ্ধতার ব্যাপারেও এই দৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্বার গবেষণা করা প্রয়োজন। এ সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে আরে গবেষনার প্রয়োজন এবং এ বিষয়টিকে উচ্চ পর্যায়ের অভিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের আন্তর্জাতিক ফোরামে গবেষণার জন্য উত্থাপন করা উচিত। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত এ ধরনের কোন ফোরাম থেকে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত না আসবে, ততদিন পর্যন্ত ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে জামানতের বিনিময়ে কিছু ফিস দেয়া উচিত কিন্তু নেয়া উচিত নয়। তবে জামানত প্রদানের কাজে বাস্তবিক পক্ষে যে ব্যয় হয়, তা পূরণের জন্য বিনিময় দেয়াও যাবে এবং নেয়াও যাবে।

(৬) অনাদায়ের কারণে জরিমানা

মুরাবাহা পদ্ধতির অর্থায়নে আরেকটি জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। তাহল গ্রাহক যদি মূল্য সময়মত পরিশোধ না করে, তাহলে মূল্যে অতিরিক্ত কিছু সংযোজন করা যায় না। সুদভিত্তিক ঋণে অনাদায়ের সময়

অনুযায়ী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু মুরাবাহা পদ্ধতির অর্থায়নে মূল্য একবার নির্ধারণের পর তাতে আর অতিরিক্ত কিছু সংযোজন করা যায় না। যে সকল বদদ্বীন গ্রাহক জেনে শুনে সময়মত মূল্য পরিশোধ করা থেকে অনীহা প্রকাশ করে তারা এই পাবন্দীকে কোন কোন সময় অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে। কেননা তারা জানে যে, সময়মত মূল্য পরিশোধ না করার কারণে তাদের অতিরিক্ত অর্থ দিতে হবে না।

মুরাবাহার এই বৈশিষ্ট্যের কারণে সেসব দেশে তেমন কোন জটিলতা সৃষ্টি করতে পারবে না, যেসব দেশের সকল ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হয়। কেননা এ ক্ষেত্রে প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক এমন নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারবে, যে নীতিমালা অনুযায়ী সময়মত মূল্য পরিশোধ না করার কারণে তাদেরকে এই শাস্তি দেয়া যাবে যে, সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানই যে কোন ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে দিবে। এই নীতিমালা স্বেচ্ছায় সময়মত মূল্য পরিশোধ না করার বিরুদ্ধে একটি কার্যকর প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু যেসব দেশে ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সুদভিত্তিক অধিকাংশ ব্যবসায়িকও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে পৃথক হয়ে কাজ করছে, সেখানে এমন নীতিমালা কার্যকর করা জটিল হয়ে দাঁড়াবে। কেননা, গ্রাহককে যদি কোন ইসলামী ব্যাংক থেকে কোন ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা থেকে বঞ্চিত করেও দেয়া হয়, তাহলে সে প্রচলিত ব্যাংকসমূহের শরণাপন্ন হবে।

এই সমস্যার সমাধানের জন্য বর্তমান যুগের কোন কোন আলিম এই প্রস্তাব পেশ করেন, যে গ্রাহক জেনে শুনে স্বেচ্ছায় মূল্য পরিশোধে বিলম্ব করে তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করা হবে যে, তার মূল্য পরিশোধ না করার কারণে ইসলামী ব্যাংকের যে পরিমাণ লোকসান হবে তার বিনিময় আদায় করতে হবে। এসব আলিমগণ মনে করেন যে, এই বিনিময় সেই মুনাফার সমপরিমাণও হতে পারে যা এই সময়ে ব্যাংক তার আমানতকারীগণকে প্রদান করেছে। যেমন ঋণ খেলাফী ব্যাক্তি নির্ধারিত সময় থেকে তিন মাস বিলম্ব করে মূল্য পরিশোধ করেছে, এই তিন মাসে ব্যাংক যদি তার আমানতকারীদের পাঁচ পার্সেন্ট হিসেবে মুনাফা প্রদান করে থাকে, তাহলে

এই ঋণ খেলাফী ব্যক্তিও মূল ঋণের অতিরিক্ত পাঁচ পার্সেন্ট ব্যাংকের লোকসান হিসেবে বিনিময় প্রদান করতে হবে। তবে যেসব আলিম এই বিনিময়কে জায়েয বলেন, তাঁরা তাকে নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে জায়েয বলেন-

(১) পরিশোধের সময় আসার পর ঋণ খেলাফীকে কমপক্ষে অতিরিক্ত আরো এক মাসের সুযোগ প্রদান করতে হবে। যার মাঝে তার কাছে প্রতি সপ্তাহে নোটিশ পাঠাতে হবে, যে নোটিশে তাকে এই হুঁশিয়ারি দেয়া হবে, সে যেন মূল্য পরিশোধ করে অন্যথায় তাকে লোকসানের বিনিময় পরিশোধ করতে হবে।

(২) নিঃসন্দেহে মূল্য পরিশোধে বিলম্ব এবং টালবাহানা যুক্তিসঙ্গত কোন ওজর-আপত্তি ব্যতীত করতে হবে। যদি একথা স্পষ্ট হয় যে, সে ব্যক্তি দারিদ্রতার কারণে বিলম্ব করছে, তাহলে তার কাছ থেকে কোন বিনিময় নেয়া যাবে না। বস্তুত যতদিন পর্যন্ত সে পরিশোধে সক্ষম না হবে, ততদিন পর্যন্ত তাকে সুযোগ প্রদান করা জরুরী। কেননা, কুরআনে কারীম সুস্পষ্টভাবে ইরশাদ করছে ঃ

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ

"সে (ঋণী ব্যক্তি) যদি একান্ত অভাবী হয়, তাহলে তাকে স্বাচ্ছন্দ ফিরে পাওয়া পর্যন্ত অবকাশ দিতে হবে" (সূরা বাকারা, আয়াত নং-২৮০)

(৩) এই আর্থিক ক্ষতিপূরন শুধুমাত্র সে সময় জায়েয, যখন ইসলামী ব্যাংকের পুঁজি বিনিয়োগ একাউন্টে কিছু মুনাফা অর্জিত হবে, যা আমানতকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে। যদি পুঁজি বিনিয়োগ একাউন্টে এ সময়ে কোন মুনাফা অর্জিত না হয়, তাহলে গ্রাহক থেকেও কোন রকম বিনিময় গ্রহণ করতে পারবে না।

বর্তমান যুগের অধিকাংশ আলিম বিনিময়ের এই পদ্ধতিকে সমর্থন করেননি। (লেখকের মতামতও তাই) তাদের চিন্তা-চেতনা হল, এই প্রস্তাব শরীয়তের নীতিমালার সাথেও সামঞ্জস্যতা রাখে না এবং ঋণখেলাফীর সমস্যাকেও সমাধান করার যোগ্যতা রাখে না।

সর্ব প্রথম কথা হল, ঋণগ্রহীতা থেকে অতিরিক্ত যে কোন অর্থ নেয়া হবে তা সুদ হবে। জাহেলী যুগে ঋণগ্রহীতা যখন নির্দিষ্ট তারিখে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হত, তখন ঋণদাতা তার থেকে সাধারণত অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করত। এ ক্ষেত্রে সাধারণত এরূপ বলা হত-

إما أن تقضي وإما أن تربي

"হয়ত এখনি ঋণ পরিশোধ করতে হবে, অন্যথায় ঋণে সংযোজন করা হবে।" বিনিময় আদায়ের উল্লেখিত প্রস্তাব এই দৃষ্টিভঙ্গীরই সাদৃশ্য।

এ প্রসংগে একথা বলা যেতে পারে যে, উল্লেখিত প্রস্তাব জাহেলী যুগের ঐ নিয়ম-নীতি থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন। কেননা, ক্ষতিপূরন গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ঋণগ্রহীতাকে অতিরিক্ত এক মাসের সুযোগ প্রদান করা হয়। যাতে করে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, সে কোন যুক্তিসঙ্গত ওজর ব্যতীত পরিশোধে অনীহা প্রকাশ করছে এবং যাতে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, পরিশোধ না করার কারণ দারিদ্রতা অথবা অন্য কোন জটিলতা, সেক্ষেত্রে তার থেকে ক্ষতিপূরন গ্রহণ করবে না। কিন্তু এই ধারণাকে কার্যকর করার সময় সেসব শর্ত পূর্ণ করা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। কেননা সকল ঋণগ্রহীতাই এই দাবি করবে যে, তার পক্ষ থেকে সময়মত পরিশোধ না করার কারণ তার আর্থিক অক্ষমতা। কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রত্যেক গ্রাহকের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে যাচাই-বাছাই করা এবং এ কথার সত্যায়ন করা যে, পরিশোধ করার ব্যাপারে সে অক্ষম কি না, তা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। সাধারণত ব্যাংক এটাই মনে করে যে, প্রত্যেক গ্রাহকই পরিশোধে সক্ষম। কিন্তু তাকে যদি দেউলিয়া ঘোষণা করে দেয়া হয়, (তাহলে তাকে অক্ষম মনে করা হবে) যার অর্থ হল, উল্লেখিতি প্রস্তাবে যে সুযোগ এবং অবকাশ দেয়া হয়েছে, তার থেকে শুধুমাত্র দেউলিয়া লোকেরাই উপকৃত হবে এটা সুস্পষ্ট যে, দেউলিয়ার বিদ্যমানতা অত্যন্ত বিরল এবং দুর্লভ। এমন বিরল ঘটনায় সাধারণ সুদি ব্যাংকও ঋণগ্রহীতা থেকে সুদ গ্রহণ করে না। এ কারণে এই প্রস্তাব অনুযায়ী সুদী অর্থায়ন এবং ইসলামী অর্থায়নের মাঝে কোন প্রায়োগিক এবং উদ্দেশ্যগত পার্থক্য বিদ্যমান থাকে না।

অতিরিক্ত সময়ের যে বিষয়টি তা তো সাধারণ সুযোগ, যা কোন কোন সময় আধুনিক ব্যাংক-এর পক্ষ থেকেও দেয়া হয়। পুনরায় একই কথা যে, সুদ এবং বিলম্বে পরিশোধের উপর আর্থিক ক্ষতিপূরন গ্রহণ করার মাঝে বাস্তবিক পক্ষে কোন পার্থক্য নেই।

ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করার ব্যাপারে কোন কোন সময় এই যুক্তি প্রদান করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তির ভর্ৎসনা করেছেন, যে ব্যক্তি কোন ওজর ব্যতীত আর্থিক দায়িত্ব পরিশোধে বিলম্ব করে। একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

لي الواجد يحل عقوبته وعرضه

"আর্থিকভাবে স্বচ্ছল যে ব্যক্তি তার ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করে, সে শাস্তি এবং ভর্ৎসনা পাওয়ার উপযুক্ত হয়।"[১]

এর দ্বারা এভাবে প্রমান পেশ করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন এবং শাস্তি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যার মধ্যে আর্থিক জরিমানাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু এ প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে এ বিষয়টিকে দৃষ্টির আড়ালে রাখা হয়েছে যে, যদি এ কথা মেনেও নেয়া হয় আর্থিক জরিমানা আরোপ করা জায়েয[২], তারপরও তা আদালতের মাধ্যমে আরোপ করা হয় এবং সাধারণত প্রশাসনের নিকট তা পরিশোধ করা হয়। এমনটি কারো নিকটই বৈধ নয় যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত আদালতের কোন সিদ্ধান্ত ব্যতীত নিজেই নিজের স্বার্থের জন্য জরিমানা আরোপ করে দিবে।

---

১. ফাতহুল বারী, ৫/৬২।
২. অধিকাংশ পূর্ববর্তী ফিক্‌হবিদ আদালতের মাধ্যমেও আর্থিক জরিমানাকে জায়েয বলেননি। কিন্তু কোন কোন পূর্ববর্তী ফিক্‌হবিদ যেমন ইমাম আহমাদ এবং ইমাম আবূ ইউসূফ তা জায়েয বলেছেন, অধিকাংশ সমকালীন আলিম এই দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

অধিকন্তু এটাকে যদি একটি শাস্তিই মেনে নেয়া হয়, তাহলে তা পুঁজি বিনিয়োগ একাউন্টে কোন মুনাফা না হওয়ার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ হওয়া উচিত। কেননা পরিশোধ না করার অপরাধ তো পাওয়া গিয়েছে এবং এর সাথে ব্যাংকের পুঁজি বিনিয়োগ একাউন্টে কোন মুনাফা হওয়া বা না হওয়ার সাথে কোন সম্পর্ক নেই।

মূলত ব্যাংকের মুনাফার সমপরিমাণ ক্ষতিপুরণ করা অর্থের (money) প্রত্যাশিত মুনাফার[১] (Opportunity cost) ধারণার উপর নির্ভরশীল। এই ধারণা শরীয়তের নীতিমালার সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। ইসলাম সম্ভাব্য মুনাফার এই ধারণাকে সমর্থন করে না। কেননা অর্থনীতি থেকে সুদের পরিসমাপ্তির পর অর্থের (money) কোন নির্দিষ্ট মুনাফা অবশিষ্ট থাকে না। এতে যেখানে মুনাফা অর্জনের সুযোগ রয়েছে সেখানে লোকসানের আশংকাও রয়েছে। লোকসানের এই ঝুঁকিই তাকে মুনাফা অর্জনে সক্ষম করে তোলে।

এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, লক্ষণীয় সূক্ষ্ম ও আরেকটি বিষয় হল, যে ব্যক্তি ঋণ খেলাফীর অপরাধে অভিযুক্ত হয়, তাকে বেশির চেয়ে বেশি একজন চোর কিংবা আত্মসাৎকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। চুরি এবং আত্মসাৎকারী সম্পর্কে শরীয়তের বিধি-বিধান অধ্যয়ন করা দ্বারা বুঝা যায় যে, চোর একটি বড় শাস্তি অর্থাৎ হাত কর্তনের উপযুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু তার কাছে কখনো এই দাবি করা যাবে না, সে যেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কোন রকম ক্ষতিপুরণ পরিশোধ করে দেয়। এমনিভাবে কেউ যদি কোন ব্যক্তির অর্থ আত্মসাৎ করে নেয়, তাহলে তাকে তা'যীর হিসেবে শাস্তি তো দেয়া যাবে, কিন্তু কোন ফকীহ মালিককে ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদানের জন্য তার উপর মূল অর্থ থেকে অতিরিক্ত আর্থিক কোন জরিমানা ধার্য করেননি।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মাযহাব হল, যদি কোন ব্যক্তি অন্যের যমিন আত্মসাৎ করে হস্তগত করে নেয়, তাহলে তাকে বাজারমূল্য অনুযায়ী সেই

---

১. অন্যত্র বিনিয়োগের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা না করার কারণে যে সম্ভাব্য মুনাফা হারানো হয়

যমিনের ভাড়া প্রদান করতে হবে, কিন্তু সে যদি নগদ অর্থ আত্মসাৎ করে, তাহলে সে ঐ পরিমাণ অর্থই ফেরৎ দিবে, যে পরিমাণ অর্থ সে আত্মসাৎ করেছে, তার চেয়ে অতিরিক্ত নয়।[১]

এসব আহকাম থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, অর্থের (money) প্রত্যাশিত মুনাফা (Opportunity Cost) কে শরীয়ত সমর্থন করেনি। কেননা, পূর্বে বিবৃত হয়েছে যে, মুদ্রার উপর নির্দিষ্ট মুনাফা নেয়া যায় না এবং তার কোন নিজস্ব ভ্যালুও নেই।

উপরে বর্ণিত কারণসমূহের ভিত্তিতে বর্তমান যুগের অধিকাংশ আলিমগণ ঋণ খেলাফী ব্যক্তি থেকে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করার দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন করেননি। ইসলামী ফিক্‌হ একাডেমী জিদ্দাহ-এর বার্ষিক সেমিনারেও এই প্রশ্নের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা-গবেষণা হয়েছে এবং সেখানেও এই সিদ্ধান্তই নেয়া হয়েছে যে, এ ধরণের বিনিময় গ্রহণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়।[২]

এ যাবৎ আর্থিক ক্ষতিপুরণ (জরিমানা) সম্পর্কে শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধতা এবং অবৈধতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, এই প্রস্তাব দ্বারা ঋণ খেলাফীর সমস্যা একেবারে নিরসন হবে না। বরং এর দ্বারা ঋণগ্রহীতা ঋণ অনাদায়ের প্রতি আরো উৎসাহিত হবে। তার কারণ হল, এই প্রস্তাব অনুযায়ী ঋণ খেলাফীকে যে পরিমান বিনিময় পরিশোধের জন্য বলা হবে, তা সেই মুনাফার সমতুল্য হবে যা পরিশোধ না করাকালীন সময়ে আমানতকারীদের অর্জিত হয়েছে। আর একথা সুস্পষ্ট যে, আমানতকারীদের অর্জিত মুনাফা ঐ মুনাফার হার থেকে সর্বদা কম হয় যা মুরাবাহার চুক্তিতে গ্রাহককে পরিশোধ করতে হয়। এ কারণে এই গ্রাহক যে পরিমাণ মুনাফা ঋণ খেলাফী হওয়ার পূর্বে দিয়েছিল, ঋণ খেলাফী হওয়ার পর তার চেয়ে অনেক কম দিতে হবে। সুতরাং সে জেনে শুনে এই ক্ষতিপুরন (বিনিময়) আদায় করার প্রক্রিয়াকে

১. আস-সিরাজী, আল-মুহায্‌যাব, ১/৩৭০।
২. সিদ্ধান্ত নং- ৫৩, পঞ্চম বার্ষিক সেমিনার, পত্রিকা নং- ৬, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা নং- ৪৪৭।

গ্রহণ করবে এবং মূল ঋণ পরিশোধ করবে না। বরং তা কোন অধিক লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করবে। মনে করুন,! ছয় মাসের একটি মুরাবাহা চুক্তিতে বর্ষিক পনের পার্সেন্ট হিসেবে মুনাফা সিদ্ধান্ত হয়েছে, আর আমানতকারীদেরকে যে মুনাফা দেয়া হয়েছে তা হল বার্ষিক দশ পার্সেন্ট। এর অর্থ হল, পরিশোধের তারিখের পরও যদি গ্রাহক অতিরিক্ত ছয় মাসের জন্য এই মূল অর্থ তার কাছে রেখে দেয় এবং আদায় না করে, তাহলে তাকে বার্ষিক দশ পার্সেন্ট হিসেবে বিনিময় প্রদান করতে হবে। যা আসল মুরাবাহার মুনাফার হারের অর্থাৎ পনের পার্সেন্ট থেকে অনেক কম। এমতাবস্থায় সে মূল অর্থ পরিশোধ করবে না এবং অতিরিক্ত আরো ছয় মাসের জন্য স্বল্প মুনাফার হারের ভিত্তিতে এই সুযোগ গ্রহণ করবে।

বিকল্প প্রস্তাব

এখন প্রশ্ন হল, একটি ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই সমস্যার সমাধান কিভাবে করবে। যদি ঋণ খেলাফী ব্যক্তি থেকে কোন কিছু গ্রহণ না করা হয়, তাহলে এর দ্বারা বদদীন ব্যক্তিরা সর্বদা ঋণ পরিশোধ না করার প্রতি আরো উৎসাহী থাকবে। তাই এই প্রশ্নের উত্তরও রয়েছে-

আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, এই মাসআলার প্রকৃত সমাধান হল, এমন নীতিমালা প্রণয়ন করা, যার দ্বারা ঋণ খেলাফী ব্যক্তিকে এই শাস্তি দেয়া যায় যে, ভবিষ্যতে সে সকল আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। যেমন, পূর্বে বিবৃত হয়েছে যে, এমনটি শুধুমাত্র সেখানেই হতে পারে যেখানে সকল ব্যাংকিং পদ্ধতি ইসলামী শিক্ষার আলোকে পরিচালিত হয়, অথবা ইসলামী ব্যাংকসমূহকে ঋণ খেলাফী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে। এজন্য যতদিন পর্যন্ত এই পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের আরেকটি বিকল্প পদ্ধতির প্রয়োজন।

এই উদ্দেশ্যের জন্য এই প্রস্তাব করা হয়েছে যে, মুরাবাহা চুক্তিতে অন্তর্ভুক্তির সময় গ্রাহক এই দায়িত্ব গ্রহণ করবে যে, সময়মত পরিশোধ না করার ক্ষেত্রে সে ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি জনকল্যাণমূলক ফান্ডে একটি নির্দিষ্ট অংকের অর্থ প্রদান করবে। এ প্রসংগে এই নিশ্চয়তা

প্রদান করা অপরিহার্য যে, এই অর্থের কোন একটি অংশ ও ব্যাংকের আয়ের অংশ হবে না। ব্যাংক এ উদ্দেশ্যে একটি জনকল্যাণমূলক ফান্ড গঠন করবে এবং এই ফান্ডে অর্জিত অর্থ শরীয়ত অনুযায়ী একমাত্র জনকল্যাণমূলক কাজেই ব্যয় করবে। ব্যাংক এই কল্যাণ ফান্ড থেকে উপযুক্ত ব্যক্তিদের বিনা সুদে ঋণও প্রদান করতে পারে।

এই প্রবস্তাবটি কোন কোন মালেকী ফকীহ্র বর্ণনাকৃত একটি ফিক্হী বিধানের উপর নির্ভরশীল। কোন কোন মালেকী ফকীহ্ বলেন, যদি ঋণগ্রহীতা থেকে এই দাবি করা হয় যে, সে সময়মত পরিশোধ না করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করবে, তাহলে এই পদ্ধতি শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয হবে, কেননা এটা সুদের সাদৃশ্য। কিন্তু ঋণদাতাকে সময়মত ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য ঋণগ্রহীতা এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে- সে সময়মত পরিশোধ না করার ক্ষেত্রে কিছু অর্থ দান হিসেবে প্রদান করবে, এটা মূলত এক ধরনের (ছলফ) কসম, যা কোন ব্যক্তির স্বয়ং নিজের পক্ষ থেকে নিজ স্কন্ধে আরোপিত একটি শাস্তি, যাতে সে নিজেকে ঋণ খেলাফী হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে। সাধারণ অবস্থায় এই ধরনের কসম দ্বারা চারিত্রিক এবং ধর্মীয় দায়িত্ব অর্পিত হয়। আদালতের মাধ্যমে এর উপর আমল করানো যায় না। কিন্তু কোন কোন মালেকী ফকীহ্ নিকট তাকে বিচারের দৃষ্টিতেও অপরিহার্য বলা যায়[১] এবং কুরআন ও হাদীসে এমন কোন কথা নেই যা এধরনের কসমকে আদালতের মাধ্যমে প্রয়োগ করার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হবে সুতরাং যেখানে বাস্তবিক পক্ষে প্রয়োজন হবে, সেখানে এই দৃষ্টিভঙ্গীর উপর আমল করা যেতে পারে। কিন্তু এই প্রস্তাবের উপর আমল করতে হলে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো স্মরণ রাখা অপরিহার্য।

(১) এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ঋণগ্রহীতার উপর চাপ সৃষ্টি করা, যাতে করে সে তার দায়িত্ব আদায় করে। এর উদ্দেশ্য ঋণদাতা/অর্থায়নকারীর আয়-উপার্জনে প্রবৃদ্ধি ঘটানো কিংবা তার থেকে প্রত্যাশিত মুনাফার (Opportunity Cost) ক্ষতিপূরন আদায় করা নয়।

---

১. تحرير الكلام في مسائل الالتزام، الحطاب পৃষ্ঠা নং-১৭৬, বৈরুত, ১৪০৪ হিঃ।

এজন্য এ কথা নিশ্চিত করতে হবে যে, কোন অবস্থাতেই এই জরিমানার কোন একটি অংশ ও ব্যাংকের আয়ের অংশ হবে না, এর দ্বারা ট্যাক্সও আদায় করা যাবে না এবং এগুলোকে অর্থায়নকারীর কোন দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যও ব্যবহার করা যাবে না।

(২) ব্যাংক তার আয় হিসেবে যেহেতু জরিমানার এই টাকার মালিক হয় না, বরং তা জনকল্যাণমূলক কাজের উদ্দেশ্যে ব্যবহার হবে, সেজন্য এটাকার পরিমান এমন হতে পারে যে পরিমান ঋণগ্রহীতা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে। তা বার্ষিক পার্সেন্টিস হিসেবেও নির্ধারিত হতে পারে, এজন্য এই অর্থ স্বেচ্ছায় সময়মত ঋন পরিশোধ না করার বিরুদ্ধে প্রকৃত নিরাপত্তার কাজে আসবে। পক্ষান্তরে পূর্ব বর্ণিত আর্থিক ক্ষতিপূরনের প্রস্তাব যেমন পূর্বে বিবৃত হয়েছে যে, তা সময়মত ঋন পরিশোধ না করার ব্যাপারে আরো উৎসাহী করে।

(৩) এই জরিমানা যেহেতু মূলত গ্রাহকের নিজের পক্ষ হতে নিজের উপর আরোপিত একটি কসম, এমন জরিমানা নয় যা অর্থায়নকারীর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, এজন্য চুক্তিতে এই চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন হওয়া উচিত। এ কারণে জরিমানা সংশ্লিষ্ট ধারার কিছু বাক্য এধরনের হতে পারে যে,

"গ্রাহক এমর্মে দায়িত্ব গ্রহণ করছে যে, সে যদি এই চুক্তির আলোকে পরিশোধযোগ্য অর্থের কোন অংশ যথাসময়ে পরিশোধ না করে, তাহলে সে ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত জনকল্যাণমূলক একাউন্টে/ফান্ডে এত টাকা দান করবে, যার হিসাব অনাদায়ের প্রতিদিনের বিনিময়ে বার্ষিক ......% ভিত্তিতে করা হবে। কিন্তু সে যদি ব্যাংক/অর্থায়নকারীর নিকট বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য স্বাক্ষী দ্বারা একথা প্রমাণ করে দেয় যে, অনাদায়ের কারণ দারিদ্র্যতা কিংবা তার একান্ত অক্ষমতা ও অপারগতা ছিল।"

(৪) যেহেতু এটা কল্যাণমূলক কাজের কসম, তাই মূলত সেই নির্দিষ্ট অর্থ স্বয়ং গ্রাহক নিজের মনমত কোন কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করাও জায়েয ছিল। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সে যে এই অর্থ পরিশোধ করবে, একথা নিশ্চয়তা প্রদানকল্পে কল্যাণ ফান্ড/একাউন্টকে নির্ধারণ করা

হয়েছে। এরূপ নির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করা শরীয়তের কোন উসূলের পরিপন্থি নয়। কিন্তু একথা অপরিহার্য যে, ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ উদ্দেশ্যের জন্য একটি পৃথক ফান্ড অথবা কমপক্ষে পৃথক একটি একাউন্টের ব্যবস্থা করবে এবং তাতে সংগৃহীত অর্থ গ্রাহক/ঋণগ্রহীতার অবগতিক্রমে শরীয়তসম্মত কল্যাণমূলক কাজে ব্যয়িত হতে হবে। বর্তমানে বহুসংখ্যক ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এই প্রক্রিয়ার উপর সফলতার সাথে কাজ চলছে।

(৬) মুরাবাহায় রোল ওভারের কোন সুযোগ নেই

আরেকটি নীতিমালা যা স্মরণ রাখা এবং তার উপর আমল করা অত্যন্ত জরুরী। তা হল, মুরাবাহা লেনদেনে ভবিষ্যতে অতিরিক্ত মেয়াদের জন্য রোল অভারের (Roll Over) সুযোগ নেই।[১] সুদ ভিত্তিক অর্থায়নে কোন ব্যাংকের গ্রাহক যদি কোন কারণে নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে না পারে, তাহলে সে ব্যাংকের নিকট তার ঋণের ব্যাপারে আরেকটি নির্দিষ্ট মেয়াদ নবায়নের জন্য আবেদন করে। ব্যাংক যদি তার সাথে একমত পোষণ করে, তাহলে এই ঋণের উপর পারস্পরিক শর্তসাপেক্ষে রোল অভার করে দেয়া হয়, যার আলোকে নতুন মেয়াদে সুদের হার নতুন করে প্রযোজ্য হবে। কার্যত এর অর্থ এই যে, ততটুকু পরিমাণেই একটি নতুন ঋণ (নতুন করে সুদের হারে) ঋণগ্রহীতাকে পুনর্বার প্রদান করা হয়েছে।

কোন ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান যারা মুরাবাহার পদ্ধতিকে সঠিকভাবে বুঝে না এবং তাকে সুদী অর্থায়নের ন্যায় শুধুমাত্র একটি অর্থায়ন পদ্ধতি মনে করে, তারা রোল অভারের পদ্ধতিকে মুরাবাহায়ও ব্যবহার করা শুরু করে দিয়েছে। গ্রাহক যদি তাদের কাছে মুরাবাহা পরিশোধের তারিখ নবায়নের আবেদন করে, এসব ব্যাংক ঐ মুরাবাহাকে রোল অভার করে অতিরিক্ত মুনাফার শর্তের সাথে পরিশোধের সময় বৃদ্ধি করে দেয়। কার্যত এর অর্থ এই যে, সেই পণ্যে (Commodity) আরেকটি

---

১. (Roll Over) পরিভাষার ব্যাখ্যা সামনের শব্দগুচ্ছে করা হচ্ছে।

মুরাবাহা সংঘটিত হয়ে যায়। (অর্থাৎ, ব্যাংক সেই এক জিনিসই গ্রাহকের কাছে নতুন মুনাফার ভিত্তিতে বিক্রি করে দিয়েছে) এ নীতি শরীয়তসম্মত উসূলের পরিপন্থী।

এ কথা পরিষ্কারভাবে বুঝা উচিত যে, মুরাবাহা কোন ঋণ নয়। বরং একটি পণ্যের বিক্রি, যার মূল্য পরিশোধ একটি নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত বিলম্বিত করে দেয়া হয়েছে। যখন এ পণ্য একবার বিক্রি হয়ে গিয়েছে, তখন এর মালিকানা গ্রাহকের দিকে অর্পিত হয়ে গিয়েছে। এখন আর বিক্রেতার (ব্যাংকের) মালিকানা নেই। বিক্রেতা আইনগতভাবে শুধুমাত্র মূল্যের দাবি করতে পারে, যা ক্রেতার দায়িত্বে পরিশোধযোগ্য ঋণ (Debt)। এ কারণে পূর্বের ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে একই বস্তুকে পুনর্বার বিক্রির প্রশ্নই উঠতে পারে না। রোল অভার (Roll Over) নির্ভেজাল সুদ। কেননা, এটা মুরাবাহা বিক্রি থেকে সৃষ্ট ঋণের (Debt) উপর অতিরিক্ত অর্থ নেয়ার চুক্তি।

(৭) সময়ের পূর্বে পরিশোধের কারণে রে'য়ায়াত-সুযোগ

কোন কোন সময় ঋণগ্রহীতা (Debtor) নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ঋণ পরিশোধ করতে চায়। এমতাবস্থায় সে নির্ধারিত বাকি মূল্যে হ্রাস কিছুটা করতেও অভিলাষী হয়। সুতরাং সময়ের পূর্বে পরিশোধের কারণে তাকে রে'য়ায়াত দেয়ার ব্যাপারে শরীয়তের দৃষ্টিতে অনুমতি আছে কি না- এ প্রশ্নের ব্যাপারে পূর্ববর্তী ফিক্‌হবিদগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ইসলামের আইনগত গ্রন্থাবলীতে এই মাসআলাটি "ضــع و تعجل" (ঋণের পরিমাণে হ্রাস কর এবং জলদী উসূল কর) এর শিরোনামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কোন কোন ফিক্‌হবিদ এই ব্যবস্থাপনাকে জায়েয বলেছেন। তবে চার ইমামসহ অধিকাংশ ফিক্‌হবিদের নিকট যদি সময়ের পূর্বে পরিশোধের জন্য এই হ্রাসকে শর্ত হিসেবে আরোপ করে, তাহলে জায়েয নেই।[১]

যেসব ফিক্‌হবিদের নিকট জায়েয, তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তি হল হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসের উপর।

---

১. ইবন কুদামা, আল-মুগনী, ৪/১৭৪,১৭৫। বিস্তারিত জানার জন্য بحوث في قضايا فقهية معاصرة দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা নং- ২৫।

হাদীসটি হল- যখন বনু নযীরের ইয়াহুদীদেরকে তাদের ষড়যন্ত্রের কারণে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বহিষ্কার করা হল, তখন কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-দরবারে উপস্থিত হয়ে আবেদন করল যে, আপনি তো তাদেরকেদেশান্তরের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু কিছুসংখ্যক লোকের নিকট সেসব ইয়াহুদীদের প্রাপ্ত ঋণ রয়েছে যা যার পরিশোধের তারিখ এখনো আসেনি, এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) সেসব ইয়াহুদীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেনঃ[১] ضعوا وتعجلوا "নিজেদের ঋণ হ্রাস কর এবং জলদী উসূল কর"।

অধিকাংশ ফকীহগণ এই হাদীসকে সঠিক বলে সমর্থন করেন না, হাদীসের বর্ণনাকারী স্বয়ং ইমাম বাইহাকী সুস্পষ্ট বলেছেন যে, এই হাদীসটি য'য়ীফ (দুর্বল)।

যদি এই হদীসকে সঠিক বলে সমর্থনও করা হয়, তাহলেও বনু নযীরের দেশান্তর হিজরতের দ্বিতীয় বছরে সংঘটিত হয়েছে। অথচ তখনও সুদের নিষিদ্ধতা অবতীর্ণ হয়নি।

এছাড়া আল্লামা ওয়াক্বেদী (রহ.) বর্ণনা করেছেন, বনু নযীর সুদি ঋণ প্রদান করত, এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) যে ব্যবস্থাপনার অনুমতি দিয়েছিলেন তা এই ছিল যে, ঋণদাতা সুদ ছেড়ে দিবে এবং ঋণগ্রহীতা মূল পুঁজি জলদী আদায় করবে। ওয়াক্বেদী (রহ.) বর্ণনা করেছেন, বনু নযীরের একজন ইয়াহুদী সালাম ইবন আবী হুকাইক সাহাবী উসাইদ ইবন হুযাইরকে আশি দীনার দিয়েছিল, যা এক বছর পর অতিরিক্ত চল্লিশ দীনারসহ পরিশোধ করতে হবে। এভাবে উসাইদ (রা.)-এর দায়িত্বে সালামের ১২০ দীনার পরিশোধ করা ওয়াজিব ছিল। এই উল্লেখিত ব্যবস্থাপনার পর উসাইদ (রা.) সালামকে মূল পুঁজি অর্থাৎ আশি দীনার পরিশোধ করে দিয়েছেন এবং সালাম অবশিষ্ট থেকে দায়িত্ব মুক্ত হয়েছেন।[২]

১. আল-বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা, ৬/২৮।
২. আল-ওয়াক্বেদী, আল-মাগাযী, ১/৩৭৪।

এসব কারণের ভিত্তিতে অধিকাংশ ফকীহদের মতামত হল, যদি সময়ের পূর্বে পরিশোধ করাকে ঋণ হ্রাস করার শর্ত হিসেবে আরোপ করা হয়, তাহলে এটা জায়েয নেই। তবে জলদী পরিশোধের জন্য যদি এই শর্তাআরোপ না করা হয় এবং ঋণদাতা স্বেচ্ছায় স্বীয় সন্তুষ্টিতে রে'য়ায়াত দিয়ে দেয়, তাহলে জায়েয আছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গীকে ইসলামী ফিক্হ একাডেমী তাদের বার্ষিক সেমিনারে গ্রহণ করেছে।[১]

এর অর্থ এই যে, একটি ইসলামী ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পারস্পরিক মুরাবাহার চুক্তিতে এধরনের রে'য়ায়াত চুক্তির সময় সিদ্ধান্ত করা যাবে না এবং গ্রাহকও তার প্রাপ্য হিসেবে তা দাবি করতে পারবে না। তবে ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান যদি তাদের সম্মতিক্রমে এধরনের সুযোগ দিয়ে দেয়, তাহলে এটাও প্রশ্নযোগ্য নয়। বিশেষ করে গ্রাহক যখন অভাবগ্রস্ত হবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন দরিদ্র কৃষক যদি একটি ট্রাক্টর কিংবা ফসলের বীজ ইত্যাদি মুরাবাহার ভিত্তিতে ক্রয় করে, তাহলে ব্যাংকের উচিত, স্বেচ্ছায় সময়ের পূর্বে আদায়ের ক্ষেত্রে তাকে সুযোগ দিয়ে দেয়া।

(৮) মুরাবাহায় ব্যয়ের হিসাব

একথা পূর্বে বিবৃত হয়েছে যে, মুরাবাহার চুক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের ইসলামী পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। যে পদ্ধতিতে মূল ব্যয়ের উপর মুনাফা ধার্য করা হয়। এজন্য মুরাবাহা সেখানেই কার্যকর হতে পারে যেখানে বিক্রেতা বিক্রিত পণ্যের উপর ব্যয়িত অর্থের পূর্ণ হিসাব করতে পারে। যদি ব্যয়ের পূর্ণ হিসাব না করা যায়, তাহলে মুরাবাহা সম্ভবপর হবে না। এক্ষেত্রে দর কষাকষির ভিত্তিতে বিক্রি হবে। (অর্থাৎ, এমন বিক্রি যেখানে মূল ব্যয়ের কথা উল্লেখ থাকে না)।

---

১. সিদ্ধান্ত নং- ৬৬, ষষ্ঠ সেমিনার, পত্রিকা নং-৭, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা নং- ২১৭।

এই উসূল থেকে আমরা আরেকটি বিধানের দিকে ফিরে যাচ্ছি যে, মুরাবাহা সেই মুদ্রার ভিত্তিতেই হওয়া উচিত যার দ্বারা বিক্রেতা ঐ পণ্যকে ক্রয় করেছে, সে যদি ঐ জিনিস পাকিস্তানী মুদ্রা দ্বারা ক্রয় করে, তাহলে পরবর্তী বিক্রিও পাকিস্তানী মুদ্রার ভিত্তিতেই হওয়া উচিত। প্রথম বিক্রি যদি আমেরিকান ডলার দ্বারা হয়, তাহলে মুরাবাহাও আমেরিকান ডলারের ভিত্তিতে হওয়া উচিত, যাতে করে সঠিক ব্যয় নির্ধারণ হতে পারে।

কিন্তু আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে উভয় বিক্রি একই মুদ্রার ভিত্তিতে হওয়া জটিল হতে পারে। গ্রাহকের নিকট যে জিনিস বিক্রি করা হচ্ছে, তা যদি ভিনদেশ থেকে আমদানী করা হয়, অন্যদিকে পরবর্তী ক্রেতা পাকিস্তানী, তাহলে মূল ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্য ভিনদেশের মুদ্রা দ্বারা আদায় করা হবে এবং দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্য নির্ধারণ পাকিস্তানী মুদ্রায় হবে।

এই সমস্যার নিরসন দু'ভাবে করা যেতে পারে। প্রথমত- ক্রেতা যদি একমত হয় এবং সে দেশের আইন-কানুনও তার অনুমতি দেয়, তাহলে দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয়ও ডলারের ভিত্তিতে হতে পারে।

দ্বিতীয়ত- বিক্রেতা (ব্যাংক) যদি সে জিনিস পাকিস্তানী মুদ্রাকে ডলারে রূপান্তরিত করে ক্রয় করে, তাহলে পাকিস্তানী টাকার সেই পরিমাণ যা তাকে ডলারে রূপান্তরিত করার জন্য আদায় করতে হয়েছে, সেটাকে মূল ব্যয় ধরে মুরাবাহায় তার উপর মুনাফার সংযোজন করা যেতে পারে।

কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাংক সেই জিনিস ভিনদেশ থেকে ক্রয় করে এবং মূল্য তিন মাস পর কিংবা কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয়। সে মূল সরবরাহকারীকে পূর্ণ মূল্য পরিশোধের পূর্বেই উক্ত জিনিস তার গ্রাহকের নিকট বিক্রি করে দেয়। ব্যাংক যেহেতু ডলারের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করবে এবং পরবর্তিতে গ্রাহকের নিকট যখন সেই জিনিস বিক্রি করা হবে তখন ঐ পরিমান ডলারের বিনিময়ে কত পাকিস্তানী মুদ্রা কত হবে তা জানা যায় না। কেননা, ডলার এবং পাকিস্তানী মুদ্রার মূল্য উঠা-নামা করতে থাকে। এজন্য এমনও হতে পারে যে, মুরাবাহার সময় যে পরিমাণ মূল্যের ধারণা করা হয়েছে ব্যাংকের হয়ত এর চেয়ে অধিক মূল্য পরিশোধ করতে হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মুরাবাহার সময় একটি আমেরিকান

ডলারের মূল্য ছিল চল্লিশ রুপী, মুরাবাহার মূল্যের নির্ধারণও সেই দর অনুযায়ী ধার্য করা হয়েছে। কিন্তু ব্যাংক যখন মূল সরবরাহকারীকে মূল্য আদায় করেছে তখন ডলারের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে একচল্লিশ রুপী হয়ে গিয়েছে। যার পরিণামে ব্যাংকের ব্যয়ে ২.৫ পার্সেন্ট বৃদ্ধি হয়ে গিয়েছে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য কোন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান মুরাবাহার চুক্তিতে এরূপ শর্তারোপ করে দেয় যে, মুদ্রার দরে উঠা নামার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যয় গ্রাহক বহন করবে। কিন্তু পূর্ববর্তী ফকীহদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী এ ধরনের শর্তে মুরাবাহা সঠিক নয়। কেননা, এমতাবস্থায় ক্রয়-বিক্রয়ের সময় মুল্য অস্পষ্ট থেকে যায় এবং এই অস্পষ্টতা ততদিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে যতদিন পর্যন্ত ক্রেতা (ব্যাংক) সরবরাহকারীকে মূল্য আদায় না করবে। এ ধরনের অস্পষ্টতার কারণে চুক্তি সঠিক থাকে না। এ সমস্যার সমধানের জন্য ব্যাংকের কাছে তিনটি পন্থা রয়েছে।

(১) ব্যাংক সেই জিনিস L/C at sight এর ভিত্তিতে ক্রয় করবে (যে পন্থায় ক্রেতার নিকট মাল পৌঁছার সাথে সাথেই মূল্য পরিশোধ করতে হয়) এবং ব্যাংক তার গ্রাহকের নিকট বিক্রির পূর্বে মূল্য পরিশোধ করবে। এ পদ্ধতিতে মুদ্রার দরে উঠা নামার প্রশ্ন সৃষ্টি হবে না। মুরাবাহার মূল্য নির্ধারণ ঐ দিনের মুদ্রার দর অনুযায়ী হবে, যে দিন ব্যাংক সরবরাহকারীকে (Supplier) মূল্য পরিশোধ করেছে।

(২) ব্যাংক মুরাবাহার মূল্যের নির্ধারণও পাকিস্তানী রুপীর পরিবর্তে আমেরিকান ডলার দ্বারা করবে, যাতে করে গ্রাহক মুরাবাহার বাকি মূল্যও আমেরিকান ডলার দ্বারা পরিশোধ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক তার গ্রাহক থেকে আমেরিকান ডলার উসূল করার হকদার হবে। এজন্য ডলারের মূল্যে উঠা নামার আশংকাও ক্রেতাকে (গ্রাহককে) বহন করতে হবে।

(৩) মুরাবাহার পরিবর্তে ক্রয়-বিক্রয় দর কষাকষির ভিত্তিতে করবে (অর্থাৎ, এমন বিক্রি যেখানে মূল ব্যয় উল্লেখ থাকে না) এবং মূল্য এই হিসেবে নির্ধারণ করা হবে, যাতে মুদ্রার দরে সম্ভাব্য কম-বেশিকেও কভার করে নেয়।

(৯) মুরাবাহা কোন জিনিসে হতে পারে

যে সকল জিনিস মুনাফার উপর বিক্রি করা যায় সে সকল জিনিষ মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি হতে পারে। কেননা, মুরাবাহাও ক্রয়-বিক্রয়েরই একটি প্রকার। সুতরাং কোন কোম্পানির শেয়ারও মুরাবাহার ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় হতে পারবে। কেননা, ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী কোম্পানির শেয়ার তার বাহককে কোম্পানির সম্পদে আনুপাতিক হারে মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে। যদি কোম্পানির সম্পদের ক্রয়-বিক্রয় মুনাফার ভিত্তিতে হতে পারে, তাহলে তার শেয়ারকেও মুরাবাহা হিসেবে বিক্রি করা যাবে। তবে জরুরী হল, চুক্তিতে ক্রয়-বিক্রয়ের পূর্ব বিবৃত সকল শর্ত পুরোপুরিভাবে পাওয়া যেতে হবে। এজন্য জরুরী হল, বিক্রেতা প্রথমে শেয়ারকে তার দায়-দায়িত্বসহ কব্জা করবে অতঃপর সেগুলোকে তার গ্রাহকের নিকট বিক্রি করবে, buy back কিংবা কব্জা করা ব্যতীত শেয়ারকে বিক্রি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই।

পক্ষান্তরে যেসব জিনিস ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে না, সেগুলোর উপর মুরাবাহা চুক্তি ও হবে না। যেমন, মুদ্রার পারস্পরিক আদান-প্রদানে মুরাবাহা সম্ভব নয়। কেননা, মুদ্রার পারস্পরিক বিক্রি হয়ত নগদ হতে হবে অথবা বাকির ক্ষেত্রে সে দিনের বাজারদর অনুযায়ী হতে হবে যা বিক্রির দিন প্রচলিত ছিল।[১] এমনিভাবে ঐ সকল ব্যবসায়িক ডকুমেন্ট যা বাহকের জন্য উসূলযোগ্য ঋণের প্রতিনিধিত্ব করে, সেগুলোর ক্রয়-বিক্রিও গায়ের মূল্য অনুযায়ী হতে পারবে। এজন্য এধরনের ডকুমেন্টেও মুরাবাহা হতে পারবে না। এমনিভাবে ঐসব ডকুমেন্ট যা বাহককে ইস্যুকারীর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট অর্থ উসূলের হকদার বানায়, সেগুলোর ক্রয়-বিক্রি হতে পারবে না। সেগুলোর আদান-প্রদানের পদ্ধতি হল, শুধুমাত্র লিখিত মূল্য (Face Value) অনুযায়ী আদান-প্রদান করা, সুতরাং মুরাবাহার ভিত্তিতে সেগুলোর বিক্রি হতে পারবে না।

---

১. বিস্তারিত জানার জন্য আমার আরবী কিতাব احكام الاوراق النقدية দ্রষ্টব্য।

(১০) মুরাবাহায় মূল্য পরিশোধে রি-সিডিউল করা

ক্রেতা/গ্রাহক যদি মুরাবাহা চুক্তিতে আদায়ের তারিখে কোন কারণে পরিশোধ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে কখনো কখনো বিক্রেতা/ব্যাংকের কাছে কিস্তিসমূহকে রি-সিডিউল করে দেয়ার আবেদন করে। আধুনিক বাংকসমূহে ঋণকে সাধারণত অতিরিক্ত সুদের ভিত্তিতে রি-সিডিউল করা হয়। কিন্তু মুরাবাহার মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। কিস্তিসমূহকে যদি রি-সিডিউল করা হয়, তাহলে রি-সিডিউলিং-এর কারণে অতিরিক্ত অর্থ নেয়া যায় না। মুরাবাহার পরিশোধযোগ্য মূল্য ঐ পরিমানই থাকবে এবং পূর্ব নির্ধারিত মুদ্রাও বলবৎ থাকবে।

কোন কোন ইসলামী ব্যাংকের এমন প্রস্তাব ও রয়েছে যে, মুরাবাহার মূল্যকে এমন মযবুত মুদ্রায় রি-সিডিউল করা হবে, যা ঐ মুদ্রা থেকে ভিন্ন হবে যেগুলোতে মূল মুরাবাহা সংঘটিত হয়েছিল। এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঐ মযবুত মুদ্রার মূল্যে বেশি হওয়ার কারণে এর দ্বারা ব্যাংককে বিনিময় প্রদান করা। এই উপকারিতা যেহেতু রি-সিডিউলের মাধ্যমে অর্জন করা হচ্ছে এজন্য এটা জায়েয নেই, রি-সিডিউলিং অবশ্যই সেই মুদ্রা এবং সেই পরিমাণেই হতে হবে। তবে পরিশোধের সময় ক্রেতা বিক্রেতার সম্মতিতে অদল-বদল হিসেবে ভিন্ন মুদ্রায় সেই দিনের (অর্থাৎ পরিশোধের দিনের) দর অনুযায়ী পরিশোধ করতে পারে। কিন্তু যে দিন চুক্তি হয়েছিল সে দিনের দর অনুযায়ী এই অদল-বদল হতে পারবে না।

(১১) মুরাবাহাকে আদান-প্রদান যোগ্য ডকুমেন্টে রূপান্তরিত করা

মুরাবাহা এমন একটি চুক্তি যাকে আদান-প্রদানযোগ্য এমন ডকুমেন্টে রূপান্তরিত করা যায় না যে ডকুমেন্ট সেকেন্ডারী মার্কেটে (Secondary Market) বিক্রি করা যায়। তার কারণ সুস্পষ্ট, ক্রেতা/গ্রাহক যদি এমন ডকুমেন্টে স্বাক্ষর করে, যা এ কথা প্রমাণ করে যে, সে বিক্রেতা/অর্থায়নকারীর নিকট এত টাকা ঋণী, তাহলে এ কাগজ তার থেকে উসূলযোগ্য ঋণের মুদ্রার প্রতিনিধিত্ব করে। অথবা ভিন্ন শব্দে, এমন

অর্থের প্রতিনিধিত্ব করে, যা তার দায়িত্বে পরিশোধ করা ওয়াজিব। সুতরাং এই ডকুমেন্টকে তৃতীয় ব্যক্তির নিকট বিক্রি করার অর্থ মুদ্রাই (Money) বিক্রি করা। আর একথা পূর্বে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে যে, যখন মুদ্রার আদান-প্রদান একই দেশের মুদ্রার সাথে হবে, তখন এই আদান-প্রদান সমান সমান হওয়া অপরিহার্য। কম বা বেশি মূল্যে বিক্রি করা যাবে না। সুতরাং মুরাবাহা করার ফলে যে মুদ্রার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তার প্রতিনিধিত্বকারী কাগজ দ্বারা আদান-প্রদানযোগ্য ডকুমেন্ট অস্তিত্বে আসতে পারে না। তাতে যদি কাগজের আদান-প্রদান হয়, তাহলে তা গায়ের মূল্য অনুযায়ীই হতে হবে। তবে যদি কোন বিমিশ্রিত শাখা বিদ্যমান থাকে যা বিভিন্ন চুক্তি যেমন মুশারাকা, ভাড়া এবং মুরাবাহার উপর শামিল, তাহলে সেই মিশ্র শাখার ভিত্তিতে আদান-প্রদানযোগ্য সার্টিফিকেট চালু করা যেতে পারে। কিন্তু ঐসব শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যেগুলোর ব্যাপারে "ইসলামী ফান্ড" এর অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

মুরাবাহার চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কয়েকটি মৌলিক ত্রুটি-বিচ্যুতি

মুরাবাহার পদ্ধতি এবং তদীয় সংশ্লিষ্ট আলোচনাসমূহ বর্ণনা করার পর যথাযোগ্য মনে হচ্ছে যে, সেসব মৌলিক ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দেয়া যা সাধারণত ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মুরাবাহা পদ্ধতির উপর আমল করার সময় ঘটে থাকে।

(১) সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক প্রশ্নযোগ্য ত্রুটি হচ্ছে এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করা যে, মুরাবাহা একটি সাধারণ অর্থায়ন পদ্ধতি, যাকে ঐ সব ধরনের অর্থায়নের জন্য ব্যবহার করা যাবে যা আধুনিক ব্যাংক এবং নন-ব্যাংকিং ফিন্যান্সিয়াল ইন্‌স্টিটিউশনে (NBFIS) ব্যবহার করে থাকে। সেই ভুল ধারণার ভিত্তিতে কোন কোন ব্যাংকে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, তারা দৈনন্দিন ব্যবসায়িক ব্যয়ের (Over Head Expenses) অর্থায়নের জন্যও মুরাবাহাকে ব্যবহার করে। যেমন কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধ, বিদুৎ বিল পরিশোধ ইত্যাদি, এমনিভাবে ঐসব ঋণ পরিশোধের জন্য যা এই কোম্পানী অন্যকে পরিশোধ করবে। এ কাজ কোন ভাবেই অগ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, মুরাবাহা পদ্ধতি কেবল সেখানেই ব্যবহার হতে পারে যেখানে গ্রাহক কোন জিনিস ক্রয় করতে ইচ্ছুক। যদি অন্য কোন উদ্দেশ্যে ফান্ডের প্রয়োজন হয়, তাহলে সেখানে মুরাবাহা কার্যকর হবে না। এমন ক্ষেত্রে প্রয়োজনের ধরন অনুযায়ী মুশারাকা লিজিং ইত্যাদি উপযুক্ত অর্থায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে।

(২) কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রাহক মুরাবাহার ডকুমেন্টের উপর শুধুমাত্র ফান্ড অর্জনের জন্য স্বাক্ষর করে। তার সেই ফান্ড দ্বারা নির্দিষ্ট কোন জিনিস

ক্রয় করা উদ্দেশ্য হয় না, অনির্ধারিত উদ্দেশ্যের জন্য ফান্ডের প্রয়োজন হয়, কিন্তু পদ্ধতিগত প্রয়োজন পূরণের জন্য সে কাল্পনিকভাবে কোন জিনিসের নাম উল্লেখ করে দেয়, অর্থ উত্তোলনের পর সে তাকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ব্যয় করে (এবং সে জিনিস ক্রয় করে না)।

স্পষ্ট কথা যে, এটা একটি কাল্পনিক এবং মিথ্যা লেনদেন। ইসলামী অর্থায়নকারীদেরকে এব্যাপারে খুব সতর্ক থাকা উচিত। এই নিশ্চয়তা অর্জন করা তাদের দায়িত্ব যে, যার ভিত্তিতে মুরাবাহা হচ্ছে গ্রাহক বাস্তবিক পক্ষে সে জিনিস ক্রয় করতে ইচ্ছুক কি না। যেসব দায়িত্বশীল লোকেরা মুরাবাহা সুযোগের মঞ্জুরী প্রদান করে তাদের এ কথার নিশ্চয়তা অবশ্যই অর্জন করতে হবে। আর লেনদেন সঠিক কি না, একথার নিশ্চিত কল্পে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে হবে।

(১) ব্যাংকের উচিত গ্রাহককে (সে জিনিস ক্রয় করার জন্য) ফান্ড দেয়ার পরিবর্তে সরাসরি সরবরাহকারীকে পরিশোধ করবে।

(২) যেখানে ফান্ডের ব্যাপারে গ্রাহকের উপরই ভরসা করা ব্যতীত কোন উপায় নেই, সেক্ষেত্রে গ্রাহক ব্যাংকের পক্ষ থেকে পণ্য ক্রয় করে মেমো কিংবা অন্য কোন প্রামাণ্য ডকুমেন্ট অর্থায়নকারী ব্যাংকের নিকট পেশ করবে।

(৩) যেক্ষেত্রে উল্লেখিত পদক্ষেপদ্বয় পূর্ণ করা যাবে না, সেক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠান সেই ক্রয়কৃত জিনিস প্রকাশ্যে দেখার ব্যবস্থা করবে।

মোটকথা, ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হল, একথা নিশ্চিত করা যে, মুরাবাহা প্রকৃত এবং মৌলিক চুক্তি এখানে কার্যত ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে, সুদি ঋণকে গোপন করার জন্য মুরাবাহার ভুল ব্যবহার করা হয়নি।

(৩) কখনো কখনো এমনও হয় যে, ব্যাংক সরবরাহকারী থেকে পণ্য সংগ্রহ করার পূর্বেই গ্রাহকের নিকট বিক্রি করে দেয়। এই ত্রুটি-বিচ্যুতির শিকার ঐসব লেনদেনে হয়, যেখানে মুরাবাহার সকল ডকুমেন্টে একই সময় স্বাক্ষর করা হয় এবং মুরাবাহার বিভিন্ন ধাপের প্রতি লক্ষ্য করা হয় না। কোন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান মুরাবাহার শুধুমাত্র একটি লেনদেনই

করে, যার উপর অর্থ প্রদানের সময় কিংবা কখনো কখনো এই সুযোগের মঞ্জুরী প্রদানের সময় স্বাক্ষর করা হয়। এই পদ্ধতি মুরাবাহার মৌলিক নীতিমালার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। এই বিষয়ে পূর্বে বিবৃত হয়েছে যে, মুরাবাহার ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন চুক্তির একটি প্যাকেজ, যা ক্রমান্বয়ে তার সংশ্লিষ্ট ধাপে ধাপে কার্যকর হয়। এই ধাপ সম্পর্কে মুরাবাহা অর্থায়নের পদ্ধতি প্রসংগে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মুরাবাহার ঐসব মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি লক্ষ্য না রাখলে সমুদয় লেনদেন সুদি ঋণে রূপান্তরিত হয়ে যায়। শুধুমাত্র পরিভাষা এবং নাম পরিবর্তন করার দ্বারা লেনদেন শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হয় না।

ইসলামী ব্যাংকসমূহের শরীয়া এডভাইজারী বোর্ডের প্রতিনিধিগণ ব্যাংকের লেনদেন শরীয়তসম্মত হচ্ছে কি না, তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবে, তাদের এ ব্যাপারে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে, লেনদেনে এই সব ধাপের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং প্রত্যেক লেনদেন তার নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত হয়েছে।

(৪) তারল্যের (Liquidity) ব্যবস্থাপনার জন্য সাধারণত পণ্যের আন্তর্জাতিক লেনদেনের প্রয়োজন হয়। কোন কোন ইসলামী ব্যাংক মনে করে যে, এই চুক্তিটি যেহেতু সম্পদের উপর নির্ভরশীল, তাই এগুলোতে সহজেই মুরাবাহার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায় এবং পণ্যের লেনদেন আন্তর্জাতিক মার্কেটে যেমনিভাবে প্রচলিত রয়েছে তা শরীয়তসম্মত নয়। ব্যাংক এদিকে ভ্রুক্ষেপ না করেই এই ব্যবসায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা অবাস্তব চুক্তি হয় যেগুলোর মধ্যে কোন জিনিসেরই লেনদেন হয় না, পার্টিগণ পার্থক্য বরাবর করে মু'আমালা সমাপ্তি করে দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে পণ্য প্রকৃতভাবে মিশ্রিত থাকে কিন্তু সেগুলোর ফরওয়ার্ড সেল হয় অর্থাৎ, ভবিষ্যতের সাথে সম্পৃক্ত ক্রয়-বিক্রয়। অথবা পণ্যবিহীন ক্রয়-বিক্রয় (Short Sale) হয়, আর এ পদ্ধতিদ্বয় শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয। এমনকি এই মু'আমালা যদি উপস্থিত পণ্যের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধ থাকে তাহলেও তা মুরাবাহার ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী হতে হবে যা এই গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে।

(৫) কোন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, তারা ঐ সম্পদের উপর মুরাবাহা করে যা গ্রাহক পূর্বেই তৃতীয় কোন পার্টি থেকে ক্রয় করে নিয়েছে। এটাও শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। যখন গ্রাহক স্বয়ং একবার সে জিনিসটি ক্রয় করে নিয়েছে তাহলে একই পণ্যকে পুনর্বার সেই সরবরাহকারী থেকে ক্রয় করতে পারে না। যদি সেই জিনিসকেই ব্যাংক গ্রাহক থেকে ক্রয় করে পুনরায় তার নিকটই বিক্রি করে দেয়, তাহলে এটা Buy Back এর কৌশল হবে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। বিশেষ করে মুরাবাহায়, মূলত গ্রাহক যদি প্রথমে সেই জিনিস ক্রয় করে নেয় এবং পরে ফান্ডের জন্য ব্যাংকের নিকট আসে, তাহলে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়ত তার উপর বিক্রেতার পক্ষ থেকে যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তার থেকে মুক্তি পাওয়া কিংবা ঐ ফান্ডকে সে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চায়। এই দু'উদ্দেশ্যের কোন উদ্দেশ্যের জন্যই ব্যাংক তাকে মুরাবাহার ভিত্তিতে অর্থায়ন করতে পারবে না। মুরাবাহা শুধুমাত্র সে ক্ষেত্রেই হতে পারে যখন উক্ত জিনিস গ্রাহকের পূর্ব থেকেই ক্রয়কৃত না হবে।

সারাংশ

মুরাবাহার বিভিন্ন দিকের উপর পূর্বের আলোচনা থেকে নিম্নবর্ণিত ফলাফল বের করা যায় যা স্মরণ রাখার মত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতিমালা।

(১) মুরাবাহা প্রকৃতগতভাবে কোন অর্থায়ন পদ্ধতি নয়, এটা একটি সাধাসিধা ক্রয়-বিক্রয়, যা মূল ব্যয়ের উপর সংযোজনের (Cost Plus) চুক্তি পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু তাতে বাকিতে পরিশোধের পিদ্ধতিকে সংযোজন করে তাকে শুধুমাত্র ঐ সব ক্ষেত্রে অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করার পথ উন্মুক্ত করা যায় যেখানে গ্রাহক বাস্তবিকপক্ষে কোন পণ্য ক্রয় করতে ইচ্ছুক। এ কারণেই মুরাবাহাকে আদর্শ অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা যায় না এবং না সর্বপ্রকারের অর্থায়নের জন্য সাধারণ পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা যায়। তাকে মুশারাকা এবং মুদারাবার উপর নির্ভরশীল আদর্শিক অর্থায়ন পদ্ধতির দিকে একটি সাময়িক পদক্ষেপ

হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। অন্যথায় মুরাবাহার ব্যবহার শুধুমাত্র সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকবে যেখানে মুশারাকা এবং মুদারাবা ব্যবহার করা যাবে না।

(২) মুরাবাহা চুক্তির মঞ্জুরী প্রদানের সময় মঞ্জুরীদাতা কর্মকর্তার এতটুকু নিশ্চিত হতে হবে যে, গ্রাহক বাস্তবিকপক্ষেই সেই জিনিস ক্রয় করতে ইচ্ছুক যার উপর মুরাবাহা সংঘটিত হচ্ছে। তাকে শুধুমাত্র কাগজ-পত্রের ফরমালেটি বানানো যাবে না যেখানে মূলত কোন ক্রয়-বিক্রয় নেই।

(৩) Over Head Expenses বিলসমূহের পরিশোধ কিংবা গ্রাহকের দায়িত্বে অন্য কোন ঋণ পরিশোধের জন্য মুরাবাহা সংঘটিত হতে পারবে না। এমনিভাবে মুদ্রা ক্রয়ের জন্যও মুরাবাহা হতে পারবে না।

(৪) মুরাবাহা বৈধ হওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল, সংশ্লিষ্ট পণ্য গ্রাহকের নিকট মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রির পূর্বে তা অর্থায়নকারীর মালিকানায় এবং প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কব্জায় আসতে হবে। মাঝে এমন কিছু সময় থাকতে হবে যখন সে পণ্য অর্থায়নকারীর ঝুঁকিতে (Risk) থাকবে। ঐ পণ্যের মালিকানা অর্জন করা ব্যতীত এবং স্বল্প সময়ের জন্য হলেও তার ঝুঁকি বহন করা ব্যতীত এই লেনদেন শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না এবং এর মাধ্যমে অর্জিত মুনাফাও হালাল হবে না।

(৫) মুরাবাহা করার সর্বোত্তম পদ্ধতি হল, অর্থায়নকারী সরবরাহকারী থেকে সে জিনিস সরাসরি ক্রয় করে তাতে কব্জা প্রতিষ্ঠা করার পর স্বীয় গ্রাহকের নিকট মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করবে। পণ্য ক্রয়ের ব্যাপারে অর্থায়নকারীর পক্ষ থেকে গ্রাহককে উকিল নিযুক্ত করার দ্বারা মুরাবাহাকে সন্দেহযুক্ত করে দেয়। এ কারণে কোন কোন শরীয়াহ বোর্ড এই কৌশলকে নিষিদ্ধ বলে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু যেক্ষেত্রে অর্থায়নকারীর জন্য সরাসরি ক্রয় করা সম্ভব হয় না, সেক্ষেত্রে উকিল বানানোর অনুমতি আছে। এজন্য যথাসম্ভব ওকালতির চিন্তা-পদ্ধতি থেকে বিরত থাকা উচিত।

(৬) বাস্তবিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অর্থায়নকারী যদি তার গ্রাহককে সেই পণ্য ক্রয়ের জন্য উকিল নিয়োগ করে, তাহলে তার বিভিন্ন দিককে (অর্থাৎ উকিল হওয়া এবং পরিশেষে ক্রেতা হওয়া) একটিকে অপরটির থেকে

পরিষ্কারভাবে পৃথক রাখতে হবে। উকিল হিসেবে সে আমানতদার। যে যাবৎ সে জিনিস অর্থায়নকারীর উকিল হিসেবে তার কব্জায় থাকবে সে যাবৎ কোনরূপ অবাঞ্চিত হস্তক্ষেপ ব্যতীত তা যদি বিনষ্ট হয়, তাহলে গ্রাহক তার ক্ষয়-ক্ষতির দায়িত্ব বহন করবে না। যখন উকিল হিসেবে সে উক্ত জিনিস ক্রয় করবে, তখন সে অর্থায়নকারীকে অবগত করবে যে, উকিল হিসেবে তার দায়িত্ব পূর্ণ করে সে ক্রয়কৃত পণ্য কব্জা করে নিয়েছে এবং এখন সে অর্থায়নকারী থেকে তা ক্রয় করার জন্য প্রস্তাব করছে। যখন অর্থায়নকারী এই প্রস্তাব কবুল করে নিবে তখন ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণ হয়ে যাবে এবং উক্ত পণ্যের ঝুঁকি (Risk) ক্রেতা হিসেবে গ্রাহকের দিকে অর্পিত হয়ে যাবে। এপর্যায়ে গ্রাহক ঋণগ্রহীতা (Debtor) হয়ে যাবে এবং ঋণগ্রহীতা হওয়ার বিধি-বিধানও তার উপর প্রয়োগ হবে। এগুলো হচ্ছে মুরাবাহা অর্থায়নের মৌলিক চাহিদা যেগুলো ব্যতীত মুরাবাহা করা যায় না। মুরাবাহার মাধ্যমে অর্থায়নের পদ্ধতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রসংগেও আমরা ওকালত চুক্তির সাথে মুরাবাহার পাঁচটি ধাপের আলোচনা করেছি। ঐ পাঁচটি ধাপের প্রত্যেকটি ধাপের স্বীয় সঠিক আকৃতিতে বাস্তবায়ন হওয়া অপরিহার্য। সেগুলোর কোন একটিকে উপেক্ষা করা হলে পুরো ব্যবস্থাপনাই শরীয়তের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে।

একথা পূর্ণ সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, মুরাবাহা এমন একটি লেনদেন যা (হালাল-হারামের) সীমান্তে প্রতিষ্ঠিত এবং বর্ণিত পদ্ধতি থেকে কিঞ্চিত পরিমাণও এদিক-সেদিক হয়ে গেলে তা সুদি অর্থায়নের নিষিদ্ধ পরিধিতে নিপতিত হয়ে যাবে। এ কারণে এই লেনদেন পূর্ণদৃষ্টি এবং সতর্কতার সাথে করতে হবে এবং শরীয়তের কোন বিধানে উদাসীনতা অবলম্বন করা যাবে না।

(৭) বাকি এবং নগদের ভিত্তিতে দু'টি মূল্য ধার্য করা এই শর্তে জায়েয যে, গ্রাহক দু'টির যে কোন একটিকে নির্দিষ্টভাবে গ্রহণ করে নিতে হবে। যখন একবার মূল্য নির্ধারণ হয়ে যাবে তখন পরিশোধে বিলম্বের কারণে তাতে বৃদ্ধিও করা যাবে না এবং নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আদায়ের কারণে কমও করা যাবে না।

(৮) ক্রেতা সময়মত মূল্য পরিশোধ নিশ্চিতকল্পে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে যে, অনাদায়ের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অর্থ সে এমন কল্যাণ ফান্ডে

প্রদান করবে, যা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। এর পরিমাণ বার্ষিক পার্সেন্টিসের ভিত্তিতেও নির্ধারিত হতে পারে। কিন্তু এ অর্থ অবশ্যই প্রকৃত কল্যাণমূলক কাজেই ব্যয় করতে হবে। কোন অবস্থাতেই তাকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আয়ের অংশ হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

(৯) যথা সময়ের পূর্বে আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রাহক কোন রকম অবকাশের দাবি করতে পারবে না। তবে চুক্তিতে পূর্বশর্ত ব্যতীত আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্বীয় সন্তুষ্টিতে মূল্যের কিছু অংশ মাফ করতে পারে।

ইজারা

"ইজারা" ইসলামী ফিক্‌হের একটি পরিভাষা। যার আভিধানিক অর্থ কোন জিনিস ভাড়ায় প্রদান করা। ইসলামী ফিক্‌হের পরিভাষায় "ইজারা" পৃথক দু'টি পদ্ধতির জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রথম পদ্ধতিতে ইজারা অর্থ কোন ব্যক্তি থেকে শ্রম গ্রহণ করা যার বিনিময়ে তাকে বেতন-ভাতা প্রদান করা হয়। শ্রম গ্রহণকারীকে "মুছ্‌তাজির" (ইজারাদার) এবং শ্রমদাতাকে "আজীর" (শ্রমিক) বলা হয়। সুতরাং "ক" যদি "খ"কে তার অফিসে মাসিক বেতনের ভিত্তিতে ম্যানেজার বা ক্লার্ক হিসেবে রাখে, তাহলে "ক"কে ইজারাদার এবং "খ"কে শ্রমিক বলা হবে। এমনিভাবে "ক" যদি কোন কুলি (পোর্টার) থেকে শ্রম গ্রহণ করে, যাতে করে সে তার মালামাল এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পৌঁছেয়ে দেয়, তাহলে "ক" হবে ইজারাদার এবং কুলি হবে শ্রমিক। উভয় উদাহরণে পক্ষদ্বয়ের মাঝে সাব্যস্তকৃত লেনদেনকে "ইজারা" বলা হবে। এই প্রকারের ইজারায় ঐসব লেনদেন অন্তর্ভুক্ত যে লেনদেনে কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তি থেকে শ্রম বা সেবা (Service) গ্রহণ করে। যার থেকে শ্রম বা সেবা গ্রহণ করা হয় সে কোন ডাক্তার, আইনজীবী, শিক্ষক, মজদুর বা এমন কোন ব্যক্তি হতে পারে, যে এমন কোন সেবা প্রদান করতে সক্ষম যার কোন মূল্য ধার্য করা যেতে পারে। ইসলামী ফিক্‌হের পরিভাষা অনুযায়ী তাদের প্রত্যেককেই "শ্রমিক" বলা যাবে এবং যারা সেবা গ্রহণ করে তাদেরকে ইজারাদার বলা হবে। আর শ্রমিককে প্রদেয় বেতন-ভাতাকে "পারিশ্রমিক" বলা হবে।

"ইজারা"র দ্বিতীয় প্রকারের সম্পর্ক মানবীয় সেবার সাথে নয়, বরং আসবাবপত্র এবং সম্পদের সুবিধা ভোগের (ব্যবহারের অধিকারের) সাথে। এই দৃষ্টিতে "ইজারা" অর্থ "মালিকানাধীন কোন নির্দিষ্ট জিনিসের

সুযোগ-সুবিধা (Usufructs) অপর কোন ব্যক্তির নিকট এমন কোন ভাড়ার বিনিময়ে হস্তান্তর করা যা তার থেকে দাবি করা যায়।" এই পদ্ধতিতে "ইজারা" পরিভাষাটি ইংরেজী Leasing পরিভাষার সাদৃশ্য হয়ে যাবে। ইজারাদাতা বা ভাড়ায় প্রদানকারীকে (Lessor) "মুজির" (ইজারাদার) বলা হয় এবং ভাড়া গ্রহণকারীকে (Lessee) "মুছ্তাজির" আর মুজিরকে যে ভাড়া প্রদান করা হয় তাকে "উজরত" বলা হয়।

উভয় প্রকারের ইজারা সম্পর্কে ইসলামী ফিক্হের গ্রন্থাবলীতে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং এগুলোর প্রত্যেকটিরই স্বীয় নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধান রয়েছে। কিন্তু বক্ষমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য দ্বিতীয় প্রকারের সাথে বেশি সম্পৃক্ত। কেননা, তাকে সাধারণত পুঁজি বিনিয়োগ এবং অর্থায়নের পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

লিজিং-এর অর্থে ইজারার বিধি-বিধান ক্রয়-বিক্রয়ের বিধি-বিধানের সাথে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। কেননা, উভয় ক্ষেত্রে কোন জিনিস অপর ব্যক্তির নিকট মূল্যের বিনিময়ে হস্তান্তর করা হয়। ক্রয়-বিক্রয় এবং ইজারার মাঝে পার্থক্য শুধুমাত্র এই যে, ক্রয়-বিক্রয়ে সম্পদ স্বত্বাগতভাবে ক্রেতার মালিকানায় চলে যায় আর ইজারায় সম্পদ স্বয়ং ভাড়া প্রদানকারীর মালিকানায় থাকে। ইজারাদারের দিকে শুধুমাত্র তা ভোগ-ব্যবহার করার অধিকার হস্তান্তর হয়।

এ কারণে সহজেই মন্তব্য করা যায় যে, ইজারা প্রকৃতিগতভাবে কোন অর্থায়ন পদ্ধতি নয়। বরং তা ক্রয়-বিক্রয়ের ন্যায় সাধারণ একটি ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড। এতদ্সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে বিশেষ করে তাতে ট্যাক্স থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার যে সুযোগ সুবিধা রয়েছে, সে সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে পাশ্চাত্য দেশসমূহে তাকে অর্থায়নের জন্যও ব্যবহার করা হয়। কোন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান নির্ভেজাল সুদি ঋণ প্রদানের পরিবর্তে কোন কোন পণ্য তাদের গ্রাহককে লীজের ভিত্তিতে দিচ্ছে। এসব পণ্যের ভাড়া নির্ধারণের সময় আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঐ সামগ্রিক ব্যয়ের হিসাবও সংযোজন করে, যা উক্ত পণ্য ক্রয়ের ব্যাপারে তাদের বহন করতে হয়েছে এবং তাতে সেই নির্দিষ্ট সুদও সংযোজন করে দেয়া হয়, যা লীজের সময় কালে ব্যাংক

উক্ত অর্থ দ্বারা গ্রহণ করতে পারত। এই পদ্ধতিতে হিসাবকৃত সামগ্রিক অর্থকে লীজ (ভাড়া) চলাকালীন মাসের উপর বণ্টন করা হয় এবং সে অনুপাতে মাসিক ভাড়া ধার্য করে নেয়া হয়।

লীজকে শরীয়তের দৃষ্টিতে অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে কি না, এ প্রশ্ন লীজ চুক্তির শর্তের উপর নির্ভরশীল।

যেরূপ পূর্বে বিবৃত হয়েছে যে, লীজ একটি সাধারণ ব্যবসায়িক চুক্তি, অর্থায়ন পদ্ধতি নয়। এজন্য শরীয়ত ইজারার জন্য যেসব বিধি-বিধান বর্ণনা করেছে তা লীজের উপরও প্রযোজ্য হবে। সুতরাং ইসলামী ফিক্‌হে লীজ সংক্রান্ত বর্ণিত বিধি-বিধানের উপর আমাদের আলোচনা করা উচিত।

এরপর আমরা বুঝতে পারব কোন্ শর্তসাপেক্ষে ইজারাকে অর্থায়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে।

যদিও "ইজারা"র উসূল এত বেশি যে, সেগুলোর জন্য পৃথক একটি ভলিয়মের প্রয়োজন। আমরা এই অধ্যায়ে শুধুমাত্র ঐসব মৌলিক নীতিমালাকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করব, যা এই চুক্তির ধরন বুঝার জন্য জানা অপরিহার্য এবং যেগুলোর সাধারণত আধুনিক আর্থিক কর্মকাণ্ডে প্রয়োজন অনুভব হয়। এই নীতিমালাসমূহ এখানে সংক্ষিপ্ত নোটের আকৃতিতে বর্ণনা করা হচ্ছে, যাতে পাঠকগণ সেগুলোকে সংক্ষিপ্ত সূত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

লীজিং (ইজারা)-এর মৌলিক বিধি-বিধান

(১) লীজিং এমন একটি চুক্তি যে চুক্তির মাধ্যমে কোন সম্পদের মালিক নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে উক্ত সম্পদ ব্যবহারের অধিকার অপর ব্যক্তির নিকট অর্পণ করে।

(২) লীজের জন্য নির্বাচিত সম্পদ মূল্যবান ও ভোগ-ব্যবহারের উপযোগী হতে হবে, সুতরাং যে জিনিস ব্যবহার উপযোগী নয় তা লীজের ভিত্তিতে দেয়া যাবে না।

(৩) লীজ সঠিক হওয়ার জন্য অপরিহার্য হল, লীজের ভিত্তিতে প্রদেয় সম্পদের মালিকানা ইজারাদাতারই (Lessor) থাকবে। ইজারাদারের (Lessee) দিকে শুধুমাত্র ব্যবহারের অধিকার অর্পণ হবে। সুতরাং প্রত্যেক এমন জিনিস যেগুলো খরচ করা ব্যতীত (অর্থাৎ, হাতছাড়া করা ব্যতীত) ব্যবহার করা যায় না, সেগুলোর লীজও হবে না। একারণে নগদ অর্থ, খাওয়া-পান করার বস্তু, লাকড়ি এবং গোলা-বারুদ ইত্যাদির লীজ সম্ভব নয়। কেননা, এগুলোকে খরচ করা ব্যতীত এগুলোর ব্যবহার সম্ভব নয়। যদি এ ধরনের কোন জিনিস লীজের ভিত্তিতে প্রদান করা হয়, তাহলে তাকে একটি ঋণ মনে করা হবে এবং ঋণের সকল বিধি-বিধান তার উপর প্রযোজ্য হবে। এই অবৈধ লীজের উপর যে ভাড়া নেয়া হবে তা ঋণের উপর গৃহীত সুদ হবে।

(৪) লীজের ভিত্তিতে প্রদেয় সম্পদ স্বত্বাগতভাবে যেহেতু ইজারাদাতার (Lessor) মালিকানায় থাকে, সেহেতু মালিকানার কারণে উদ্ভাবিত দায়িত্বসমূহও সে নিজেই বহন করবে, কিন্তু তা ব্যবহারের সাথে সম্পৃক্ত দায়িত্বসমূহ ইজারাদার (Lessee) বহন করবে। যেমন ঃ "ক" তার বাড়ি "খ" এর নিকট ভাড়া হিসেবে প্রদান করেছে, এই বাড়ির উপর অর্পিত ট্যাক্স "ক"-এর দায়িত্বে থাকবে, পক্ষান্তরে পানি, বিদ্যুৎ বিল এবং বাড়ি ব্যবহারের কারণে অন্যান্য খরচাদি "খ" অর্থাৎ ইজারাদারের দায়িত্বে থাকবে।

(৫) লীজের মেয়াদ নির্ধারণ সুস্পষ্টভাবে হতে হবে।

(৬) লীজ চুক্তিতে যে উদ্দেশ্যে লীজ নেয়া হয়েছে ইজারাদার সেই সম্পদকে তাছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারবে না। চুক্তিতে যদি কোন উদ্দেশ্য নির্ধারিত না হয়, তাহলে ইজারাদার তাকে ঐসব উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারবে যে উদ্দেশ্যের জন্য সাধারণত তা ব্যবহার করা হয়। সে যদি তা অসাধারণ কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চায় (যার জন্য সাধারণত ঐ জিনিস ব্যবহৃত হয় না) তাহলে সে এমন কাজে ইজারাদাতার (মালিকের) সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত তা ব্যবহার করতে পারবে না।

(৭) ইজারাদারের পক্ষ হতে সেই জিনিসের অসৎ ব্যবহার কিংবা উদাসীনতা এবং অসতর্কতার কারণে যে ক্ষয়-ক্ষতি হবে, ইজারাদার তার ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায়িত্ব বহন করবে।

(৮) লীজের ভিত্তিতে প্রদেয় সম্পদ লীজ চলাকালীন সময়ে ইজারাদাতার (Lessor) দায়ভারে (Risk) থাকবে। যার অর্থ হল, ইজারাদারের (Lessee) কোনরূপ অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ব্যতীত যদি কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে যায়, তাহলে এই ক্ষয়-ক্ষতি ইজারাদাতা (মালিক) বহন করবে।

(৯) দুই বা ততোধিক ব্যক্তির যৌথ মালিকানা সম্পদও লীজের ভিত্তিতে দেয়া যাবে এবং ভাড়া মালিকদের মাঝে মালিকানায় তাদের অংশ অনুপাতে বণ্টন হবে।

(১০) যে ব্যাক্তি কোন সম্পদের মালিকানায় অংশীদার হবে, সে তার আনুপাতিক অংশ স্বীয় অপর অংশীদারকেই ভাড়া দিতে পারবে অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদান করতে পারবে না।[১]

(১১) লীজ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য জরুরী হল, লীজের ভিত্তিতে প্রদেয় সম্পদ উভয়পক্ষের জন্য পরিষ্কারভাবে নির্ধারিত হতে হবে।

যেমন ঃ "ক" "খ"কে বলল, আমি তোমার কাছে আমার দু'টি দোকান থেকে একটি ভাড়া দিচ্ছি। "খ"ও যদি তার সাথে একমত পোষণ করে, তাহলে এই ইজারা বাতিল বলে গণ্য হবে, কিন্তু যদি দু'টি দোকানের যে কোন একটিকে নির্দিষ্ট এবং চিহ্নিত করে নেয়, (তাহলে শুদ্ধ হবে)।

ভাড়া নির্ধারণ

(১২) লীজের পূর্ণ মেয়াদের জন্য চুক্তির সময়ই ভাড়া নির্ধারিত হতে হবে।

---

১. ইব্ন আবেদীন, রাদ্দুল মুখতার, ৬/৪৭,৪৮।

লীজের মেয়াদের বিভিন্ন ধাপের জন্য ভাড়ার বিভিন্ন পরিমাণ ধার্য করাও জায়েয আছে। কিন্তু শর্ত হল প্রত্যেক ধাপের ভাড়ার পরিমাণ লীজের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হওয়ার সময়ই পরিপূর্ণভাবে নির্ধারিত হতে হবে। যদি পরবর্তীতে আগত কোন ধাপের ভাড়া ধার্য না করে তাকে ইজারাদাতার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে এই ইজারা সঠিক হবে না।

যেমন ঃ (১) "ক" তার বাড়ি পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য "খ"কে ভাড়া দিচ্ছে প্রথম বছরের ভাড়া মাসিক দু'হাজার টাকা ধার্য করা হয়েছে এবং এ কথাও সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, প্রত্যেক সামনের বছরের ভাড়া পিছনের বছরের ভাড়ার তুলনায় দশ পার্সেন্ট বেশি হবে, তাহলে এই ইজারা (Lease) শুদ্ধ হবে।

যেমন ঃ (২) উল্লেখিত উদাহরণে "ক" চুক্তিতে এ শর্তারোপ করেছে যে, মাসিক ভাড়া দু'হাজার টাকা শুধুমাত্র এক বছরের জন্য ধার্য করা হয়েছে, সামনের বছরসমূহের ভাড়া পরবর্তীতে ইজারাদাতার ইচ্ছানুযায়ী ধার্য করা হবে, তাহলে এই ইজারার ভাড়া অনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

(১৩) ভাড়া সেই সামগ্রিক ব্যয়ের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হবে যা ইজারাদাতার এই জিনিস ক্রয়ে বহন করতে হয়েছে। যেরূপ সাধারণত ইজারার অর্থায়নে (Financial Lease) হয়ে থাকে। এটাও শরীয়তের নীতিমালার পরিপন্থি নয়। তবে শর্ত হল, বৈধ ইজারার অন্যান্য শরয়ী শর্তের উপর পূর্ণভাবে আমল করতে হবে।

(১৪) ইজারাদাতা (Lessor) এককভাবে ভাড়া বৃদ্ধি করতে পারবে না এবং এ ধরনের শর্তকৃত চুক্তিও সঠিক হবে না।

(১৫) ভাড়ায় প্রদানকৃত সম্পদ ইজারাদারকে (Lessee) হস্তান্তর করার পূর্বে পূর্ণ ভাড়া বা তার কিছু অংশ অগ্রিমও আদায় করা যাবে। কিন্তু ইজারাদাতা এভাবে যে অর্থ গ্রহণ করবে তা On Account এর ভিত্তিতে আদায় হবে এবং ভাড়া পরিশোধ হওয়ার পর তা তাতে সংযুক্ত করে নেয়া হবে।

(১৬) ইজারার মেয়াদ ঐ তারিখ থেকে শুরু হবে, যে তারিখে ইজারায় প্রদেয় সম্পদ ইজারাদারের নিকট হস্তান্তর করা হবে, চাই সে তা ব্যবহার করা শুরু করুক বা না করুক।

(১৭) ইজারায় প্রদেয় সম্পদ যে উদ্দেশ্যে ভাড়া দেয়া হয়েছে যদি তা নষ্ট হয়ে যায় এবং তা মেরামত করাও সম্ভব না হয়, তাহলে ইজারা ঐ তারিখ থেকে বাতিল হয়ে যাবে যে তারিখে এ ধরনের ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। তদুপরি এই ক্ষয়-ক্ষতি যদি ইজারাদারের অসৎ ব্যবহার কিংবা উদাসীনতার কারণে হয়ে থাকে, তাহলে পণ্যের মূল্য যে পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে তা সে ইজারাদাতাকে পরিশোধের দায়িত্ব বহন করবে। অর্থাৎ, ক্ষয়-ক্ষতির সামান্য পূর্বে এর মূল্য কত ছিল এবং এখন ক্ষয়-ক্ষতির পর কত দাঁড়িয়েছে তা দেখা হবে ।

ইজারা পদ্ধতিতে অর্থায়ন (অর্থসংস্থানের নিমিত্তে ইজারা)

মুরাবাহার ন্যায় ইজারাও (Lease) প্রকৃতগতভাবে অর্থায়ন পদ্ধতি নয়, বরং এটা একটি সাধাসিধা চুক্তি, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন জিনিসের ব্যবহারের অধিকার এক ব্যক্তি থেকে অপর ব্যক্তির দিকে নির্ধারিত ভাড়ার বিনিময়ে হস্তান্তর করা। তদুপরি কোন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান সুদভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদানের পরিবর্তে লীজকে অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা আরম্ভ করেছে। এ ধরনের লীজকে সাধারণত ইজারার অর্থায়ন (Financial Lease) বলা হয়, যা বাস্তবিক ইজারা (Operational Lease) থেকে ভিন্ন ধরনের এবং তাতে (অর্থাৎ ফিন্যান্সিয়াল লীজে) বাস্তবিক ইজারার অনেক বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করা হয়।

সম্প্রতিকালে যখন সুদবিহীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন তারা অনুভব করল যে, লীজ সারা বিশ্বে সর্বস্বীকৃত একটি অর্থায়ন পদ্ধতি। অপরদিকে তারা এ হাক্বীকৃতও অনুভব করল যে, লীজ শরয়ীতের দৃষ্টিতে একটি বৈধ চুক্তি, তাকে সুদবিহীন অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এ কারণে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান লীজকে গ্রহণ করা শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু অনেক কম প্রতিষ্ঠানই এদিকে লক্ষ্য রেখেছে যে,

ইজারার অর্থায়নে এমন অনেক বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় যা বাস্তবিক ইজারার পরিবর্তে একেবারে সুদের সাদৃশ্য হয়ে যায়। এ কারণেই তারা কোনরূপ পরিবর্তন করা ব্যতীত লীজ চুক্তির সেই মডেলকেই ব্যবহার করা শুরু করে দিয়েছে, যা আধুনিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত ছিল, অথচ তাদের অনেক কর্মকাণ্ড শরীয়তসম্মত নয়।

পূর্বে যেরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, লীজ তার প্রকৃতিগতভাবে অর্থায়ন পদ্ধতি নয়, তদুপরি নির্দিষ্ট কতগুলো শর্তসাপেক্ষে এই চুক্তিকে অর্থায়নের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু এ উদ্দেশ্যের জন্য সুদের (Interest) পরিবর্তে ভাড়া (Rent) এবং বন্ধকের (Mortgage) পরিবর্তে লীজের ভিত্তিতে প্রদেয় সম্পদের নাম ব্যবহার করাই যথেষ্ট নয়, বরং লীজিং এবং সুদি ঋণের মাঝে প্রয়োগিক পার্থক্য হতে হবে। এ পার্থক্য তখনই সম্ভব যখন লীজ সংক্রান্ত ইসলামী সমুদয় নীতিমালার অনুসরণ করা হবে, যেসব নীতিমালার আংশিক এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে বর্ণনা করা হয়েছে।

আরো সুস্পষ্ট হওয়ার জন্য বর্তমানে প্রচলিত ইজারার অর্থায়ন পদ্ধতি (Financial Lease) এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কার্যকর লীজের মাঝে কয়েকটি মৌলিক পার্থক্য নিম্নে বর্ণনা করা হচ্ছে।

(১) ক্রয়-বিক্রয়ে চুক্তির বিপরীত ইজারা ভবিষ্যতের যে কোন তারিখ থেকেও কার্যকর হতে পারে।[১] সুতরাং ফরওয়ার্ডসেল তো শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয কিন্তু ভবিষ্যতের কোন তারিখের সাথে সম্পৃক্ত ইজারা জায়েয আছে, এ শর্তের সাথে যে, ভাড়া ঐ সময় পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে যখন ইজারায় প্রদেয় সম্পদ ইজারাদারের (Lessee) নিকট হস্তান্তর করা হবে।

ফিন্যান্সিয়াল লীজের অনেক ক্ষেত্রে ইজারাদাতা অর্থাৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান সেই পণ্যকে স্বয়ং ইজারাদারের (Lessee) মাধ্যমে ক্রয় করে। ইজারাদার সে পণ্য ইজারাদাতার পক্ষ হতে ক্রয় করে এবং তার মূল্য

১. রাদ্দুল মুখতার, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা নং- ৬৪।

সরবরাহকারীকে (Supplier) পরিশোধ করে। কখনো কখনো মূল্য ইজারাদাতা সরাসরি পরিশোধ করে আবার কখনো কখনো ইজারাদারের মাধ্যমে পরিশোধ করে। লীজের কোন কোন চুক্তিতে লীজ ঐদিন থেকেই শুরু হয়ে যায়, যেদিন ইজারাদাতা মূল্য পরিশোধ করে, এ দিকে লক্ষ্য করা হয় না যে, ইজারাদার মূল্য সরবরাহকারীকে পরিশোধ করে পণ্য কব্জা করছে কি না। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ইজারাদারের ইজারার ভিত্তিতে গৃহীত পণ্য কব্জা করার পূর্বেই তার উপর ভাড়ার দায়িত্ব শুরু হয়ে যায়, আর এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয। কেননা, তা গ্রাহককে প্রদেয় অর্থের উপর ভাড়া গ্রহণ করার সাদৃশ্য হয়ে যায়, যা নির্ভেজাল এবং খাঁটি সুদ।

শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক পদ্ধতি হল, ভাড়া ঐ তারিখ হতে গ্রহণ করা হবে যেদিন থেকে ইজারাদার ইজারার সম্পদ কব্জা করবে। যে তারিখে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে সে তারিখ থেকে নয়। সরবরাহকারী যদি মূল্য গ্রহণ করার পর পণ্য সরবরাহে বিলম্ব করে, তাহলে ইজারাদার বিলম্বের সময়ের ভাড়া প্রদানের দায়িত্ব বহন করবে না।

উভয়পক্ষের মাঝে বিভিন্ন সম্পর্ক

(২) এ কথা পরিষ্কারভাবে বুঝে নিতে হবে যে, যখন ইজারায় প্রদেয় সম্পদ ক্রয়ের দায়িত্ব স্বয়ং ইজারাদারকে দেয়া হবে, তখন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং গ্রাহকের মাঝে পৃথক দু'টি সম্পর্ক স্থাপন হবে, যা পর্যায়ক্রমে কার্যকর হবে। প্রথম ধাপে গ্রাহক ঐ পণ্য ক্রয়ের ব্যাপারে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উকিল হিসেবে নিযুক্ত হবে। এই ধাপে উভয়ের মাঝে উকিল এবং মুআক্কেলের চেয়ে অধিক কোন সম্পর্ক হয় না। ইজারাদাতা এবং ইজারাদার হিসেবে সম্পর্ক এখনো কার্যকর হয়নি।

দ্বিতীয় ধাপ ঐ তারিখ থেকে শুরু হবে, যখন গ্রাহক সরবরাহকারী থেকে পণ্য কব্জা করে নিবে। এই ধাপে ইজারাদাতা এবং ইজারাদারের সম্পর্ক কার্যকর হবে।

উভয় পক্ষের এই পৃথক দুই দিককে পরস্পরে তালগোল পাকানো যাবে না। প্রথম ধাপ চলাকালীন গ্রাহকের উপর ইজারাদারের দায়িত্ব অর্পিত হবে না। এই ধাপে সে শুধুমাত্র একজন উকিল হিসেবে দায়িত্বশীল হবে। তবে পণ্য যখন তার কব্জায় দিয়ে দেয়া হবে, তখন সে ইজারাদার হিসেবে তার দায়িত্বশীল হবে।

তদুপরি এখানে মুরাবাহা এবং লীজিং-এর মাঝে একটি পার্থক্য রয়েছে, পূর্বে যেরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয় তখনই সংঘটিত হয়, যখন গ্রাহক সরবরাহকারী থেকে পণ্য কব্জা করে নেয় এবং মুরাবাহার পূর্ব চুক্তি ক্রয়-বিক্রয় কার্যকর হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। সুতরাং উকিল হিসেবে পণ্যটি কব্জা করার পর গ্রাহক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই এ ব্যাপারে অবগত করবে এবং তা ক্রয়ের জন্য প্রস্তাবও (Offer) পেশ করবে। ক্রয়-বিক্রয় তখন সংঘটিত হবে যখন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করবে।

লীজিং-এ কর্মপদ্ধতি এর থেকে ভিন্ন এবং কিছুটা সংক্ষিপ্ত। ইজারা চুক্তির ব্যাপারে উভয়পক্ষের কব্জা করার প্রয়োজন নেই, বরং আর্থিক প্রতিষ্ঠান যদি গ্রাহককে তার উকিল নিয়োগের সময় কব্জার তারিখ থেকে ঐ সম্পদ ইজারার ভিত্তিতে প্রদান করার ব্যাপারে একমত পোষণ করে নেয়, তাহলে ইজারা ঐ তারিখ থেকে নিজে নিজেই শুরু হয়ে যাবে।

মুরাবাহা এবং ইজারার মাঝে এই পার্থক্যের কারণ দু'টি।

প্রথম কারণ হল, ক্রয়-বিক্রয় সঠিক হওয়ার জন্য শর্ত হল তা সাথে সাথে কার্যকর হতে হবে। সুতরাং ভবিষ্যতের কোন তারিখের সাথে সম্পৃক্ত ক্রয়-বিক্রয় শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক হবে না। কিন্তু ইজারা ভবিষ্যতের যে কোন তারিখের দিকেও সম্পৃক্ত হতে পারে। সুতরাং মুরাবাহার ক্ষেত্রে পূর্ব চুক্তি যথেষ্ট নয়, পক্ষান্তরে লীজিং-এ তা একেবারে যথেষ্ট।

দ্বিতীয় কারণ হল, শরীয়তের মৌলিক নীতিমালা হল কোন ব্যক্তি এমন জিনিসের মুনাফা কিংবা ফিস গ্রহণ করতে পারে না, যার দায়ভার (রিস্ক) সে বহন করেনি।

এ নীতিমালাকে মুরবাহার উপর প্রয়োগ করলে বিক্রেতা এমন জিনিসের উপর মুনাফা গ্রহণ করতে পারে না, যা এক মুহূর্তের জন্যেও তার দায়ভারে (রিস্কে) আসেনি। কেননা, গ্রাহক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাঝে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার জন্য পূর্বচুক্তিকে যথেষ্ট বলা হলে এই পণ্য ঐ সময় গ্রাহকের দিকে হস্তান্তর হয়ে যাবে যখন সে তা কব্জা করবে এবং উক্ত পণ্য এক মুহূর্তের জন্যেও বিক্রেতার দায়ভারে আসবে না। এ কারণেই মুরাবাহায় একই সময়ে হস্তান্তর সম্ভব নয়, যার কারণে তাতে কব্জা করার পর নতুন করে ইজাব-কবুল (প্রস্তাব ও প্রস্তাব গ্রহণ) হওয়া অপরিহার্য।

লীজিং-এর ক্ষেত্রে লীজ চলাকালীন পূর্ণ সময়ের মাঝে সে সম্পদ ইজারাদারের (Lessor) মালিকানায় এবং তার দায়ভারে থাকে। কেননা, তাতে মালিকানা পরিবর্তন হয় না। সুতরাং লীজিং-এর মেয়াদ যদি একেবারে সেই সময় থেকে শুরু হয়ে যায় গ্রাহক যখন পণ্য কব্জা করেছে, তাহলে তাতেও উপরোল্লেখিত নীতিমালার পরিপন্থি হবে না।

মালিকানার কারণে বহনকৃত ব্যয়

(৩) ইজারাদার যেহেতু ঐ পণ্যের মালিক এবং সে তার উকিলের মাধ্যমে তা ক্রয় করেছে, সেহেতু তার ক্রয় ও মালিকানা গ্রহণের ব্যাপারে যাবতীয় ব্যয়ভারের দায়িত্বও সে বহন করবে। সুতরাং কাস্টম ডিউটি এবং মালের ভাড়া ইত্যাদির ব্যয়ভারও সেই বহন করবে। সে এই ব্যয়সমূহকে খরচে সংযুক্ত করে ভাড়া নির্ধারণের ব্যাপারে সেগুলোর দিকেও লক্ষ্য রাখতে পারবে, কিন্তু মূলত সে মালিক হওয়ার সুবাদে ঐসব ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব তার উপর। যে সব চুক্তি এর পরিপন্থি হবে যেমন আধুনিক ফিন্যান্সিয়াল লীজে হয়ে থাকে, তা শরীয়তসম্মত হবে না।

ক্ষয়-ক্ষতির সময় উভয়পক্ষের দায়-দায়িত্ব

(৪) লীজিং-এর মৌলিক বিধি-বিধান প্রসংগে পূর্বে বিবৃত হয়েছে যে, ইজারাদারের (Lessee) অসৎ ব্যবহার কিংবা উদাসীনতার কারণে সম্পদে

যে সব ক্ষয়-ক্ষতি হবে, ইজারাদার সে সব ক্ষয়-ক্ষতির ব্যাপারে দায়িত্ব বহন করবে। সাধারণ ব্যবহারের কারণে যে সব ক্ষয়-ক্ষতি হবে, ইজারাদারকে তার ব্যাপারেও দায়ি বানানো যাবে কিন্তু তার ক্ষমতার বাইরের ক্ষয়-ক্ষতির ব্যাপারে তাকে দায়ি করা যাবে না। আধুনিক ফিন্যান্সিয়াল লীজে (Financial Lease) সাধারণত এই দু'প্রকারের ক্ষয়-ক্ষতির মাঝে কোন পার্থক্য করে না। ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত লীজে উভয় প্রকারের মাঝে পার্থক্য করতে হবে।

দীর্ঘমেয়াদী লীজে পরিবর্তনীয় ভাড়া

(৫) দীর্ঘমেয়াদী লীজ চুক্তিতে লীজের পূর্ণ মেয়াদের জন্য ভাড়ার একটি হার নির্ধারণ করা সাধারণত ইজারাদাতার (Lessor) জন্য লাভজনক হয় না। কেননা মার্কেটের অবস্থা সময়ে সময়ে পরিবর্তন হতে থাকে, এমতাবস্থায় ইজারাদাতা দু'টি পদ্ধতির যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে।

(ক) সে লীজ চুক্তি এ শর্তসাপেক্ষে করবে যে, নির্দিষ্ট সময়ের পর (যেমন এক বছর পর) ভাড়া বিশেষ অনুপাতে (যেমন পাঁচ পার্সেন্ট) বৃদ্ধি করে দেয়া হবে।

(খ) সে একটি স্বল্প মেয়াদের জন্য লীজ-চুক্তি সম্পাদন করবে। মেয়াদান্তে উভয় পক্ষ পারস্পরিক সম্মতিতে নতুন শর্তে লীজ নবায়ন করবে। এ ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের যে কেউ নতুন লীজ চুক্তি প্রত্যক্ষান করার ব্যাপারে স্বাধীন থাকবে। এমতাবস্থায় ইজারাদার (Lessee) ইজারাদাতাকে (Lessor) লীজের ভিত্তিতে গৃহীত জিনিস অবশ্যই খালি করে ফেরত দিয়ে দিবে।

এ দু'টি পদ্ধতি পূর্ববর্তী ফিক্হী বিধি-বিধানের ভিত্তিতে। সমকালীন কোন কোন আলিম দীর্ঘমেয়াদী লীজে এ কথারও অনুমতি প্রদান করেন যে, ভাড়ার পরিমাণকে এমন পরিবর্তনীয় মাপকাঠির (Benchmark) সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে যা ভালোভাবে পরিজ্ঞাত হবে। সে বিষয়কে উত্তমরূপে

সুস্পষ্ট করে দেয়া হবে যাতে ঝগড়ার কোন সম্ভাবনা বিদ্যমান না থাকে। যেমন ঐসব আলিমের নিকট লীজ চুক্তিতে এ শর্তারোপ করা জায়েয আছে যে, যদি সরকারের পক্ষ হতে ইজারাদারের উপর ধার্যকৃত ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে ভাড়ায়ও সে অনুপাতে বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। এমনিভাবে ঐসব আলিম এ অনুমতিও প্রদান করেন যে, ভাড়ায় বার্ষিক বৃদ্ধিকে মুদ্রার মূল্যমানের হারের সাথে সংযুক্ত করা যাবে। সুতরাং মুদ্রার মূল্যমানের হার যদি পাঁচ পার্সেন্ট হয়, তাহলে ভাড়ায়ও পাঁচ পার্সেন্ট বৃদ্ধি হয়ে যাবে।

এই নীতিমালার ভিত্তিতে কোন কোন ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত সুদের হারকে ভাড়া নির্ধারণের জন্য মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করে। এই ব্যাংক লীজিং-এর মাধ্যমে সেই পরিমাণ মুনাফা অর্জন করতে চায়, যে পরিমাণ আধুনিক ব্যাংক সুদি ঋণ প্রদান করে অর্জন করে। এজন্য তারা ভাড়ার হারকে সুদের হারের সাথে সম্পৃক্ত করে নেয় এবং ভাড়ার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ধার্য করার পরিবর্তে তারা লীজের ভিত্তিতে প্রদেয় সম্পদ ক্রয়-ব্যয়ের হিসাব করে এবং তারা চায় যে, সম্পদের ভাড়ার দ্বারা ঐ পরিমাণ অর্থ উপার্জন করবে যা সুদের হারের সমান হবে কিংবা সুদের হারের চেয়ে কিছু বেশি হবে। যেহেতু সুদের হার পরিবর্তন হতে থাকে, সেহেতু লীজের পূর্ণ মেয়াদের জন্য ভাড়া নির্ধারণ করা যায় না। এ কারণে ঐসব চুক্তিতে কোন বিশেষ শহরের সুদের হারকে মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেমন (LIBOR কে[১])

এ ব্যবস্থাপনার উপর দু'টি মৌলিক আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে।

প্রথম এই আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে যে, ভাড়া পরিশোধকে সুদের হারের সাথে সম্পৃক্ত করার দ্বারা এই লেনদেন সুদি অর্থায়নেরই সাদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। এই অভিযোগের জবাব এরূপ দেয়া যেতে পারে, যেমনিভাবে মুরাবাহায় বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, সুদের হারকে তো শুধুমাত্র মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। যে

---

১. London Inter Bank Offered Rate. এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা মুরাবাহার অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে।

যাবৎ বৈধ ইজারার জন্য শরীয়তের কাংখিত শর্তসমূহ পূর্ণ করা হবে, সে যাবৎ চুক্তিতে ভাড়া নির্ধারণের জন্য যে কোন মাপকাঠিকে ব্যবহার করা যাবে। সুদি অর্থায়ন এবং বৈধ ইজারার (Lease) মাঝে পার্থক্য এই পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, যা অর্থায়নকারী কিংবা ইজারাদাতাকে পরিশোধ করা হবে, বরং বুনিয়াদি পার্থক্য হল, লীজের ক্ষেত্রে লীজ প্রদানকারী লীজের ভিত্তিতে প্রদেয় জিনিসের পূর্ণ ঝুঁকি (Risk) বহন করতে হবে। যদি লীজের ভিত্তিতে প্রদেয় সম্পদ লীজ চলাকালীন সময়ে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে এই ক্ষয়-ক্ষতি ইজারাদাতা (Lessor) বহন করবে। এমনিভাবে যদি ইজারাদারের অসৎ ব্যবহার কিংবা তার উদাসীনতা ও অসতর্কতা ব্যতীত সেই সম্পদের সুযোগ-সুবিধা নষ্ট হয়ে যায় (অর্থাৎ, যে উদ্দেশ্যের জন্য তা ভাড়া নেয়া হয়েছিল সে উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহার উপযোগী না থাকে) তাহলে ইজারাদাতা (Lessor) ভাড়া দাবি করতে পারবে না। পক্ষান্তরে সুদি অর্থায়নে অর্থসংস্থানকারীকে (Financier) সর্বাবস্থায় সুদের হকদার মনে করা হয়, যদিও ঋণগ্রহীতা ঋণ হিসেবে গৃহীত অর্থ দ্বারা কোন লাভবান নাও হয়। যে যাবৎ এই মৌলিক পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য রাখা হবে (অর্থাৎ ইজারাদাতা লীজের সম্পদের ঝুঁকি বহন করবে) সে যাবৎ এই চুক্তিকে সুদি চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। যদিও ইজারাদার থেকে গৃহীত ভাড়ার টাকা সুদের হারের সমান হয়।

সুতরাং একথা সুস্পষ্ট যে, সুদের হারকে শুধুমাত্র মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করার দ্বারা এই লেনদেন সুদি ঋণের ন্যায় নাজায়েয হবে না। যদিও সুদের হারকে মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকাও উত্তম, যাতে একটি ইসলামী লেনদেন এবং অনৈসলামিক লেনদেনের মাঝে পরিপূর্ণভাবে বৈসাদৃশ্য হয়ে যায় এবং সুদের সাথে কোনরূপ সাদৃশ্যতা না থাকে।

এই ব্যবস্থাপনার উপর দ্বিতীয় অভিযোগ হল, যেহেতু সুদের হারে পরিবর্তনীয় পরিমাণ সম্পর্কে পূর্ব থেকে জানা থাকে না, সেহেতু যে ভাড়া এর সাথে সম্পৃক্ত হবে তাতেও অস্পষ্টতা এবং ধোঁকা পাওয়া যাবে যা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। শরীয়তের মৌলিক চাহিদা হল, কোন

চুক্তিতে অন্তর্ভুক্তির সময় উভয় পক্ষের বিনিময় সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। এই বিনিময় লীজ চুক্তিতে সেই ভাড়া যা ইজারাদার (Lessee) থেকে গ্রহণ করা হয়। সুতরাং এই ভাড়া লীজ চুক্তির একেবারে প্রারম্ভে উভয় পক্ষের জানা থাকতে হবে। আমরা যদি ভাড়াকে ভবিষ্যতের সুদের হারের সাথে সম্পৃক্ত করি যা বর্তমানে অজানা, তাহলে ভাড়াও অজানা হয়ে যাবে। এই অস্পষ্টতা এবং ধোঁকার কারণে চুক্তি বিশুদ্ধ থাকে না।

এই অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে কেউ এ কথা বলতে পারেন যে, অস্পষ্টতা দু'কারণে নিষিদ্ধ। প্রথম কারণ হল, অস্পষ্টতা উভয় পক্ষের মাঝে কলহ-কোন্দল সৃষ্টির কারণ হয়, আর তা এখানে পাওয়া যায় না। কেননা, এখানে উভয় পক্ষ পারস্পরিক সম্মতিক্রমে এমন একটি সুস্পষ্ট মাপকাঠির উপর একমত পোষণ করেছে, যা ভাড়া নির্ধারণের জন্য মাপকাঠির কাজে আসবে এবং এর ভিত্তিতে যে কোন ভাড়াই নির্ধারণ করা হবে, তা উভয়পক্ষের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে, এ কারণে উভয়পক্ষের মাঝে কলহ-কোন্দলের কোন প্রশ্নই সৃষ্টি হয় না।

অস্পষ্টতার (ভাড়া জানা না থাকার) দ্বিতীয় কারণ হল, অস্পষ্টতার কারণে উভয়পক্ষের অপ্রত্যাশিত লোকসান দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকবে। কেননা, বিশেষ কোন সময়ে সুদের হার অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এমতাবস্থায় ইজারাদারের লোকসান হবে। এমনিভাবে বিশেষ কোন সময়ে সুদের হার অপ্রত্যাশিত সীমা পর্যন্ত হ্রাস পাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। এমতাবস্থায় ইজারাদারের লোকসান হবে। এই সম্ভাব্য লোকসানের আশংকা থেকে বাঁচার জন্য সমকালীন কোন কোন আলিম এই প্রস্তাব পেশ করেছেন যে, ভাড়া এবং সুদের হারের সংযোগ এবং সম্পর্ককে বিশেষ সীমা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে দেয়া হবে। উদাহরণস্বরূপ চুক্তিতে এ ধারা রাখা যেতে পারে যে, বিশেষ মেয়াদের পর সুদের হারের পরিবর্তন অনুপাতে ভাড়ার পরিমাণে পরিবর্তন হয়ে যাবে। কিন্তু এই সংযোজন কোন অবস্থাতেই পনের পার্সেন্ট থেকে অধিক এবং পাঁচ পার্সেন্ট থেকে কম হবে না। এর অর্থ হল, যদি সুদের হারে সংযোজন পনের পার্সেন্ট থেকে অধিক হয়, তাহলে ভাড়া পনের পার্সেন্ট পর্যন্তই বৃদ্ধি

পাবে। অপরদিকে সুদের হারের হ্রাস যদি পাঁচ পার্সেন্ট থেকে অধিক কমে যায়, তাহলে ভাড়ায় পাঁচ পার্সেন্টের অধিক কমানো হবে না।

আমাদের দৃষ্টিতে এটি একটি মধ্যমপন্থা যে পন্থায় সকল দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

ভাড়া পরিশোধে বিলম্বের কারণে জরিমানা

ফিন্যান্সিয়াল লীজের কোন কোন চুক্তিতে ভাড়া পরিশোধে বিলম্বের ক্ষেত্রে ইজারাদারের উপর জরিমানা আরোপ করা হয়। এই জরিমানা যদি ইজারাদাতার আয়-উপার্জনে সংযোজন হয়, তাহলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। কেননা, ভাড়া যখন পরিশোধ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, তখন তা ইজারাদারের উপর একটি ঋণ হয়ে যায় এবং এর উপর ঋণের (Debt) সকল নীতিমালা ও আহকাম প্রযোজ্য হবে। ঋণ পরিশোধে বিলম্বের কারণে ঋণগ্রহীতা থেকে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা সম্পূর্ণ সুদ, আল্লাহ্ পাক কুরআনে কারীম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সুতরাং ইজারাদার যদি ভাড়া পরিশোধে বিলম্বও করে, তাহলেও ইজারাদাতা তার থেকে অতিরিক্ত অর্থ দাবি করতে পারবে না।

এই নিষিদ্ধতা দ্বারা অসৎ স্বার্থ উদ্ধারের কারণে যে লোকসান হয় তার থেকে বাঁচার জন্য আরেকটি বিকল্প পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। তাহল- ইজারাদারকে এই অঙ্গীকারের কথা বলা হবে যে, সে যদি নির্ধারিত সময়ে ভাড়া পরিশোধে অক্ষম হয়, তাহলে সে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কল্যাণমূলক কাজের জন্য দান করবে। এই উদ্দেশ্যের জন্য অর্থায়নকারী/ইজারাদাতা একটি কল্যাণ ফান্ড গঠন করবে, যে ফান্ডে এ ধরনের অর্থ জমা করা হবে এবং সেগুলোকে কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হবে। যার মধ্যে অভাবী এবং দুস্থ ব্যক্তিদেরকে সুদবিহীন ঋণ প্রদান করাও অন্তর্ভুক্ত। কল্যাণমূলক কাজের জন্য প্রদেয় অর্থ বিলম্বের মেয়াদের হিসেব থেকে ভিন্নও হতে পারে এবং এর হিসাব বার্ষিক পার্সেন্টিসের ভিত্তিতেও করা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যের জন্য লীজ চুক্তিনামায় নিম্ন বর্ণিত ধারাও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

"ইজারাদার (Lessee) এ মর্মে অঙ্গীকার করছে যে, সে যদি নির্ধারিত তারিখে ভাড়া পরিশোধে অক্ষম হয়, তাহলে সে ..... পার্সেন্ট অর্থ বার্ষিক হিসেবে এমন একটি কল্যাণ ফান্ডে প্রদান করবে, যা ইজারাদাতার (Lessor) তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এবং যে অর্থ শুধুমাত্র ইজারাদাতাই শরীয়তসম্মত কল্যাণমূলক কাজের জন্য ব্যবহার করবে। এই ফান্ড কোন অবস্থাতেই ইজারাদাতার আয়ের অংশ হবে না।"

এই ব্যবস্থাপনা দ্বারা ইজারাদাতা যদিও প্রত্যাশিত মুনাফার (Opportunity Cost) বিনিময় পাবে না, কিন্তু তা ইজারাদারের জন্য যথাসময়ে পরিশোধে (বিলম্ব করা থেকে) অবশ্যই একটি কার্যকর প্রতিবন্ধকতার কাজে আসবে।

ইজারাদারের পক্ষ থেকে এ ধরনের দায়িত্ব গ্রহণের বৈধতা এবং ইজারাদাতার জন্য স্বীয় মুনাফার স্বার্থে কোন ধরনের বিনিময় কিংবা জরিমানার অবৈধতার ব্যাপারে মুরাবাহার অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

লীজ সমাপ্ত করা

(৬) ইজারাদার যদি কোন শর্তের বিরোধিতা করে, তাহলে ইজারাদাতার এককভাবে লীজকে সমাপ্ত করে দেয়ার অধিকার আছে। তবে ইজারাদারের পক্ষ হতে যদি কোন শর্তের বিরোধিতা না পাওয়া যায়, তাহলে লীজকে পারস্পরিক সম্মতি ব্যতীত সমাপ্ত করতে পারবে না। ফিন্যান্সিয়াল লীজের কোন কোন চুক্তিতে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, ইজারাদাতাকে তার ইচ্ছানুযায়ী একক সম্মতি এবং সিদ্ধান্তে লীজ সমাপ্ত করার অসীম স্বাধীনতা দেয়া হয়, তা শরীয়তের মূলনীতির পরিপন্থি।

(৭) ফিন্যান্সিয়াল লীজের কোন কোন চুক্তিতে একথাও অন্তর্ভুক্ত থাকে যে, লীজ সমাপ্তির ক্ষেত্রে লীজের অবশিষ্ট মেয়াদের ভাড়াও ইজারাদারকে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে, যদিও লীজ ইজারাদাতার সম্মতিতে সমাপ্ত হয়।

এই শর্তটি প্রকাশ্যভাবে শরীয়ত এবং ইনসাফ ও ন্যায়ের পরিপন্থি। এই শর্তকে অন্তর্ভুক্ত করার মৌলিক কারণ হল, লীজ চুক্তির পিছনে মৌলিক চিন্তা-চেতনা সুদি ঋণই থাকে, যা বাহ্যিকভাবে লীজের আকৃতিতে প্রদান করা হয়ে থাকে। এ কারণেই লীজ চুক্তির পরিণতি থেকে বাঁচার জন্য সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করা হয়।

এটা স্বাভাবিক কথা যে, এধরনের শর্ত শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। লীজ সমাপ্তির পরিণতি এমন হওয়া উচিত যে, ইজারাদাতা তার জিনিস ফেরত নিয়ে নিবে এবং ইজারাদার থেকে এ দাবি করতে পারবে যে, লীজ সমাপ্তির সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত ভাড়া পরিশোধ করতে হবে। যদি লীজ সমাপ্তি ইজারাদারের অসৎ ব্যবহার কিংবা কোন ধরনের অসতর্কতার কারণে হয়ে থাকে, তাহলে তার অসৎ ব্যবহর কিংবা অসতর্কতার কারণে যে লোকসান হবে ইজারাদার তার বিনিময়েরও দাবি করতে পারবে। কিন্তু তাকে অবশিষ্ট মেয়াদের ভাড়া পরিশোধের জন্য চাপ প্রয়োগ করা যাবে না।

পণ্যের বীমা

(৮) যদি লীজের ভিত্তিতে প্রদেয় পণ্যের ইসলামী তাকাফুল পদ্ধতি অনুযায়ী বীমা করাতে হয়, তাহলে তা ইজারাদাতার খরচে হতে হবে, ইজারাদারের খরচে নয়।

পণ্যের অবশিষ্ট মূল্য

(৯) আধুনিক ইজারা অর্থায়ন পদ্ধতির (অর্থায়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত ইজারা) [Financial Lease] আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, এতে লীজের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর লীজের ভিত্তিতে প্রদেয় পণ্যের মালিকানা ইজারাদারের দিকে অর্পণ হয়ে যায়। ইজারাদাতা (Lessor) যেহেতু তার ব্যয় মুনাফা সহ উসূল করে নেয় এবং এই মুনাফা সাধারণত ঐ সুদের সমপরিমাণ হয়ে থাকে যা লীজ চলাকালীন সময়ে এ অর্থের বিনিময়ে গ্রহণ করা যেত। এ কারণে তার (ইজারাদাতার) লীজের পণ্যে অতিরিক্ত

চিত্তাকর্ষণ থাকে না। অপরদিকে ইজারাদার লীজের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর সেই পণ্য তার নিকট রাখতে চায়।

এসব কারণের ভিত্তিতে লীজের পণ্য লীজের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর সাধারণত ইজারাদারকে দিয়ে দেয়া হয়। কখনো বিনিময় ছাড়া আবার কখনো নামমাত্র মূল্যে। পণ্যটি ইজারাদারকে দেয়া হবে একথা নিশ্চিতকল্পে এ শর্তটি লীজ চুক্তিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। আবার কখনো কখনো এ শর্তটি সুস্পষ্টভাবে তো উল্লেখ করা হয় না, কিন্তু একথা উভয়পক্ষের মাঝে প্রতিশ্রুত এবং সিদ্ধান্তকৃত মনে করা হয় যে, লীজের মেয়াদ সমাপ্তির পর সেই পণ্যের মালিকানা ইজারাদারের হয়ে যাবে।

এই শর্তটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকুক কিংবা বাহ্যিকভাবে সিদ্ধান্তকৃত মনে করা হোক, উভয় অবস্থায় শরীয়তের মূলনীতি বিরোধী। ইসলামী ফিক্‌হের প্রসিদ্ধ উসূল হল, একটি চুক্তিকে অপর চুক্তির সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত করা যাবে না যে, একটি অপরটির জন্য পূর্বশর্তস্বরূপ হয়ে যায়। এখানে পণ্যের মালিকানা ইজারাদারের দিকে অর্পণ হওয়াকে লীজ চুক্তির জন্য আবশ্যকীয় পূর্ব শর্ত হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই।

শরীয়তে আসল পজিশন হল, এই পণ্য শুধুমাত্র ইজারাদাতার (Lessor) মালিকানায় থাকবে। লীজের মেয়াদ শেষ হবার পর তার এই স্বাধীনতা থাকবে যে, হয়ত এই পণ্য ফেরত নিয়ে নিবে কিংবা লীজ নবায়ন করবে অথবা তৃতীয় কোন ব্যাক্তিকে লীজ প্রদান করবে কিংবা এই পণ্য ইজারাদার বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে দিবে। ইজারাদার ইজারাদাতাকে পণ্যটি নামমাত্র মূল্যে তার নিকট বিক্রি করার ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না এবং এ ধরনের শর্তও লীজ চুক্তিতে আরোপ করা যাবে না। তবে লীজের মেয়াদ সমাপ্ত হবার পর ইজারাদাতা যদি সেই পণ্য ইজারাদারকে উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করতে চায় কিংবা তার নিকট বিক্রি করতে চায়, তাহলে সে তার স্বীয় সম্মতিতে তা করতে পারবে।

এতদসত্ত্বেও সমকালীন কোন কোন বিজ্ঞপন্ডিত ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে একটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ

করেছেন। তারা বলেন, যদিও ইজারা চুক্তিকে মেয়াদ শেষ হবার পর পণ্য বিক্রি বা উপঢৌকন হিসেবে প্রদানের সাথে শর্তারোপ করা যাবে না, তবে ইজারাদাতা এককভাবে অঙ্গীকার করতে পারে যে, লীজের মেয়াদ শেষ হবার পর উক্ত পণ্যটি সে ইজারাদারের নিকট বিক্রি করে দিবে। এই অঙ্গীকার শুধুমাত্র ইজারাদাতার উপর অপরিহার্য হবে। তারা বলেন, উসূল হল ভবিষ্যতে কোন চুক্তি করার এককভাবে অঙ্গীকার ঐ সময় জায়েয যখন অঙ্গীকারকারী অঙ্গীকার পূরণের ব্যাপারে তো পাবন্দ হবে কিন্তু যার সাথে অঙ্গীকার করা হয়েছে সে ঐ চুক্তিতে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে পাবন্দ নয়। যার অর্থ হল তার (ইজারাদারের) পণ্যটি ক্রয় করার অধিকার আছে, যে অধিকার সে ব্যবহার করতেও পারে আবার নাও করতে পারে। কিন্তু সে যদি ক্রয়ের অধিকার ব্যবহার করতে চায়, তাহলে অঙ্গীকারকারী এব্যাপারে অস্বীকার করতে পারবে না। কেননা, সে তার অঙ্গীকারের ব্যাপারে পাবন্দ। এ কারণে এ সকল বিজ্ঞজন প্রস্তাব করেন, লীজ চুক্তিতে অন্তর্ভুক্তির পর ইজারাদাতা একটি পৃথক এককভাবে অঙ্গীকারের উপর স্বাক্ষর করবে, যে স্বাক্ষর দ্বারা সে এ মর্মে অঙ্গীকার করবে যে, ইজারাদার যদি ভাড়া পরিপূর্ণভাবে আদায় করে এবং পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত মূল্যে সে পণ্যটি ক্রয় করতে ইচ্ছুক, তাহলে ইজারাদাতা সেই মূল্যে পণ্য তার নিকট বিক্রি করে দিবে।

ইজারাদাতা যখন একবার অঙ্গীকারের উপর স্বাক্ষর করে ফেলবে, তাহলে সে অঙ্গীকার পূরণের ব্যাপারে পাবন্দ হবে। ইজারাদার যদি তার ক্রয়ের অধিকার ব্যবহার করতে চায়, তাহলে সে তার অধিকারকে ঐ ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবে, যে ক্ষেত্রে লীজের সিদ্ধান্তকৃত চুক্তি অনুযায়ী ভাড়া পরিপূর্ণরূপে আদায় করবে।

এমনিভাবে এ সকল বিজ্ঞজন এ কথারও অনুমতি প্রদান করেন যে, ইজারাদাতা বিক্রির পরিবর্তে মেয়াদান্তে পণ্য ইজারাদারকে উপঢৌকন হিসেবে প্রদানের অঙ্গীকারও করতে পারে, তবে শর্ত হল ইজারাদার ভাড়া পরিপূর্ণরূপে আদায় করতে হবে।

এই পদ্ধতিকে "اجـــارة و اقتناء" বলা হয়। সমকালীন অনেক আলিম এই পদ্ধতি অবলম্বনের অনুমতি প্রদান করেছেন। ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে এর উপর বিস্তৃত আকারে ব্যাপকভাবে আমল হচ্ছে। এই পদ্ধতিটি দু'টি মৌলিক শর্তসাপেক্ষে জায়েয।

প্রথম শর্ত হল, ইজারা (Lease) চুক্তি স্বত্বাগতভাবে বিক্রির অঙ্গীকার কিংবা উপঢৌকনের অঙ্গীকারের উপর স্বাক্ষর করার সাথে শর্তযুক্ত না হতে হবে। বরং এই অঙ্গীকার পৃথক ডকুমেন্টের মাধ্যমে হতে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত হল, অঙ্গীকার একতরফা হতে হবে এবং তা শুধুমাত্র অঙ্গীকারকারীর উপর অপরিহার্য হতে হবে। দু'তরফা চুক্তি না হতে হবে যা উভয়পক্ষের উপর অপরিহার্য হয়। কেননা, এ ক্ষেত্রে তা একটি পরিপূর্ণ চুক্তি হবে যা ভবিষ্যতের কোন একটি তারিখ থেকে কার্যকর হবে। এমনটি করা বিক্রি এবং উপঢৌকনের ক্ষেত্রে জায়েয নেই।

সাব-লীজ (Sub-Lease)

(১০) লীজের দ্রব্যটি যদি এমন হয়, যাকে এক একজন এক এক পদ্ধতিতে ব্যবহার করে, (অর্থাৎ- ব্যবহারকারীর ভিন্নতার কারণে ঐ জিনিসে বিভিন্ন প্রভাব পড়ে) তাহলে ইজারাদার (Lessee) ইজারাদাতার (Lessor) সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত তৃতীয় অন্য কোন ব্যক্তির নিকট তা ভাড়ায় প্রদান করতে পারবে না। যদি ইজারাদাতা তৃতীয় অন্য কোন ব্যক্তির নিকট ভাড়ায় প্রদানের অনুমতি প্রদান করে তাহলে সে তা করতে পারবে। যদি এই দ্বিতীয় সাব-লীজ (Sub-Lease) থেকে অর্জিত ভাড়া সেই ভাড়ার সমপরিমাণ বা তার চেয়ে কম হয় যা মালিককে (আসল ইজারাদাতাকে) পরিশোধ করা হয়, তাহলে সকল প্রসিদ্ধ ফিক্হবিদ এর বৈধতার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। কিন্তু যদি সাব-লীজ (Sub-Lease) থেকে অর্জিত ভাড়া মালিককে প্রদানকৃত ভাড়া অপেক্ষা বেশি হয়, তাহলে এ ব্যাপারে ফিক্হবিদদের বিভিন্ন রকমের দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। ইমাম শাফে'য়ী (রহ.) এবং আরো অন্যান্য আলিমদের নিকট তা জায়েয আছে

এবং দ্বিতীয় লীজ (Sub-Lease) থেকে অর্জিত অতিরিক্ত ভাড়া ব্যবহার করাও জায়েয আছে। হাম্বলী ফিক্হবিদগণও এই দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অপরদিকে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গী হল, সাব-লীজ থেকে অর্জিত অতিরিক্ত ভাড়া তার নিকট রাখা জায়েয নেই বরং এই অতিরিক্ত অর্থ সদকা করে দেওয়া জরুরী। কিন্তু যদি দ্বিতীয় ইজারাদাতা (Sub-Lessor) সেই পণ্যে কোন কিছু সংযোজন করে তাতে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে কিংবা তাকে এমন মুদ্রার ভিত্তিতে ভাড়ায় প্রদান করে যা মালিককে প্রদানকৃত ভাড়ার মুদ্রা থেকে ভিন্ন। তাহলে এই সাব-লীজ (Sub-Lease) থেকে অর্জিত অতিরিক্ত ভাড়া গ্রহণ করতে পারবে এবং স্বীয় কাজের জন্য ব্যবহার করতে পারবে।[১]

যদিও ইমাম আবুহানীফা (রহ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গী অধিক সতর্কতাপূর্ণ এবং যথাসম্ভব এর উপরই আমল করা উচিত, কিন্তু প্রয়োজনের সময় ফিক্হ শাফে'য়ী এবং ফিক্হ হাম্বলীর উপরও আমল করা যাবে। কেননা, ঐ অতিরিক্ত অর্থের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্ট কোন নিষিদ্ধতা বিদ্যমান নেই। আল্লামা ইব্ন কুদামা (রহ.) এই অতিরিক্ত পরিমাণের বৈধতার ব্যাপারে শক্তিশালী প্রমাণ উল্লেখ করেছেন।

লীজ হস্তান্তর

(১১) ইজারাদাতা লীজের সম্পদ তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকটও বিক্রি করতে পারবে। যার ফলে ইজারাদাতা এবং ইজারাদারের মাঝে গঠিত সম্পর্ক নতুন মালিক এবং ইজারাদারের সাথে স্থাপন হয়ে যাবে। কিন্তু লীজের পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর করা ব্যতীত স্বয়ং লীজকে কোন সম্পদের বিনিময়ের মাধ্যমে হস্তান্তর করা জায়েয নেই।

---

১. ইব্ন কুদামা, আল-মুগনী, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা নং- ৪৭৫, রিয়ায, ১৯৮১ ঈসায়ী। ইব্ন আবেদীন, রাদ্দুল মুখতার, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা নং- ২০।

উভয় পদ্ধতির মাঝে পার্থক্য হল, দ্বিতীয় পদ্ধতিতে পণ্যের মালিকানা দ্বিতীয় ব্যক্তির দিকে হস্তান্তর হয় না, বরং তার শুধুমাত্র দ্রব্যের ভাড়া উসূল করার অধিকার অর্জন হয়। এ ধরনের সমর্পণ শরীয়তের দৃষ্টিতে শুধুমাত্র ঐ ক্ষেত্রে জায়েয যখন ঐ ব্যক্তি থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ না করা হবে যার দিকে এই অধিকার সমর্পণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, একজন ইজারাদাতা ইজারাদার থেকে ভাড়া উসূল করার অধিকার তার ছেলে কিংবা তার কোন বন্ধুর দিকে হাদিয়া হিসেবে সমর্পণ করতে পারে। এমনিভাবে ইজারাদাতা তার ঋণদাতার দিকেও এই অধিকার সমর্পণ করতে পারে। যাতে ভাড়ার মাধ্যমে তার ঋণ পরিশোধ হয়ে যায়। কিন্তু ইজারাদাতা যদি এই অধিকার কোন ব্যক্তির নিকট নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করতে চায়, তাহলে তা জায়েয নেই। কেননা, এ ক্ষেত্রে মুদ্রার (ভাড়ার অর্থের) বিক্রি মুদ্রার বিনিময়ে সংঘটিত হয়, যার বৈধতা সমান সমান হওয়ার সাথে শর্তযুক্ত। অন্যথায় তা সুদে পরিণত হয়ে যাবে যা নিষিদ্ধ এবং নাজায়েয।

ইজারার সার্টিফিকেট চালু করা

ইজারা ব্যবস্থাপনায় সার্টিফিকেট তৈরির অত্যন্ত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, যে সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে ইজারার ভিত্তিতে অর্থায়নকারীদের জন্য স্টক মার্কেট অস্তিত্ব লাভে সহায়ক হতে পারে। যেহেতু ইজারায় ইজারাদাতা পণ্যের মালিক, সেহেতু সে সমুদয় কিংবা আংশিক পণ্য তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করতে পারবে। যার মাধ্যমে ক্রেতা ক্রয়কৃত অংশ অনুপাতে ইজারাদাতার দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে বিক্রেতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে।[১]

---

১. কোন কোন ফিক্হবিদদের নিকট ক্রয়-বিক্রয় ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ইজারার মেয়াদ শেষ না হবে, তবে ইমাম আবু ইউসূফ (রহ.) এবং অন্যান্য ফিক্হবিদের দৃষ্টিভঙ্গী হল, এই ক্রয়-বিক্রি সঠিক আছে এবং ক্রেতা-বিক্রেতার স্থলাভিষিক্ত হবে আর ইজারা চালু থাকবে। (ইব্‌ন আবেদীন, রাদ্দুল মুখতার, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা নং- ৫৭)

সুতরাং ইজারাদাতা যদি ইজারা চুক্তিতে অন্তর্ভুক্তির পর সে পণ্য ক্রয়ে যে পরিমাণ ব্যয় বহন করতে হয়েছে তা মুনাফাসহ উসূল করতে চায়, তাহলে সে এই পণ্যের সমুদয় কিংবা আংশিক এক বা একাধিক ব্যক্তির নিকট বিক্রি করতে পারবে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে (কয়েক ব্যক্তির নিকট বিক্রির ক্ষেত্রে) প্রত্যেক ব্যক্তি পণ্যের যতটুকু অংশ ক্রয় করেছে, তার প্রামাণ্য হিসেবে একটি সার্টিফিকেট চালু করতে পারে। যাকে "ইজারা সার্টিফিকেট" বলা হয়। এই সার্টিফিকেট বহনকারীর জন্য লীজের সম্পদে আনুপাতিক হারে মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করবে এবং বহনকারী ততটুকু পরিমাণ মালিক/ইজারাদাতার দায়-দায়িত্ব বহন করবে। পণ্য যেহেতু প্রথম ইজারাদারকে ইজারার ভিত্তিতে দেয়া হয়েছে, সেহেতু এই ইজারা নতুন মালিকদের সাথে চালু থাকবে। সার্টিফিকেট হোল্ডারদের থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির পণ্যের মালিকানায় তার আনুপাতিক অংশ অনুযায়ী ভাড়ার দাবি করতে পারবে। এমনিভাবে সেই মালিকানা অনুপাতে তার উপর ইজারাদাতার দায়-দায়িত্বও বর্তাবে। এটা যেহেতু একটি জড় সম্পদে মালিকানার প্রামাণ, সেহেতু মার্কেটে তার ব্যবসা এবং আদান-প্রদান স্বাধীনভাবে করা যাবে। এই সার্টিফিকেট এমন ডকুমেন্টের কাজে আসবে যেগুলোকে সহজেই নগদ অর্থে রূপান্তরিত করা যায়। সুতরাং এর দ্বারা ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের তারল্যের (Liquidity) সংকট সমাধানেও সহায়ক হবে।

একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, সার্টিফিকেট সম্পদে বিস্তৃত (অবণ্টনকৃত) অংশের মালিকানার তার সকল দায়-দায়িত্বসহ অপরিহার্যভাবে প্রতিনিধিত্ব করে। এই মৌলিক পদ্ধতিকে সঠিকভাবে না বুঝার কারণে কোন কোন লোকের পক্ষ থেকে এমন সার্টিফিকেট চালু করার চেষ্টা করা হয়েছে, যেগুলোতে পণ্যে কোন ধরনের মালিকানা সোপর্দ করা ব্যতীত বহনকারীর শুধুমাত্র ভাড়ার শুধু বিশেষ অর্থ গ্রহণ করার অধিকারের প্রতিনিধিত্ব করে। যার অর্থ হল, এই সার্টিফিকেট বহনকারীর লীজের সম্পদের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। তার অধিকার শুধুমাত্র এতটুকু যে, সে ইজারাদার থেকে অর্জিত ভাড়ায় অংশীদার হবে। ডকুমেন্ট চালু করার এই পদ্ধতি শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। যেমনিভাবে এ

অধ্যায়ের প্রারম্ভে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভাড়া পরিশোধ করা ওয়াজিব হওয়ার পর তা একটি ঋণ (Debt) হয়ে যায়, যা ইজারাদার পরিশোধ করবে। ঋণ কিংবা ঋণের প্রতিনিধিত্বকারী ডকুমেন্ট শরীয়তের দৃষ্টিতে আদান-প্রদানযোগ্য ডকুমেন্ট নয়। কেননা, এধরনের ডকুমেন্টের ক্রয়-বিক্রয় মুদ্রা কিংবা আর্থিক দায়-দায়িত্বের ক্রয়-বিক্রয়ের সাদৃশ্য, যা সমপরিমাণের উসূলের প্রতি লক্ষ্য রাখা ব্যতীত শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। আর যদি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় মূল্যে সমপরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়, তাহলে ডকুমেন্ট চালু করার মৌলিক উদ্দেশ্য শেষ হয়ে যাবে। এ জন্য এ ধরনের "ইজারা সার্টিফিকেট" স্টক মার্কেট অস্তিত্ব লাভের উদ্দেশ্য পূরণ করবে না।

সুতরাং ইজারা সার্টিফিকেটকে এমনভাবে ডিজাইন করা জরুরী, যাতে লীজের সম্পদে শুধুমাত্র ভাড়া গ্রহণ করার অধিকারের প্রতিনিধিত্ব না করে প্রকৃত মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে।

হেড লীজ (Head-Lease)

লীজিং-এর আধুনিক কায়-কারবারে আরেকটি পদ্ধতি অস্তিত্ব লাভ করেছে। তাহল- "হেড লীজে"র পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ইজারাদার দ্রব্যটি অপর কয়েকজন ইজারাদারকে ইজারা হিসেবে প্রদান করে, অতঃপর সে অন্যান্য লোকদেরকে তার কারবারে শরীক হওয়ার জন্য আহবান করে। তা এভাবে যে, ইজারাদারগণ থেকে অর্জিত ভাড়ায় সে তাদেরকে অংশীদার বানিয়ে নেয় এবং এর ভিত্তিতে সে ঐ অংশীদারগণ থেকে নির্দিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, এই ব্যবস্থাপনা শরীয়তের নীতিমালার পরিপন্থি। তার কারণ সুস্পষ্ট যে, ইজারাদার তো সেই সম্পদের মালিক নয়। সে তো শুধুমাত্র তার ভোগ ব্যবহারের (Usufruct) হকদার। এই ভোগ ব্যবহারের অধিকারকে সে সাব-লীজ (Sub-Lease) করে ঐসব ইজারাদারদের (Lessees) দিকে হস্তান্তর করেছে। এ পর্যায়ে তারা কোন জিনিসের মালিক নয়, স্বয়ং সম্পদেরও নয় এবং ভোগ ব্যবহারেরও নয়। তারা

শুধুমাত্র ভাড়া উসূল করার অধিকার রাখে। এজন্য তারা তাদের এই অধিকারের কিছু অংশ অন্যান্যদের দিকে সোপর্দ করছে। আর এব্যাপারে পূর্বে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই অধিকারের ব্যবসা করা যায় না। কেননা, তা উসূলযোগ্য ঋণকে স্বল্প মূল্যে বিক্রির সাদৃশ্য হয়ে যায়, যা সুদের একটি আকৃতি, যার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে।

এগুলো ইজারা অর্থায়ন পদ্ধতির (Financial Lease) এমন কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য যা শরীয়তের বিধানের পরিপন্থি। লীজকে ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করার সময় এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

লীজ চুক্তিতে সংঘটিত সম্ভাব্য ত্রুটি-বিচ্যুতির তালিকা উপরে বর্ণিত এই কয়েকটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এই অধ্যায়ে শুধুমাত্র সেসব মৌলিক ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখ করা হয়েছে যা লীজের চুক্তিতে পরিলক্ষিত হয়। ইসলামী লীজের মৌলিক নীতিমালা উপরে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামী লীজের চুক্তিতে এসব নীতিমালার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

সালাম এবং ইস্‌তিসনা'

শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন ক্রয়-বিক্রয় বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য মৌলিক শর্তসমূহ থেকে একটি শর্ত হল, যে জিনিস বিক্রির ইচ্ছা করা হবে তা বিক্রেতার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কব্জায় থাকতে হবে। এ শর্তে তিনটি বিষয় পাওয়া যায়।

(১) সে জিনিস বিদ্যমান হতে হবে। সুতরাং এমন জিনিস যা এখনো অস্তিত্বে আসেনি তা বিক্রি করতে পারবে না।

(২) বিক্রির জিনিসে বিক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠা হতে হবে। সুতরাং যে জিনিস বিদ্যমান কিন্তু বিক্রেতা তার মালিক নয়, তাহলে সে তা বিক্রি করতে পারবে না।

(৩) শুধুমাত্র মালিকানাই যথেষ্ট নয়, বরং তা বিক্রেতার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কব্জায় থাকতে হবে। সুতরাং বিক্রেতা যদি সেই জিনিসের মালিক হয়, কিন্তু তা স্বয়ং কিংবা স্বীয় উকিলের মাধ্যমে কব্জা করেনি, তাহলে সে তা বিক্রি করতে পারবে না।

শরীয়তের এই ব্যাপক নীতিমালা থেকে শুধুমাত্র দু'টি পদ্ধতি ব্যতিক্রম। প্রথমটি হল, সালাম। দ্বিতীয়টি হল ইস্‌তিসনা'। উভয়টি বিশেষ প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়। এই অধ্যায়ে এগুলোর পদ্ধতি এবং ব্যবহারের পরিধি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

সালামের সংজ্ঞা ঃ

"সালাম" এমন একটি ক্রয়-বিক্রি যার মাধ্যমে বিক্রেতা এই দায়িত্ব গ্রহণ করে যে, সে ভবিষ্যতের কোন একটি তারিখে নির্দিষ্ট জিনিস

ক্রেতাকে সরবরাহ করবে এবং তার বিনিময়ে পূর্ণমূল্য বিক্রির সময়ই অগ্রিম নিয়ে নেয়।

এখানে মূল্য নগদ কিন্তু পণ্য (বিক্রিতব্য জিনিস) পরিশোধে বিলম্বিত হয়। ক্রেতাকে "রাব্বুস সলম", বিক্রেতাকে "মুসলাম ইলাইহি" এবং ক্রয়কৃত জিনিসকে "মুসলাম ফীহ" বলা হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ কতগুলো শর্তসাপেক্ষে সালাম চুক্তির অনুমতি দিয়েছেন। এই ক্রয়-বিক্রয়ের মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রয়োজন পূরণ করা। যাদের ফসল উৎপাদন এবং ফসল কাটা পর্যন্ত তাদের বিবি-বাচ্চাদের ভরণ-পোষণের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। সুদের নিষিদ্ধতার পর তারা সুদি ঋণ গ্রহণ করতে পারছিল না। এজন্য তাদেরকে তাদের কৃষিজাত পণ্য অগ্রিম মূল্যে বিক্রির অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

এমনিভাবে আরব ব্যবসায়ীগণ অন্য শহরে বিভিন্ন মালামাল রপ্তানি করত এবং সেখান থেকে নিজের শহরে বিভিন্ন মালামাল আমাদানি করত। এ উদ্দেশ্যের জন্য তাদের অর্থের প্রয়োজন হত, সুদের নিষিদ্ধতার পর তারা সুদি ঋণ গ্রহণ করতে পারত না। এজন্য তাদের অগ্রিম মূল্যে পণ্য বিক্রির অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। নগদ মূল্য গ্রহণ করে তারা তাদের উল্লেখিত কারবার সহজেই চালু রাখতে পারত।

সালাম দ্বারা বিক্রেতারও উপকার হয়। কেননা, সে মূল্য অগ্রিম পেয়ে যায়। এবং ক্রেতারও উপকার হয়। কেননা, সালামে মূল্য সাধারণত নগদ মূল্য অপেক্ষা কম হয়।

সালামের অনুমতি সেই সাধারণ নিয়ম-নীতি থেকে একটি ব্যতিক্রম ক্রয়-বিক্রয়, যে নিয়ম-নীতি অনুযায়ী ভবিষ্যতের দিকে সম্পৃক্ত ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি জায়েয নেই। সালামের অনুমতি কয়েকটি কঠিন শর্তের সাথে শর্তযুক্ত। সেসব শর্তসমূহ নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।

সালামের শর্ত

(১) সালাম জায়েয হওয়ার জন্য জরুরী হল, ক্রেতা চুক্তির সময় পরিপূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে দিতে হবে। কেননা, চুক্তির সময় ক্রেতা যদি

পরিপূর্ণ মূল্য পরিশোধ না করে, তাহলে তা ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রির সাদৃশ্য হয়ে যাবে। যা করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। এছাড়া সালামের বৈধতার মৌলিক রহস্য হল বিক্রেতার তাৎক্ষণিক প্রয়োজন পূরণ করা। যদি অগ্রিম মূল্য তাকে পরিপূর্ণভাবে পরিশোধ করা না হয়, তাহলে চুক্তির মৌলিক উদ্দেশ্যই শেষ হয়ে যাবে।

এজন্য সকল ফিক্‌হবিদ এব্যাপারে একমত যে, সালামে মূল্য পরিপূর্ণরূপে (অগ্রিম) পরিশোধ করতে হবে। তবে ইমাম মালিক (রহ.)-এর মাযহাব হল, বিক্রেতা ক্রেতাকে দু'বা তিন দিনের সুযোগ দিতে পারবে, কিন্তু এই সুযোগ চুক্তির নিয়মতান্ত্রিক অংশ হতে পারবে না।[১]

(২) সালাম শুধুমাত্র সেই সব পণ্যে হতে পারে যে সব পণ্যের কোয়ালিটি-(গুণগত মান) এবং পরিমাণ পূর্বেই পরিপূর্ণরূপে নির্ধারণ করা যায়। সুতরাং এমন জিনিস যেগুলোর কোয়ালিটি এবং পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় না, সেগুলো "সালামে"র মাধ্যমে বিক্রি করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ মূল্যবান পাথর সালামের ভিত্তিতে বিক্রি করা যাবে না। কেননা, সেগুলোর প্রতিটি টুকরা সাধারণত অন্যটির তুলনায় গুণগতমান, সাইজ এবং ওজনের দিক থেকে ভিন্নরূপ হয় এবং সাধারণত তা বর্ণনার মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।

(৩) কোন নির্দিষ্ট জিনিস কিংবা নির্দিষ্ট ক্ষেত কিংবা ফার্মের উৎপাদনে সালাম হবে না। যেমন- বিক্রেতা এই দায়িত্ব গ্রহণ করল যে, সে নির্দিষ্ট ক্ষেতের গম কিংবা নির্দিষ্ট গাছের ফল সরবরাহ করবে, তাহলে এই সালাম সঠিক হবে না। কেননা, পরিশোধের পূর্বেই সেই ক্ষেতের ফসল কিংবা সেই গাছের ফল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনার কারণে বিক্রিত দ্রব্য পরিশোধ অনিশ্চিত হয়ে যাবে। এই বিধান প্রত্যেক ঐ দ্রব্যের ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে যার সরবরাহ অনিশ্চিত হবে।

(৪) যে দ্রব্যে সলাম করার ইচ্ছা করবে, তার ধরন এবং গুণগত মান সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে নেয়াও অপিরহার্য। যাতে সেই দ্রব্যে এমন কোন

---

১. ইব্‌ন কুদামা, আল-মুগনী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা নং- ৩২৮।

অস্পষ্টতা বিদ্যমান না থাকে যা পরবর্তীতে কলহ-কোন্দলের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসংগে সম্ভাব্য সকল বিষয় বিশদভাবে উল্লেখ থাকা উচিত।

(৫) কোন রকম অস্পষ্টতা ব্যতীত বিক্রিতব্য দ্রব্যের পরিমাণও নির্দিষ্ট করে নেয়া অপরিহার্য। দ্রব্যের পরিমাণ যদি ব্যবসায়ীদের ওরফে ওজনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা হয় (অর্থাৎ সে জিনিস পাল্লা দিয়ে মেপে বিক্রি করা হয়) তাহলে তার ওজন নির্দিষ্ট হওয়া অপরিহার্য। আর যদি তার পরিমাণ টুকরি দিয়ে মেপে নির্ধারণ করা হয়, তাহলে তার নির্দিষ্ট পরিমাণ টুকরি জানা থাকতে হবে। যে জিনিস সাধারণত পাল্লা দিয়ে মাপা হয়, তার পরিমাণ টুকরি দিয়ে নির্ধারণ করা যাবে না (সালামের ক্ষেত্রে)। এমনিভাবে টুকরি দিয়ে মাপার দ্রব্যের পরিমাণ পাল্লা দিয়ে নির্ধারণ না হতে হবে।

(৬) বিক্রিত জিনিসের পরিশোধের তারিখ এবং স্থানও চুক্তিতে নির্ধারণ হতে হবে।

(৭) বাই'য়ে সালাম এমন দ্রব্যে করা যাবে না, যেগুলো তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করা অপরিহার্য। উদাহরণস্বরূপ যদি রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রি করা হয়, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে উভয়টি একই সময়ই পরিশোধ করা অপরিহার্য। এখানে বাইয়ে সালাম কার্যকরী হবে না। এমনিভাবে যদি যবের বিনিময়ে গম বিক্রি করা হয়, তাহলে বিক্রি সঠিক হওয়ার জন্য উভয়টির কব্জা একই সময় হওয়া অপরিহার্য। এ কারণে এক্ষেত্রে সালাম-চুক্তি জায়েয নেই।[১]

সকল ফিক্‌হবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, সালাম ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এই শর্তসমূহ পরিপূর্ণভাবে পূরণ না করা হবে। কেননা, এই শর্তসমূহের ভিত্তি একটি সুস্পষ্ট হাদীসের উপর। এ প্রসংগে একটি প্রসিদ্ধ হাদীস হল ঃ

من أسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم

---

১. ইব্‌ন কুদামা, আল-মুগনী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা নং- ৩২৫, রিয়াদ-১৯৮১।

"যে ব্যক্তি সালাম করতে চায় সে যেন নির্দিষ্ট পরিমাপ যন্ত্র এবং ওজনে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সালাম করে।"

তবে উল্লেখিত শর্ত ছাড়াও আরো কিছু শর্ত রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে বিভিন্ন ফকীহদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। নিম্নে সেসব শর্তের ব্যাপারে আলোচনা করা হচ্ছে।

(১) ফিক্‌হ হানাফী অনুযায়ী যে জিনিসে বাইয়ে সালাম হচ্ছে, সে জিনিস চুক্তির তারিখ হতে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত মার্কেটে পাওয়া যাওয়া অপরিহার্য। সুতরাং সালাম চুক্তির সময় যদি ঐ জিনিস মার্কেটে না পাওয়া যায়, তাহলে তার বাইয়ে সালাম করা যাবে না। যদিও আশা করা যায় যে, পরিশোধের সময় তা মার্কেটে পাওয়া যাবে।

কিন্তু ফিক্‌হ শাফে'য়ী, মালেকী এবং হাম্বলীর দৃষ্টিভঙ্গী হল, সালাম সঠিক হওয়ার জন্য চুক্তির সময় সেই জিনিস পাওয়া যাওয়া শর্ত নয়। তাদের নিকট অপরিহার্য হল, সেই জিনিস পরিশোধের সময় পাওয়া যেতে হবে। বর্তমান যুগে এই দৃষ্টিভঙ্গীর উপর আমল করা যেতে পারে।

(২) ফিক্‌হ হানাফী এবং ফিক্‌হ হাম্বলীর দৃষ্টিতে কব্জার মেয়াদ চুক্তির সময় থেকে কমপক্ষে এক মাস হওয়া অপরিহার্য। যদি কব্জার সময় এক মাসের কম ধার্য করা হয়, তাহলে সালাম সঠিক হবে না। তাদের প্রমাণ হল, সালামের অনুমতি ক্ষুদ্র কৃষক এবং ব্যবসায়ীদের প্রয়োজন পূরণের জন্য দেয়া হয়েছে, সুতরাং দ্রব্য প্রস্তুত করার জন্য তাদের উপযুক্ত সময় পেতে হবে। এক মাস সময়ের পূর্বে সেই দ্রব্য প্রস্তুত করা সম্ভব হবে না, এছাড়া সালামে নগদ সওদা অপেক্ষা মূল্য কম হয়, মূল্যে এই সুযোগ তখনই ন্যায়সঙ্গত হবে যখন এই দ্রব্য এতদিন পরে পরিশোধ করা হবে, যত দিন পর পরিশোধ করলে মূল্যে যুক্তিসঙ্গত প্রভাব পড়তে পারে। এক মাসের কম সময়ে সাধারণত মূল্যে তেমন কোন প্রভাব পড়ে না। সুতরাং দ্রব্য পরিশোধের সময় কমপক্ষে এক মাসের কম না হওয়া উচিত [১]।

---

১. ইব্‌ন কুদামা, আল-মুগনী, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা নং- ৩২৫, রিয়াদ-১৯৮১।

ইমাম মালেক (রহ.) এতটুকুর ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যে, সালাম চুক্তির জন্য কমপক্ষে একটি সময় হওয়া উচিত। কিন্তু তাঁর মতে এই সময় পনের দিনের কম না হতে হবে। কেননা, বাজারদর দু'সপ্তাহ পর পর পরিবর্তন হতে পারে।

এই দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে (কমপক্ষে একটি সময় শরীয়তের দৃষ্টিতে নির্ধারিত) অন্যান্য ফকীহগণ যেমন ইমাম শাফে'য়ী এবং কোন কোন হানাফী ফকীহ একমত পোষণ করেননি। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম সঠিক হওয়ার জন্য কমপক্ষে একটি সময় নির্দিষ্ট করেননি। হাদীস অনুযায়ী শর্ত শুধু এতটুকু যে, কব্জার সময় সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হতে হবে। সুতরাং ণ্যূনতম কোন সময় বর্ণনা করা যাবে না। উভয়পক্ষ পারস্পরিক সম্মতিতে কব্জার যে কোন তারিখ নির্দিষ্ট করতে পারবে।

বর্তমান যুগে এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রাধান্য পাওয়ার উপযুক্ত মনে হয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ণ্যূনতম কোন সময় নির্দিষ্ট করেননি। ফকীহগণ বিভিন্ন সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন, যা একদিন থেকে এক মাস পর্যন্ত রয়েছে। একথা সুস্পষ্ট যে, ফকীহগণ এই সময় গরীব বিক্রেতার সুযোগ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রয়োজন অনুযায়ী ধার্য করেছেন। কিন্তু এই প্রয়োজন সময় এবং স্থানের পরিবর্তনের কারণে পরিবর্তিত হতে পারে। কখনো কখনো একেবারে নিকটবর্তী তারিখ ধার্য করার দ্বারা বিক্রেতার বেশি সুবিধা হতে পারে। বিক্রেতাই তার সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে উত্তম সিদ্ধান্ত নিতে পারে, বিক্রেতা যদি তার স্বাধীন সন্তুষ্টির দ্বারা এক মাসের পূর্বের কোন তারিখ কব্জা করানোর জন্য ধার্য করে, তাহলে তাকে এব্যাপারে বাধা দেয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। সমকালীন কোন কোন ফকীহ এই দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রহণ করেছেন। কেননা, এ দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক চুক্তির জন্য অধিক প্রযোজ্য।

সালাম পদ্ধতিতে অর্থায়ন

উল্লেখিত আলোচনা থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়েছে যে, শরীয়ত কৃষক এবং ব্যবসায়ীদের প্রয়োজন পূরণের জন্য সালামের অনুমতি দিয়েছে। এ

কারণে এটা মূলত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং কৃষকদের জন্য একটি অর্থায়ন পদ্ধতি। এই অর্থায়ন পদ্ধতি আধুনিক ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহেও ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশেষ করে কৃষিজাত পণ্যের অর্থায়নের জন্য সালাম পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। একথা পূর্বে বিবৃত হয়েছে যে, সালামে পরিশোধ্য পণ্য অপেক্ষা মূল্য কম হয়। এভাবে উভয় মূল্যের মাঝে যে ব্যবধান হবে, তা ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বৈধ মুনাফা হবে। কাংক্ষিত পণ্য যথাসময়ে সরবরাহ করা নিশ্চিতকল্পে ক্রেতা-বিক্রেতা থেকে জামানত কিংবা বন্ধকির আকৃতিতে সিকিউরিটিরও দাবি করতে পারবে। অনাদায়ের ক্ষেত্রে জামিনদার থেকে ঐ জিনিসই সরবরাহের দাবি করা যাবে। আর বন্ধকির ক্ষেত্রে ক্রেতা/অর্থায়নকারী বন্ধকির দ্রব্য বিক্রি করে তার মূল্য দ্বারা কাংক্ষিত জিনিস বাজার থেকে ক্রয় করতে পারবে কিংবা অগ্রিম প্রদেয় মূল্য উসূল করতে পারবে।

সালাম পদ্ধতিতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে আধুনিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ইসলামী ব্যাংকসমূহ একটি জটিলতার সম্মুখীন হতে পারে। তাহল তারা তাদের গ্রাহকদের থেকে নগদ অর্থের পরিবর্তে পণ্য গ্রহণ করবে, যেহেতু এই ব্যাংকসমূহ শুধুমাত্র অর্থের লেনদেনে অভিজ্ঞ হয়, এই জন্য বিভিন্ন গ্রাহক থেকে বিভিন্ন পণ্য উসূল করে সেগুলো বাজারে বিক্রি করা বাহ্যিকভাবে তাদের কাছে ঝামেলা মনে হবে। এছাড়া তারা সেই পণ্যগুলো কার্যত কব্জা না করেও বিক্রি করতে পারবে না, কেননা তা শরীয়তে নিষিদ্ধ।

কিন্তু আমরা যখন ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করি তখন একটি মৌলিক সূক্ষ্ম বিষয় ভুলে না যাওয়া উচিত, তাহল যেসব আর্থিক প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র মুদ্রার (Money) লেনদেন করে তাদের পদ্ধতি ইসলামী শরীয়তের জন্য একটি নতুন বিষয়। এসব প্রতিষ্ঠান যদি হালাল মুনাফা অর্জন করতে চায়, তাহলে তাদের কোন না কোনভাবে পণ্যের লেনদেন করতে হবে। কেননা, শরীয়তের দৃষ্টিতে শুধুমাত্র ঋণ প্রদান করে মুনাফা অর্জন করা যায় না। এ কারণে ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গী এবং পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হবে। এসব

প্রতিষ্ঠান পণ্যের লেনদেনের জন্য বিশেষ সেল গঠন করতে পারে। যদি এমন সেল গঠন করা হয়, তাহলে সালামের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় করা এবং সেগুলো নগদে বাজারে বিক্রি করা জটিল হবে না।

এছাড়া সালাম চুক্তি দ্বারা উপকৃত হওয়ার আরো দু'টি পদ্ধতি রয়েছে।

প্রথম পদ্ধতি হল, কোন জিনিস সালামের ভিত্তিতে ক্রয় করে আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাকে একটি প্যারালাল সালাম (Parallel Salam) চুক্তির মাধ্যমে বিক্রি করতে পারবে। যার পরিশোধের তারিখও প্রথম সালামের তারিখেই হবে। দ্বিতীয় (প্যারালাল) সালামে সময় যেহেতু স্বল্প হবে, সে জন্য মূল্য প্রথম চুক্তির তুলনায় কিছুটা বেশি হবে। এই উভয় মূল্যের মাঝে যে পার্থক্য হবে তা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অর্জিত মুনাফা হবে। দ্বিতীয় সালামের সময় যত স্বল্প হবে মূল্য ততই বেশি হবে এবং মুনাফাও সে অনুপাতে বেশি হবে। এই পদ্ধতি দ্বারা আর্থিক প্রতিষ্ঠান তার স্বীয় সংক্ষিপ্ত সময়ের অর্থায়ন বিভাগ পরিচালনা করতে পারে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হল, যদি কোন কারণবশত প্যারালাল সালাম চুক্তি কার্যকর না হয়, তাহলে এই আর্থিক প্রতিষ্ঠান তৃতীয় কোন পার্টি থেকে ক্রয়ের অঙ্গীকার গ্রহণ করতে পারবে। এই অঙ্গীকার সম্ভাব্য ক্রেতার পক্ষ হতে একতরফা হতে হবে। এটা যেহেতু শুধুমাত্র একটি অঙ্গীকার কার্যত ক্রয়-বিক্রয় নয়, সেজন্য ক্রেতা মূল্য অগ্রিম পরিশোধের ব্যাপারে পাবন্দ নয়। ফলে তাতে বেশি মূল্য ধার্য করা যাবে। আর সংশ্লিষ্ট জিনিস যেহেতু আর্থিক প্রতিষ্ঠান অধিকৃত হবে সেহেতু অঙ্গীকার অনুযায়ী তৃতীয় পার্টির নিকট পূর্ব সিদ্ধান্তকৃত মূল্যে বিক্রি করে দিবে।

কখনও কখনও তৃতীয় আরেকটি পদ্ধতিও অবলম্বন করা হয়। তাহল- কব্জার তারিখে সেই পণ্য বিক্রেতার নিকটই অধিক মূল্যে বিক্রি করে দেয়া হয়, এই পদ্ধতি শর‌য়ী বিধানের পরিপন্থি। কেননা, ক্রেতা পণ্য কব্জা করার পূর্বে সে জিনিস বিক্রেতার নিকট বিক্রি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। আর যদি এই চুক্তি বেশি মূল্যে হয়, তাহলে তা সুদের সাদৃশ্য হয়ে যাবে। যা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যদি এই দ্বিতীয় বিক্রি ক্রেতার কব্জার পরও হয়, তাহলেও আসল ক্রয়-বিক্রয় থাকাকালীন

সময় উক্ত দ্বিতীয় বিক্রির ব্যবস্থা করা যাবে না, সুতরাং এই পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে অকার্যকর হবে।

প্যারালাল সালামের কিছু নিয়ম-নীতি

আধুনিক ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেহেতু প্যারালাল সালামের পদ্ধতি ব্যবহার করছে, সেজন্য এই পদ্ধতি সঠিক হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত মনে রাখা অপরিহার্য।

(১) প্যারালাল সালামে ব্যাংক ভিন্ন দু'টি চুক্তিতে চুক্তিবদ্ধ হয়। এক চুক্তি অনুযায়ী ব্যাংক ক্রেতা হয় এবং আরেকটি চুক্তি অনুযায়ী বিক্রেতা হয়। এই দু'চুক্তির প্রত্যেকটি অপরটি হতে পৃথক এবং স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। চুক্তিদ্বয়কে এই হিসেবে পরস্পরে মিলানো যাবে না যে, সেগুলোর একটির দায়-দায়িত্ব এবং জিম্মাদারী দ্বিতীয় চুক্তির দায়-দায়িত্ব এবং জিম্মাদারীর উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক চুক্তি স্বতন্ত্র হতে হবে এবং অপর চুক্তির উপর নির্ভরশীল এবং সীমাবদ্ধ না থাকতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, "ক" "খ" থেকে একশ' বস্তা গম সালাম হিসেবে ক্রয় করছে, যার পরিশোধের তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ধার্য করা হয়েছে। "ক" "গ"র সাথে প্যারালাল সালাম চুক্তি করতে পারবে যে, সে তাকে ৩১ ডিসেম্বর একশ' বস্তা গম সরবরাহ করবে, কিন্তু "গ"র সাথে প্যারালাল সালাম চুক্তি করার সময় তাকে গম সরবরাহ "খ" থেকে গম গ্রহণের সাথে শর্তযুক্ত করতে পারবে না। "খ" যদি ৩১ ডিসেম্বর গম সরবরাহ না করে, তাহলেও "ক" একশ' বস্তা গম "গ"কে সরবরাহ করতে হবে। সে "খ"র বিরুদ্ধে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে, কিন্তু "গ"কে গম সরবরাহের দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃত পাবে না।

এমনিভাবে "খ" যদি "ক"কে খারাপ জিনিস সরবরাহ করে, যা পূর্বনির্ধারিত গুণগত মানের নয়, তদুপরি "ক"র দায়িত্ব হল "গ"র সাথে চুক্তি অনুযায়ী গুণগত মানের গম সরবরাহ করা।

(২) প্যারালাল সালাম (Parallel Salam) শুধুমাত্র তৃতীয় পার্টির সাথে করা জায়েয। প্রথম চুক্তিতে যে ব্যক্তি বিক্রেতা হবে, তাকে দ্বিতীয় প্যারালাল চুক্তিতে ক্রেতা বানানো যাবে না। কেননা, তা বাই ব্যাক (Buy Back) চুক্তি হয়ে যাবে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। এমনকি দ্বিতীয় চুক্তিতে ক্রেতা যদি তার স্বীয় স্বাতন্ত্রিক আইনগত বিধান রাখে, কিন্তু তা সম্পূর্ণভাবে ঐ ব্যক্তির মালিকানায় থাকে যে প্রথম চুক্তিতে বিক্রেতা ছিল, তাহলেও এই (দ্বিতীয় চুক্তি) বৈধ হবে না। কেননা, কার্যত তা বাই ব্যাকের সাদৃশ্য হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, 'ক' 'খ' থেকে এক হাজার বস্তা গম সালাম হিসেবে ক্রয় করেছে। 'খ' একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানী, 'খ'র অধীনে একটি কোম্পানী 'গ' রয়েছে। যার নিজস্ব একটি পৃথক আইনগত বিধান রয়েছে, কিন্তু মালিকানা সম্পূর্ণভাবে 'খ'-এর। তাহলে এক্ষেত্রে 'ক' 'গ'র সাথে প্যারালাল সালাম চুক্তি করতে পারবে না। তবে 'গ' যদি পরিপূর্ণভাবে 'খ'র মালিকানায় না থাকে, তাহলে 'ক' 'গ'র সাথে এই চুক্তি করতে পারবে। যদিও কোন কোন শেয়ারহোল্ডার উভয় ব্যবসায় শরীক থাকে।

ইসতিসনা

ইসতিসনা' ক্রয়-বিক্রয়ের ভিন্ন প্রকার যে প্রকারে পণ্য অস্তিত্বে আসার পূর্বেই ক্রয়-বিক্রয়ে সংগঠিত হয়ে যায়। ইসতিসনা' অর্থ হচ্ছে কোন প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান (ম্যানু ফ্যাকচারার)কে ক্রেতার জন্য নির্দিষ্ট জিনিস তৈরী করে দেয়ার অর্ডার দেয়া। যদি তৈরিকারী (Manufacturer) প্রতিষ্ঠান নিজের পক্ষ হতে কাঁচা মাল দিয়ে ক্রেতার জন্য দ্রব্য তৈরি করে দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে নেয়, তাহলে ইসতিসনা' চুক্তি অস্তিত্ব লাভ করবে। কিন্তু ইসতিসনা' সঠিক হওয়ার জন্য অপরিহার্য হল, মূল্য উভয়ের সন্তুষ্টিতে নির্ধারিত করে নিতে হবে এবং কাংক্ষিত দ্রব্যের (যা তৈরি করা হবে) প্রয়োজনীয় গুণাবলীও নির্ধারিত করে নিতে হবে।

ইসতিসনা' চুক্তি দ্বারা প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের উপর উক্ত দ্রব্য তৈরি করার ব্যাপারে চারিত্রিক দায়িত্ব অর্পিত হয়ে যায়। কিন্তু প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের কাজ শুরু করার পূর্বে উভয়পক্ষের যে কেউ অপরকে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে চুক্তি বাতিল করতে পারবে।[১] কিন্তু প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের কাজ শুরু করার পর চুক্তিকে একতরফা বাতিল করা যাবে না।

ইসতিসনা' এবং সালামের মধ্যে পার্থক্য

ইসতিসনা'র এই পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসতিসনা' এবং সালামের মাঝে কয়েকটি পার্থক্য রয়েছে যা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।

(১) ইসতিসনা' সর্বদা এমন জিনিসের উপর হয় যা তৈরী করার প্রয়োজন হয়, পক্ষান্তরে সালাম সকল জিনিসেই হতে পারে, চাই তা তৈরি করার প্রয়োজন হোক কিংবা না হোক।

---

১. ইবন আবেদীন, রাদ্দুল মুখতার, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা নং-২২৩।

(২) সালামে মূল্য সম্পূর্ণভাবে অগ্রিম পরিশোধ করা অপরিহার্য, পক্ষান্তরে ইসতিসনা'য় তা অপরিহার্য নয়।

(৩) সালাম চুক্তি যদি একবার সংঘটিত হয়ে যায়, তাহলে তাকে একতরফা বাতিল করা যাবে না। পক্ষান্তরে ইসতিসনা' চুক্তিতে দ্রব্য তৈরি শুরুর পূর্বে বাতিল করা যায়।

(৪) সালামে পরিশোধের তারিখ ধার্য করা ক্রয়-বিক্রয়ের অন্যতম অংশ, পক্ষান্তরে ইসতিসনা'য় পরিশোধের তারিখ ধার্য করা অপরিহার্য নয়।[১]

ইসতিসনা এবং ইজারার মধ্যে পার্থক্য

একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসতিসনা'য় প্রস্তুতকারক স্বয়ং নিজের মাল দ্বারা দ্রব্য তৈরি করার দায়িত্ব গ্রহণ করে নেয়, সুতরাং এই চুক্তি একথাকেও শামিল করে নেয় যে, কাঁচা মাল যদি প্রস্তুতকারকের নিকট না থাকে তাহলে সে তা জোগাড় করবে এবং কাংক্ষিত জিনিস তৈরির ক্ষেত্রেও কাজ করবে। যদি কাঁচা মাল গ্রাহকের পক্ষ হতে সরবরাহ করা হয়, প্রস্তুতকারক থেকে শুধুমাত্র তার শ্রম এবং দক্ষতা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তা ইসতিসনা' চুক্তি হবে না। এক্ষেত্রে তা ইজারা চুক্তি হয়ে যাবে। যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি থেকে একটি নির্দিষ্ট বিনিময়ের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করা হয়।

যখন বিক্রেতা কাংক্ষিত জিনিস তৈরি করে ফেলবে, তখন তা ক্রেতার সামনে পেশ করবে। এই সময় ক্রেতা উক্ত দ্রব্য গ্রহণের ব্যাপারে অস্বীকার করতে পারবে কি না এ প্রসংগে ফিক্‌হবিদদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব হল, ক্রেতা উক্ত দ্রব্য দেখার পর তার خيار رؤيت (দর্শন ভিত্তিক ইখতিয়ার) এর অধিকার ব্যবহার করতে পারবে। কেননা, ইসতিসনা' একটি ক্রয়-বিক্রয় আর যখন কোন ব্যক্তি এমন কোন জিনিস ক্রয় করে যা সে দেখেনি, তাহলে দেখার পর চুক্তি বাতিল করার ইখতিয়ার থাকে। এই উসূল ইসতিসনা'য়ও প্রযোজ্য হবে।

---

১. ইবন আবেদীন, রাদ্দুল মুখতার।

কিন্তু ইমাম আবু ইউসূফ (রহ.) বলেন, যদি তা (সরবরাহকৃত দ্রব্য) উভয়পক্ষের মাঝে চুক্তির সময় নির্ধারিত গুণাবলী অনুযায়ী হয়, তাহলে ক্রেতা তা কবুলের ব্যাপারে পাবন্দ হবে এবং সে দর্শনভিত্তিক ইখতিয়ার ব্যবহার করতে পারবে না। উসমানী খেলাফতের যুগে ফিক্‌হবিদগণ এই দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং হানাফী বিধি-বিধান সেই অনুযায়ীই সংকলিত হয়েছে। কেননা, প্রস্তুতকারক তার যাবতীয় উপায়-উপকরণ কাংক্ষিত জিনিস তৈরির কাজে ব্যবহার করার পর ক্রেতা বিনাকারণে চুক্তি বাতিল করে দেয়া আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হবে। বিশেষত প্রস্তুতকৃত দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে কাংক্ষিত গুণাবলী অনুপাতে হওয়া সত্ত্বেও।[১]

সরবরাহের সময়

পূর্বে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইসতিসনা'য় পণ্য সরবরাহের সময় নির্দিষ্ট করা অপরিহার্য নয়। তদুপরি ক্রেতা পণ্য সরবরাহের জন্য সর্বোচ্চ সময় ধার্য করতে পারবে। যার অর্থ হবে প্রস্তুতকারক যদি নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য সরবরাহে বিলম্ব করে, তাহলে ক্রেতা তা কবুল করার এবং মূল্য আদায়ের ব্যাপারে পাবন্দ হবে না।[২]

পণ্য সময়মত সরবরাহ করার নিশ্চিয়তকল্পে এধরনের আধুনিক চুক্তি একটি শাস্তি হিসেবে গণ্য হয়। যার ফলে প্রস্তুতকারক যদি যথাসময়ে সরবরাহে বিলম্ব করে, তাহলে তার উপর জরিমানা আরোপ হবে, যা দৈনিক হিসাবের ভিত্তিতে করা হবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ধরনের কোন শাস্তি আরোপ করা যাবে কি না? যদিও ফকীহদের ইসতিসনা' প্রসংগে আলোচনাকালে এ প্রশ্নের ব্যাপারে চুপ থাকা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তাঁরা এ ধরনের শর্ত ইজারায় জায়েয বলেছেন। ফকীহগণ বলেন, যদি কোন ব্যক্তি তার কাপড় সেলাইয়ের জন্য কোন দর্জির সেবা গ্রহণ করে, তাহলে

---

১. পত্রিকা, সংখ্যা-২৯৩ এবং ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২. ইবন আবেদীন, রাদ্দুল মুখতার, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা নং- ২২৫, وإن للاستعجال كان تفرغه غدا كان صحيحا।

সরবরাহের মেয়াদ অনুযায়ী মজুরীতে কম-বেশি হতে পারে। গ্রাহক (যিনি কাপড় সেলাই করাতে চান) একথা বলতে পারে যে, দর্জি যদি একদিনে কাপড় তৈরি করে দেয়, তাহলে তাকে একশ' টাকা মজুরী দেয়া হবে, আর যদি দু'দিনে তৈরি করে দেয়, তাহলে আশি (৮০) টাকা দেয়া হবে।

এমনিভাবে ইসতিসনা'য় মূল্যকে সরবরাহের সময়ের সাথে সংযুক্ত করা যাবে। উভয়পক্ষ যদি এ ব্যাপারে একমত হয়ে যায় যে, সরবরাহে বিলম্বের ক্ষেত্রে দৈনিক নির্দিষ্ট পরিমাণে মূল্য কমতে থাকবে, তাহলে এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে।

ইস্‌তিস্‌না' পদ্ধতিতে অর্থায়ন

ইস্‌তিস্‌না'কে বিশেষ চুক্তিতে অর্থায়নের সহজতা লাভের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশেষ করে হাউজ বিল্ডিং ফিন্যান্সের ক্ষেত্রে।

যদি গ্রাহকের নিজস্ব জমিন থাকে এবং সে গৃহ নির্মাণের জন্য অর্থায়ন চায়, তাহলে অর্থায়নকারী সেই খালি জমিনে ইসতিসনা'য়ের ভিত্তিতে গৃহ নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। আর যদি গ্রাহকের নিজস্ব জমিন না থাকে এবং সে জমিনও ক্রয় করতে চায়, তাহলেও অর্থায়নকারী এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে যে, সে তাকে এতটুকু জমিনে গৃহ নির্মাণ করে দিবে যা উভয়ের মাঝে পূর্বেই বিস্তারিতভাবে নির্ধারিত থাকবে।

ইসতিসনা যেহেতু মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করা জরুরী নয় এবং পণ্য কব্জা করার সময়ও পরিশোধ করা জরুরী নয় (বরং উভয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে কোন সময় পর্যন্ত মূল্য পরিশোধে বিলম্ব করা যায়[১]) এজন্য উভয় পক্ষের চাহিদা অনুযায়ী মূল্য পরিশোধের তারিখ নির্ধারণ করা যাবে। মূল্য কিস্তিতেও পরিশোধ করা যাবে[২]।

অর্থায়নকারীর জন্য নিজ হাতে গৃহ নির্মাণ করাও জরুরী নয়। বরং সে তৃতীয় কোন পার্টির সাথে প্যারালাল ইসতিসনা চুক্তিতেও অন্তর্ভুক্ত হতে

---

১. ইবন আবেদীন, রাদ্দুল মুখতার, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা নং-৩১১।
২. اتاسي، شرح المجلة ج/٢، ص:٤٠٦ ।

পারবে। কিংবা (গ্রাহক ব্যতীত) অন্য কোন ঠিকাদার থেকেও সেবা গ্রহণ করতে পারবে। উভয় ক্ষেত্রে সে ব্যয়ের হিসাব করে ইসতিসনা মূল্য নির্ধারণ এমনভাবে করতে পারবে যার ফলে ব্যয়ের উপর তার একটি যুক্তিসঙ্গত মুনাফা অর্জিত হয়। এক্ষেত্রে গ্রাহকের পক্ষ থেকে কিস্তি পরিশোধ ঐ সময় থেকেই শুরু করা যাবে যখন উভয়পক্ষ চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে এবং নির্মাণ চলাকালীন ও বাড়ি গ্রাহকের হস্তগত হওয়ার পরও চালু রাখতে পারবে। কিস্তি পরিশোধ নিশ্চিতকল্পে জমিন কিংবা বাড়ি অথবা অন্য কোন সম্পদের মালিকানা সর্বশেষ কিস্তি পরিশোধ পর্যন্ত অর্থায়নকারীর নিকট গ্যারান্টি হিসেবে রাখা যাবে।

অর্থায়নকারীর দায়িত্ব হল, চুক্তিনামার বর্ণনা অনুযায়ী যথাযথভাবে গৃহ নির্মাণ করে দেয়া। যে কোন ধরনের ব্যবধানের পরিপ্রেক্ষিতে যেসব খরচ চুক্তির শর্তানুযায়ী বাড়ি তৈরিতে প্রয়োজন হবে, অর্থায়নকারীকে তা বহন করতে হবে।

ইসতিসনা' পদ্ধতিকে প্রজেক্ট অর্থায়নের (Project Financing) জন্যও উল্লেখিত নিয়মানুযায়ী ব্যবহার করা যাবে। যদি কোন গ্রাহক তার ফ্যাক্টরীতে এয়ারকন্ডিশন প্লান্ট লাগাতে চায় এবং প্লান্ট তৈরির প্রয়োজন হয়, তাহলে অর্থায়নকারী ইসতিসনা' চুক্তির মাধ্যমে পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্লান্ট সরবরাহ করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে। এমনিভাবে ইসতিসনা' চুক্তিকে কোন পোল-সেতু কিংবা মহাসড়ক নির্মাণের জন্যও ব্যবহার করা যাবে।

আধুনিক BOT চুক্তি (ক্রয়কর, চালাওএবংহস্তান্তরকর)কেও ইসতিসনা'র ভিত্তিতে আঞ্জাম দেয়া যায়। যদি কোন দেশ একটি হাইওয়ে সড়ক নির্মাণ করতে চায়, তাহলে সে সড়ক নির্মাণের কোন কোম্পানীর সাথে ইসতিসনা চুক্তি করতে পারবে এবং মূল্য হিসেবে তাকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হাইওয়ে সড়ক চালানো এবং টোল (toll) গ্রহণের অধিকার দেয়া যাবে।

ইসলামী বিনিয়োগ ফান্ড

ইসলামী বিনিয়োগ ফান্ড সংক্রান্ত শর্‌য়ী নীতিমালা

এই অধ্যায়ে "ইসলামী বিনিয়োগ ফান্ড" (Islamic Investment Funds) দ্বারা উদ্দেশ্য এমন যৌথ একাউন্ড (হাউজ) যে একাউন্টে বিনিয়োগকারী তার প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ শামিল করে, যাতে সেসব অর্থ বৈধ মুনাফা অর্জনের জন্য সম্পূর্ণ ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিনিয়োগ করা যায়। অর্থ জমাকারীদেরকে এমন কোন ডকুমেন্টও দেয়া যেতে পারে যা তাদের শামিলকৃত অর্থের স্বীকৃতি প্রদান করবে এবং ফান্ডে কার্যত অর্জিত মুনাফায় তাদের অংশ অনুপাতে মুনাফার অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে[১]। এই ডকুমেন্টকে সার্টিফিকেট, ইউনিট, শেয়ার কিংবা অন্য যে কোন নাম দেয়া যাবে, কিন্তু এগুলোর শর্‌য়ী বৈধতা দু'টি শর্তের সাথে শর্তযুক্ত।

প্রথম শর্ত হচ্ছে, সেগুলোর (সার্টিফিকেটের) গায়ের মূল্য (Face Value) অনুপাতে একটি বিশেষ মুনাফা নির্ধারণ করার পরিবর্তে ফান্ডে অর্জিত প্রকৃত মুনাফার একটি আনুপাতিক অংশ নির্ধারণ করা অপরিহার্য। সুতরাং আসল অর্থের এবং আসল অর্থের সাথে সংযুক্ত কোন নির্দিষ্ট মুনাফার জামানত দেয়া যাবে না। ফান্ডে অর্থ শামিলকারীদের সুস্পষ্ট এই মনোভাব নিয়ে শামিল হওয়া উচিত যে, তাদের অর্জিত লাভ ফান্ডের প্রকৃত অর্জিত মুনাফা কিংবা লোকসানের সাথে সংযুক্ত। যদি ফান্ডের অধিক মুনাফা অর্জিত হয়, তাহলে তাদের মুনাফাও সেই অনুপাতে বেড়ে যাবে। কিন্তু ফান্ডের যদি লোকসান হয়, তাহলে তাদেরকে সেই লোকসানেও অংশীদার হতে হবে, তবে ফান্ডের লোকসান যদি ব্যবস্থাপকদের কোন

1. Buy, Operate and Transfer.

প্রকার উদাসীনতা কিংবা অব্যবস্থাপনার কারণে হয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে এই লোকসান ফান্ড বহন করবে না বরং ফান্ড ব্যবস্থাপকগণ বহন করবে।

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, যে অর্থ একত্রিত করা হয়েছে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য কোন ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে- শুধুমাত্র বিনিয়োগ বিভাগই নয় বরং যেসব শর্তের সাথে চুক্তি হয়েছে সেগুলোও ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী হওয়া অপরিহার্য।

এসব মৌলিক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামী বিনিয়োগ ফান্ড বিনিয়োগের বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে পারে, যেগুলো সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হচ্ছে।

ইকুইটি ফান্ড (Equity Fund)

ইকুইটি ফান্ডে জমাকৃত অর্থ জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর শেয়ারে বিনিয়োগ করা হয়। মুনাফা মৌলিকভাবে মূলধনী মুনাফা (Capital Gain)-এর মাধ্যমে অর্জন করা হয়। অর্থাৎ শেয়ার ক্রয় করে সেগুলোর মূল্য বৃদ্ধির পর বিক্রি করে দেয়া। সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর পক্ষ হতে বণ্টনকৃত বিভক্ত মুনাফার (Dividends) মাধ্যমেও মুনাফা অর্জন করা যায়।

একথা সুস্পষ্ট যে, কোম্পানীর মৌলিক ব্যবসা যদি শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ হয়, তাহলে ইসলামী ফান্ডের জন্য তার শেয়ার ক্রয় করা এবং সেগুলো নিজের কাছে রাখা কিংবা বিক্রি করা জায়েয হবে না। কেননা, এর ফলে শেয়ার হোল্ডারগণ অবৈধ ব্যবসায় সরাসরি জড়িত হয়ে যাবে।

এমনিভাবে সমকালীন আলিমগণ এব্যাপারেও প্রায় একমত যে, যদি কোন কোম্পানীর সমুদয় লেনদেন সম্পূর্ণ শরীয়তসম্মত হয়, যেখানে এ বিষয়টিও শামিল রয়েছে যে, উক্ত কোম্পানী স্বয়ং নিজেও সুদি ঋণ গ্রহণ করে না এবং তার প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সুদি খাতে বিনিয়োগও করে না, তাহলে তার শেয়ার ক্রয় করা এবং সেগুলোকে নিজের কাছে রাখা কিংবা বিক্রি করা কোন রকম শর্য়ী প্রতিবন্ধকতা ব্যতীত বৈধ। কিন্তু বাহ্যত এধরনের কোম্পানী বর্তমান শেয়ার মার্কেটে খুবই দুর্লভ ও বিরল। প্রায়

সকল কোম্পানী কোন না কোনভাবে এমন কোন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকে যা শর্য়ী বিধানের পরিপন্থি। যদিও তাদের মৌলিক কায়-কারবার হালাল। তদুপরি তারা সুদি ঋণ গ্রহণ করে, অপরদিকে নিজেদের অতিরিক্ত অর্থ সুদি খাতে বিনিয়োগ করে কিংবা সেগুলো দ্বারা সুদি বন্ড বা সার্টিফিকেট ক্রয় করে।

বর্তমান শতাব্দীতে এধরনের কোম্পানীর মাসআলা শরীয়ত বিশেষজ্ঞদের গবেষণায় রয়েছে। একদল আলিমের দৃষ্টিভঙ্গী হল কোন মুসলমানের জন্য এধরনের কোম্পানীর শেয়ার লেনদেন করা বৈধ নয়। যদিও সে কোম্পানীর মৌলিক কায়-কারবার হালাল হয়। তাদের মৌলিক যুক্তি হল কোন কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডার সে কোম্পানীর অংশীদার। আর ইসলামী ফিক্‌হের আলোকে প্রত্যেক অংশীদার উক্ত কারবারের ব্যাপারে অপর অংশীদারের উকিল হয়। সুতরাং শুধুমাত্র কোন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করাই শেয়ার হোল্ডারদের পক্ষ হতে কোম্পানীকে এই অধিকার প্রদান করা হয় যে, কোম্পানীর ব্যবস্থাপকগণ যেভাবে ভাল মনে করবে তাদের কারবার চালু রাখবে। যদি শেয়ার হোল্ডারদের এ কথা জানা থাকে যে, কোম্পানী কোন অনৈসলামিক লেনদেনে জড়িত আছে, তদুপরিও উক্ত কোম্পানীর শেয়ার নিজের কাছে রাখে, তাহলে এর অর্থ হবে সে কোম্পানীকে ঐ অনৈসলামি লেনদেনকে চালু রাখার ব্যাপারে অধিকার দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তার শুধুমাত্র অনৈসলামি লেনদেনে সন্তুষ্টি প্রকাশের গুনাহই হবে না, বরং উক্ত লেনদেনও সরাসরি তার দিকে সম্পৃক্ত হবে। কেননা, কোম্পানী কার্যত তার প্রদেয় অধিকারের নিমিত্তেই কাজ করছে।

উপরন্তু যখন কোন কোম্পানীর অর্থায়ন সুদভিত্তিক হয়, তখন তার কায়-কারবারে বিনিয়োগকৃত ফান্ড স্বচ্ছ এবং নির্মল থাকে না। অনুরূপভাবে কোম্পানী তার ব্যাংকে জমাকৃত টাকা-পয়সার উপর সুদ গ্রহণ করে, তাহলে অবশ্যই তার ইনকামে অবৈধ উপাদান অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যা বিভক্ত মুনাফার (Dividends) মাধ্যমে শেয়ার হোল্ডারদের মাঝে বণ্টন হয়।

কিন্তু বর্তমান যুগের বৃহৎ সংখ্যক আলিম এই দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন করেন না। তাদের যুক্তি হল, একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানী মৌলিকভাবে সাধারণ অংশীদারিত্ব (Partnership) থেকে ভিন্নরূপ হয়। সাধারণ অংশীদারিত্বে ব্যবসা পলিসীর সিদ্ধান্ত সকল অংশীদারদের সন্তুষ্টিতে করা হয় এবং প্রত্যেক অংশীদারের ব্যবসা পলিসীর ব্যাপারে ভেটো দেয়ার অধিকার থাকে। এ কারণে অংশীদারিত্বের যাবতীয় কাজকর্ম সরাসরি সকল অংশীদারের দিকে ধাবিত হয়। পক্ষান্তরে জয়েন্ট স্টক কোম্পানীতে ব্যবসা পলিসীর সিদ্ধান্ত সংখ্যাধিক্যের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কোম্পানী যেহেতু বৃহৎ সংখ্যক শেয়ার হোল্ডারের সমন্বয়ে গঠিত হয়, এ কারণে কোম্পানী প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডারকে ভেটো দেয়ার অধিকার প্রদান করতে পারে না। শেয়ার হোল্ডারদের একক রায়সমূহ সংখ্যাধিক্যের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে যেতে পারে। এ কারণে কোম্পানীর যাবতীয় কাজকর্ম প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডারের দিকে সম্পৃক্ত হবে না। যদি কোন শেয়ার হোল্ডার বার্ষিক সাধারণ সভায় (A.G.M.) বিশেষ কোন লেনদেনে তার প্রশ্ন উত্থাপন করে, তদুপরি তার প্রশ্নকে অধিকাংশের রায় অনুযায়ী প্রত্যাখ্যান করে দেয়া হয় তাহলে একথা বলা যাবে না যে, উক্ত শেয়ার হোল্ডার এককভাবে ঐ লেনদেনের অনুমতি প্রদান করেছে। বিশেষ করে সে যখন উক্ত লেনদেন থেকে অর্জিত ইনকাম থেকেও বেঁচে থাকতে সচেষ্ট হয়।

সুতরাং কোন কোম্পানী হালাল ব্যবসা করছে, কিন্তু তার প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সুদি একাউন্টে জমা রাখে, যে একাউন্ট থেকে পরোক্ষভাবে কিছু না কিছু সুদি ইনকামও হয়, এর দ্বারা কোম্পানীর যাবতীয় ব্যবসা অবৈধ হয়ে যাবে না। এখন যদি কোন ব্যক্তি উক্ত কোম্পানীর শেয়ার এই স্বচ্ছ নিয়তে গ্রহণ করে যে, সে ঐ পরোক্ষ চুক্তিরও বিরোধিতা করবে এবং লভ্যাংশের (Dividend) এতটুকু অংশ সে তার ব্যবহারে লাগাবে না, তাহলে একথা কিভাবে বলা যায় যে, সে ব্যক্তি সুদি লেনদেনের অনুমতি প্রদান করেছে? এবং উক্ত লেনদেনকে তার দিকে কিভাবে ধাবিত করা যায়। (?)

এধরণের কোম্পানীর লেনদেনের আরেকটি দিক হল, কোম্পানী কখনো কখনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে ঋণ গ্রহণ করে, আর ঋণ সাধারণত সুদভিত্তিক হয়। এক্ষেত্রেও সেই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। যদি কোন শেয়ার হোল্ডার স্বত্বাগতভাবে এধরণের ঋণ গ্রহনের ব্যাপারে একমত না হয়, কিন্তু সংখ্যাধিক্যের কারণে তার রায়কে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, তাহলে এই ঋণ গ্রহণ তার দিকে সম্পৃক্ত হবে না।

এছাড়া ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী যদিও সুদি ঋণ গ্রহণ করা জঘন্য অপরাধ ও পাপের কাজ, যে ব্যাপারে পরকালে জবাবদিহি করতে হবে, কিন্তু এ গুনাহের কাজের কারণে ঋণগ্রহীতার যাবতীয় ব্যবসা হারাম এবং অবৈধ হয়ে যাবে না। ঋণ হিসেবে গৃহীত অর্থ যেহেতু ঋণগ্রহীতার মালিকানা মনে করা হয়, এ কারণে এ অর্থ দ্বারা যে জিনিস ক্রয় করা হবে তা হারাম হবে না, এজন্য সুদি ঋণ গ্রহণ করার দায়-দায়িত্ব ঐ ব্যক্তির উপরই বর্তাবে যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সুদি লেনদেনে জড়িত হয়েছে, কিন্তু এর দ্বারা কোম্পানীর যাবতীয় কায়-কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য অবৈধ হয়ে যাবে না।

শেয়ারে পুঁজি বিনিয়োগের শর্তাবলী

উল্লেখিত আলোচনার আলোকে কোম্পানীর শেয়ারের ব্যবসা নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে।

(১) কোম্পানীর মৌলিক ব্যবসা শরীয়ত পরিপন্থি না হওয়া। সুতরাং এমন ধরনের কোম্পানীর শেয়ার গ্রহণ করা বৈধ নয়, যে কোম্পানী সুদভিত্তিক অর্থায়ন সেবা প্রদান করে। যেমন ব্যাংক এবং ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর শেয়ার। অথবা এমন কোম্পানীর শেয়ার যে কোম্পানী অন্য কোন অবৈধ ব্যবসায় জড়িত। যেমন যেসব কোম্পানী মদ তৈরি করে কিংবা শূকর এবং হারাম গোশত বিক্রি করে, অথবা যেসব জয়েন্ট স্টক কোম্পানী নাইট ক্লাবের কর্মকান্ড এবং অশ্লীল কাজের সাথে জড়িত রয়েছে।

(২) যদি কোম্পানীর মৌলিক ব্যবসা হালাল হয়। যেমন অটো মোবাইল, টেক্সটাইল ইত্যাদির ব্যবসা। কিন্তু সে কোম্পানী প্রয়োজনাতিরিক্ত পুঁজি সুদি একাউন্টে জমা রাখে কিংবা সুদি-ঋণ গ্রহণ করে, তাহলে শেয়ার হোল্ডারদের অপরিহার্য কর্তব্য হল এ ধরনের লেনদেনের বিরুদ্ধে নিজের অসম্মতি প্রকাশ করা। যার সর্বোত্তম পন্থা হল কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভায় এ ধরনের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করা।

(৩) যদি কোম্পানীর লভ্যাংশে সুদিখাত থেকে অর্জিত কিছু লাভ শামিল থাকে, তাহলে শেয়ার হোল্ডারকে প্রদেয় মুনাফা থেকে সেই অনুপাতে মুনাফার অংশ সদ্‌কা করে দিবে এবং শেয়ার হোল্ডার স্বয়ং নিজে তা থেকে উপকৃত হবে না। যেমন, কোম্পানীর সমুদয় মুনাফার পাঁচ পার্সেন্ট সে সুদিখাত থেকে পেয়েছে, তাহলে মুনাফার পাঁচ পার্সেন্ট সদ্‌কা করে দিবে।

(৪) কোন কোম্পানীর শেয়ার তখনই আদান-প্রদান করা যাবে, যখন সে কোম্পানী কিছু দ্রব্যগত সম্পদেরও মালিক থাকবে। যদি কোম্পানীর যাবতীয় সম্পদ তারল্যের আকৃতি হয় অর্থাৎ মুদ্রার (Money) আকৃতি হয়, তাহলে এর শেয়ার গায়ের মূল্য অনুযায়ীই ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে শেয়ার শুধুমাত্র নগদ টাকার (Money) প্রতিনিধিত্ব করে, আর মুদ্রার আদান-প্রদান শুধুমাত্র উভয়দিকে সমান সমান হলেই করা যায়।

কোন কোম্পানীর শেয়ার আদান-প্রদান বৈধতার জন্য জড়-সম্পদ কতভাগ হওয়া আবশ্যক? এ প্রশ্নের ব্যাপারে সমকালীন আলিমদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। কারো কারো মত হল, জড়-সম্পদ কমপক্ষে শতকরা ৫১% হওয়া আবশ্যক। তাঁদের যুক্তি হল, যদি জড়-সম্পদ ৫১% থেকে কম হয়, তাহলে অধিকাংশ সম্পদ তরল আকৃতির হবে, যার ফলে সমুদয় সম্পদের উপর তারল্যের হুকুমই প্রযোজ্য হবে। কেননা, ফিক্‌হের উসূল হল للأكثر حكم الكل "অধিকাংশের ভিত্তিতে পূর্ণের হুকুম আরোপ করা হয়"।

কোন কোন আলিমের দৃষ্টিভঙ্গি হল, যদি কোন কোম্পানীর জড় সম্পদ শতকরা ৩৩%ও হয়, তাহলেও ঐ কোম্পানীর শেয়ার লেনদেন করা যাবে।

তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি হল ফিক্‌হে হানাফীর উপর, ফিক্‌হে হানাফীর উসূল হল, যদি কোন কোম্পানীর সম্পদ নগদ অর্থ এবং পণ্য মিশ্রিত হয়, তাহলে তার নগদ অংশের অনুপাতের দিকে দৃষ্টিপাত না করে তার শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে, তবে এ উসূল দু'টি শর্তের সাথে শর্তযুক্ত।

প্রথম শর্ত হল, এই সমুদয় সম্পদে জড়-সম্পদের অংশ একেবারে যৎসামান্য না হতে হবে। যার অর্থ হচ্ছে জড়-সম্পদ উল্লেখযোগ্য এবং উপযুক্ত পরিমাণে থাকতে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত হল, সমুদয় সম্পদের মূল্য তাতে অন্তর্ভুক্ত তরল-সম্পদ অপেক্ষা অধিক হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ ১০০ ডলার মূল্যমানের শেয়ার যদি ৭৫ ডলার এবং আরো কিছু জড়-সম্পদের প্রতিনিধিত্ব করে, তাহলে শেয়ারের মূল্য ৭৫ ডলার থেকে অধিক হতে হবে। এক্ষেত্রে শেয়ারের মূল্য যদি ১০৫ ডলার ধার্য করা হয়, তার অর্থ হবে ৭৫ ডলার ৭৫ ডলারের বিনিময়ে এবং অবশিষ্ট ৩০ ডলার জড়-সম্পদের বিনিময়ে। পক্ষান্তরে এই শেয়ারের মূল্য যদি ৭০ ডলার ধার্য করা হয়, তাহলে তা বৈধ হবে না। কেননা, এ ক্ষেত্রে ৭৫ ডলার শেয়ারের মূল্য ৭৫ ডলারের কমে হয়ে যাবে, আর এ ধরনের আদান-প্রদান সুদের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত, ফলে তা বৈধ নয়। এমনিভাবে উল্লিখিত উদাহরণে শেয়ারের মূল্য যদি ৭৫ ডলার ধার্য করা হয়, তাহলেও বৈধ হবে না। কেননা, আমরা যদি মনে করি, ৭৫ ডলারের শেয়ার ৭৫ ডলারের বিনিময়ে, তাহলে শেয়ারের বিপরীতে জড়-সম্পদের দিকে মূল্যের কোন অংশ পাওয়া যাবে না। যার কারণে মূল্যের (৭৫ ডলারের) কিছু না কিছু অংশ অবশ্যই শেয়ারের জড়-সম্পদের বিনিময়ে মনে করা হবে। এ কারণে এ চুক্তি সঠিক হবে না। তবে বাস্ত বিকপক্ষে এটা শুধুমাত্র অলিক এবং কাল্পনিক ধারণা বৈ কিছুই নয়। কেননা এমন পরিস্থিতির কল্পনা করাও কঠিন, যে পরিস্থিতে শেয়ারের মূল্য তরল-সম্পদ অপেক্ষাও কম হয়ে যাবে।

এসব শর্তসাপেক্ষে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। এর আলোকে ইসলামিক ইকুইটি ফান্ড গঠন করা যেতে পারে। ফান্ডে অর্থ জমাকারীগণ শরীয়তের দৃষ্টিতে পরস্পরে একে অপরের অংশীদার ধর্তব্য হবে। শামিলকৃত সমুদয় অর্থ দ্বারা একটি যৌথ একাউন্ট (হাউজ) গঠিত হয়ে যাবে এবং তাকে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ের জন্য ব্যবহার করা যাবে। মুনাফা সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর পক্ষ হতে লভ্যাংশের (Dividends) মাধ্যমেও অর্জন করা যাবে এবং শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমেও অর্জন করা যাবে। প্রথম পদ্ধতিতে অর্থাৎ যখন মুনাফা কোম্পানীর বণ্টনকৃত মুনাফার মাধ্যমে অর্জন করা হবে, তখন মুনাফার সেই বিশেষ আনুপাতিক হার খয়রাত করা অপরিহার্য হবে, যে পরিমাণ মুনাফা কোম্পানীর সুদের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। সমকালীন ইসলামিক ফান্ড এ পদ্ধতির জন্য Purification (পবিত্রকরণ) পরিভাষা তৈরি করেছে।

মুনাফা Capital Cain এর মাধ্যমে অর্জিত হওয়ার ক্ষেত্রে পবিত্রকরণ আবশ্যক হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে সমকালীন আলিমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। (অর্থাৎ স্বল্পমূল্যে শেয়ার ক্রয় করে তাকে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করা)। কোন কোন আলিমের মত হল, মুনাফা যদি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় (Capital Cain)-এর মাধ্যমে অর্জন করা হয়, তাহলেও পবিত্রকরণ অপরিহার্য। কেননা, শেয়ারের বাজারমূল্যে সুদের উপাদানও প্রতিফলিত হতে পারে, যা কোম্পানীর সম্পদে অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হল, শেয়ার যদি বিক্রি করে দেয়া হয়, তাহলে কোন রকম পবিত্রকরণের প্রয়োজন নেই, যদিও বিক্রির ফলে মুনাফাও অর্জিত হয়ে থাকে। এর যুক্তি হল, শেয়ারের মূল্যের কোন নির্দিষ্ট অংশকে ঐ সুদের সাথে নির্দিষ্ট করা যাবে না যা কোম্পানীর অর্জিত হয়েছে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, যদি শেয়ার হালাল হওয়ার যাবতীয় শর্তের প্রতি লক্ষ্য করা হয়ে থাকে, তাহলে কোম্পানীর অধিকাংশ সম্পদ হালাল। এ কোম্পানীর সম্পদের একেবারে যৎসামান্য একটি অংশ এমন হবে যা সুদি উপার্জনের মাধ্যমে অর্জিত হবে। এ যৎসামান্য আনুপাতিক হার শুধুমাত্র এতটুকু নয় যা অজ্ঞাত, বরং কোম্পানীর অবশিষ্ট অধিকাংশ সম্পদের বিপরীতে দৃষ্টিপাত করার উপযুক্ত। এ কারণে শেয়ারের মূল্য মূলত কোম্পানীর সেই অধিকাংশ সম্পদের বিপরীতে যৎসামান্য

আনুপাতিক হারের বিপরীতে নয়। এজন্য শেয়ারের সম্পূর্ণ মূল্য শুধুমাত্র হালাল সম্পদের মূল্য ধরা যায়।

যদিও দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিও অনুল্লেখযোগ্য নয় তবে প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি অধিক সতর্কতামূলক এবং সন্দেহ-সংশয়ের অনেক উর্ধ্বে। এই দৃষ্টিভঙ্গি ওপেন ইনডেড করা ফান্ডে (Open Ended Fund) (যে ফান্ডের পক্ষ থেকে ইউনিট হোল্ডার থেকে পুনর্বার ইউনিট ক্রয় করার অঙ্গীকার হয়) অধিক ন্যায়সঙ্গত। কেননা, যদি শেয়ারের মূল্যে সংযোজিত মুনাফায় পবিত্রকরণ না করা হয় এবং কোন ব্যক্তি তার ফান্ডের ইউনিট এমন সময় ফেরৎ (Redeem) দেয়, যখন ফান্ড নিজের কাছে বিদ্যমান শেয়ারসমূহের কোন শেয়ার থেকে বার্ষিক লভ্যাংশ (Dividend) অর্জন করেনি। তখন সেই ইউনিট ফেরৎ দেয়ার সময় (ইউনিট হোল্ডারকে তার অর্থ পরিশোধ করার সময়) তার মূল্য থেকে পবিত্রকরণের ভিত্তিতে কোন রকম হ্রাস করা যাবে না। যদিও এমন হতে পারে যে, ফান্ডের নিকট বিদ্যমান শেয়ারের মূল্যে সংযোজনের কারণে ইউনিটের মূল্যেও সংযোজন হয়ে গিয়েছে। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি তার ইউনিট এমন সময় ফেরৎ দেয় যখন ফান্ড বার্ষিক কিছু লভ্যাংশ (Dividend) অর্জন করে নিয়েছে এবং তার থেকে পবিত্রকরণের অর্থও বের করা হয়েছে, যার কারণে প্রত্যেক ইউনিটের বিপরীতে প্রাপ্ত সম্পদ হ্রাস পেয়েছে, তাহলে প্রথম ব্যক্তি অপেক্ষা এ ব্যক্তির ইউনিটের মূল্য কম উসূল হয়েছে।

পক্ষান্তরে পবিত্রকরণ যদি ডেভিডেন্ড-এরও হয় এবং মূল্য বৃদ্ধির কারণে অর্জিত মুনাফায়ও হয়, তাহলে পবিত্রকরণের (Purification) জন্য অর্থ বিয়োজনের সূত্রে সকল ইউনিট হোল্ডারদের সাথে এক ধরনের রীতি-নীতি অবলম্বন করা হবে। এ কারণে ক্যাপিটাল গেইনেও পবিত্রকরণ শুধুমাত্র এটা নয় যে, সন্দেহ-সংশয় মুক্ত হবে, বরং এটা সকল ইউনিট হোল্ডারদের জন্য অধিক সমতাপূর্ণ হয়। এ পবিত্রকরণ কোম্পানীর বার্ষিক অর্জিত সুদের হারের ভিত্তিতে করা যেতে পারে। (অর্থাৎ এটা দেখা হবে যে, কোম্পানীর আনুপাতিকহারে কি পরিমাণ সুদ অর্জন হয়)।

ফান্ড ব্যবস্থাপকদের পারিশ্রমিক

ফান্ডের পদ্ধতি এবং রীতি-নীতি দু'ভাবে পরিচালনা করা যেতে পারে। প্রথম পদ্ধতি হল, ব্যবস্থাপকগণ অর্থ বিনিয়োগকারীদের (ইউনিট হোল্ডারদের) জন্য মুদারিব হিসেবে কাজ করবে। এ ক্ষেত্রে ফান্ডের অর্জিত বার্ষিক মুনাফা থেকে শতকরা একটি নির্দিষ্ট আনুপাতিক হার ব্যবস্থাপকদের পারিশ্রমিক হিসেবে ধার্য করা যেতে পারে। যার অর্থ হল, ব্যবস্থাপকগণ সে ক্ষেত্রেই তাদের আনুপাতিক অংশ পাবে যখন ফান্ডে কিছু মুনাফা অর্জিত হবে। যদি ফান্ডের কোন মুনাফা অর্জিত না হয়, তাহলে ব্যবস্থাপকগণও কোন জিনিসের পাওনাদার হবে না। মুনাফা বৃদ্ধির কারণে ব্যবস্থাপকদের অংশও বেড়ে যাবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি এটা হতে পারে যে, ব্যবস্থাপকগণ অংশীদারদের উকিল হিসেবে কাজ করবে। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকদেরকে তাদের পরিশ্রমের বিনিময়ে পূর্বনির্ধারিত ভাতা দেয়া যেতে পারে। এই ভাতা এককালীনও হতে পারে এবং মাসিক কিংবা বার্ষিক ভিত্তিতেও হতে পারে। বর্তমান যুগের আলিমদের মতানুযায়ী এই ভাতা ফান্ডের সমুদয় সম্পদের বিশেষ কোন আনুপাতিক হারের ভিত্তিতেও হতে পারে। যেমন- এরূপ নির্ধারণ করা যেতে পারে যে, ব্যবস্থাপকগণ ফান্ডের সম্পদের সমুদয় মূল্যের ২% কিংবা ৩% সম্পদ বছরের শেষে গ্রহণ করবে।[১]

তদুপরি ফান্ড শুরু করার পূর্বে উল্লিখিত পদ্ধতিসমূহ থেকে যে কোন একটি নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। তার কার্যকর পদ্ধতি এরূপ হতে পারে যে, ফান্ডের প্রসপেক্টাসে এ বিষয় স্পষ্ট করে দেয়া যে, ব্যবস্থাপকদের পারিশ্রমিক কিসের ভিত্তিতে দেয়া হবে। সাধারণত এরূপই মনে করা হয় যে, যে কোন ব্যক্তিই ফান্ডে তার অংশ বিনিয়োগ করে সে প্রসপেক্টাসে বর্ণিত শর্তের সাথে একমত পোষণ করে। এ কারণে (প্রসপেক্টাসে

১. এই পদ্ধতি দালালীর সাদৃশ্য হওয়ার কারণে বৈধ। কেননা, তার (দালালীর) ভাতা শতকরার ভিত্তিতে হলেও বৈধ।

পারিশ্রমিকের পদ্ধতি বর্ণিত থাকার ক্ষেত্রে) এ পদ্ধতি সম্পর্কেও এটাই মনে করা হবে যে, তার সাথে সকল অংশীদার একমত পোষণ করে নিয়েছে।

ইজারা ফান্ড

ইসলামী ফান্ডের আরেকটি প্রক্রিয়া ইজারা ফান্ডও হতে পারে। "ইজারা" অর্থ ভাড়ায় প্রদান করা। এর নিয়ম-নীতি সম্পর্কে এ গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ ফান্ডে মানুষের জমাকৃত অর্থ বাড়ি, মোটর গাড়ি এবং অন্যান্য মাল-সামান ক্রয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়, যাতে সেগুলোর ভোগ-ব্যবহারকে ভাড়া হিসেবে প্রদান করা যায়। ফান্ডই সে সব সম্পদের মালিক থাকে, ব্যবহারকারী থেকে ভাড়া নেয়া হয় এবং এ ভাড়া ফান্ডের জন্য আয়ইনকামের উপকরণ হয়। যা অর্থ জমাকারীদের (Subscribers) মাঝে তাদের অংশ অনুপাতে বণ্টিত হয়ে যায়। প্রত্যেক অংশীদারকে (Subscribers) একটি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। যা ভাড়ায় প্রদানকৃত সম্পদে তার আনুপাতিক অংশের মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে এবং তাকে ইনকামে তার অংশের হকদার হওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করে। এ সার্টিফিকেটকে পূর্ববর্তী ইসলামী ফিক্‌হের প্রসিদ্ধ পরিভাষায় "চেক" বলা হয়। যেহেতু এ চেক তার বাহকের জড়-সম্পদে আনুপাতিক অংশের মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে তরল সম্পদ কিংবা ঋণের প্রতিনিধিত্ব করে না, সেহেতু পরিপূর্ণরূপে তা আদান-প্রদানযোগ্য এবং স্টক মার্কেটে তা ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে। যে ব্যক্তি এ চেক ক্রয় করবে সে সংশ্লিষ্ট সম্পদের আনুপাতিক অংশের মালিকানায় বিক্রেতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায় এবং মূল অংশ জমাকারীর দায়-দায়িত্ব তার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। এসব চেকের মূল্য বাজারের শক্তি (চাহিদা ও সরবরাহ) অনুযায়ী নির্ধারিত হয় এবং সাধারণত তার মুনাফার উপর নির্ভরশীল হয়।

এতদ্ব্যতীত একথা মনে রাখা উচিত যে, ইজারার (Lease) যাবতীয় চুক্তি শরয়ী নীতিমালা অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। যা কার্যত আধুনিক ইজারার অর্থায়ন (Financial Lease) থেকে ভিন্নরূপ। উভয়ের মাঝে পার্থক্যের বর্ণনা এ গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে।

তদুপরি কয়েকটি মৌলিক নীতিমালা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।

(১) ভাড়ায় (লিজে) প্রদানকৃত সম্পদ ভোগ-ব্যবহারের উপযুক্ত হতে হবে এবং ভাড়া ঐ সময় থেকে উসূল করা হবে যখন থেকে এ ভোগ-ব্যবহারের অধিকার ইজারাদারকে (Leassee) প্রদান করা হবে।

(২) ইজারায় প্রদানকৃত সম্পদ এমন ধরনের হতে হবে যা হালাল এবং বৈধভাবে ভোগ-ব্যবহার করা যায়।

(৩) মালিকানার কারণে অর্পিত যাবতীয় দায়-দায়িত্ব ইজারাদাতা (Lessor) গ্রহণ করবে।

(৪) প্রকৃত চুক্তির প্রারম্ভেই ভাড়া নির্দিষ্ট এবং উভয়পক্ষের পরিজ্ঞাত হতে হবে।

এ ধরনের ফান্ডে ব্যবস্থাপকগণ অংশীদারদের (Subscribers) উকিল বা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবে এবং তাকে তার শ্রমের বিনিময়ে ফিস (পারিশ্রমিক) দেয়া হবে। ব্যবস্থাপকদের ফিস একটি নির্দিষ্ট পরিমাণও হতে পারে কিংবা উসূলকৃত ভাড়ার আনুপাতিক অংশ অনুযায়ীও হতে পারে। অধিকাংশ ফিক্‌হবিদের মাযহাব অনুযায়ী এ ধরনের ফান্ড "মুদারাবার" রূপ দেয়া যাবে না। কেননা, তাদের মাযহাব অনুযায়ী মুদারাবা পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে এবং তাকে সেবা (Services) কিংবা ইজারার পর্যন্ত সুযোগ দেয়া যাবে না। কিন্তু হাম্বলী ফিক্‌হ অনুযায়ী মুদারাবা ইজারা এবং সেবার উপরও হতে পারে। অনেক সমকালীন আলিম এই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

পণ্য ফান্ড

ইসলামী ফান্ডের আরেকটি প্রক্রিয়া "পণ্য ফান্ড" হতে পারে। এ ধরনের ফান্ডে জমাকৃত অর্থ বিভিন্ন পণ্য ক্রয়ে ব্যবহার করা যাবে। যাতে সেগুলোকে পরবর্তীতে বিক্রি করা যায়। এভাবে বিক্রি করার দ্বারা যে

মুনাফা অর্জিত হবে তা ফান্ডের আয় হিসেবে গণ্য হবে, যা অর্থ জমাকারীদের (Subscribers) মাঝে অংশ অনুপাতে বণ্টন করা হবে।

এ ফান্ডকে শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য করার জন্য ক্রয়-বিক্রি সংক্রান্ত শর্য়ী বিধি-বিধানের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য। যেমন-

(১) বিক্রিত পণ্য বিক্রির সময় বিক্রেতার মালিকানায় থাকতে হবে, এ কারণে সর্ট সেল (কোন জিনিস মালিকানায় আসার পূর্বে বিক্রয়ে করা) শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়।

(২) ভবিষ্যতের সাথে সম্পৃক্ত বিক্রি (Forward Sale) সালাম এবং ইসতিসনা' ব্যতীত বৈধ নয়। (সালাম এবং ইসতিসনা' সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পূর্বের অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

(৩) যে পণ্যে ব্যবসা হচ্ছে তা হালাল হতে হবে, এ কারণে মদ, শূকর এবং অন্যান্য হারাম মালের ব্যবসাও বৈধ নয়।

(৪) বিক্রেতা যে পণ্য বিক্রি করতে ইচ্ছুক তাতে তার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কব্জা থাকতে হবে। (পরোক্ষ কব্জায় এমন প্রত্যেক কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার মাধ্যমে ঐ জিনিসের ঝুঁকি (Risk) অন্য ব্যক্তির দিকে অর্পিত হয়ে যায়)।

(৫) ঐ জিনিসের মূল্য নির্ধারিত এবং উভয়পক্ষের মাঝে পরিজ্ঞাত থাকতে হবে। এমন মূল্য যা অনির্দিষ্ট কিংবা কোন অনিশ্চিত ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত হবে এর দ্বারা বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে।

এসব শর্ত এবং এ ধরনের অন্যান্য শর্তাবলী যা এ গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে, সেগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে এ কথা সহজেই বোধগম্য হয় যে, বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত পণ্য মার্কেট কিংবা আর্থিক মার্কেট (Financial Market) কোনটিই উপরোল্লেখিত শর্তাবলীর আওতায় পরিচালিত হয় না। তাই ইসলামী পণ্য ফাণ্ড (Islamic Commodity Fund) এ ধরণের চুক্তির আওতাধীন হতে পারে না। তদুপরি পণ্য ফাণ্ড তখনই গঠন করা যেতে পারে যখন শরীঅতের পূর্ণ বিধি-বিধানের প্রতি লক্ষ্য রেখে উপরোক্ত শর্তসমূহ বাস্তবিকভাবেই মেনে চলা সম্ভবপর হয়। তাহলে "পণ্যের ফান্ড" (Commodity Fund) গঠন

করা যেতে পারে। এ ধরনের ফান্ডের ইনউনিটও ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে। তবে শর্ত হল ফান্ডের মালিকানায় সর্বদা কিছু পণ্য থাকতে হবে।

মুরাবাহা ফান্ড

মুরাবাহা ক্রয়-বিক্রয়ের এক বিশেষ প্রকার। যে ক্রয়-বিক্রয়ে পণ্যের মূল ব্যয়ের উপর অতিরিক্ত মুনাফা সংযোজন করে বিক্রি করা হয়। ক্রয়-বিক্রয়ের এ প্রকারকে বর্তমান যুগের ইসলামী ব্যাংকসমূহ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থায়ন পদ্ধতি (Mode of Finance) হিসেবে গ্রহণ করেছে। এসব ব্যাংক তার গ্রাহকের জন্য কোন জিনিস ক্রয় করে এবং সে গ্রাহকের নিকট পণ্যের ব্যয়ের উপর পূর্বনির্ধারিত আনুপাতিক হারে মুনাফা সংযোজন করে বাকিতে বিক্রি করে। যদি কোন ফান্ড এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য অস্তিত্ব লাভ করে, তাহলে এর ইউনিট স্টক মার্কেটে ক্রয়-বিক্রয়ের যোগ্য হবে না। কেননা, মুরাবাহার মাধ্যমে সাধারণত আর্থিক প্রতিষ্ঠানে যা ঘটে থাকে তাহল পণ্য ক্রয় করে তাৎক্ষণিকভাবেই গ্রাহকের নিকট বিক্রি করে দেয় এবং বাকির কারণে যে মূল্য ধার্য হয় তা গ্রাহকের উপর পরিশোধযোগ্য ঋণ হয়ে যায়। এ কারণে মুরাবাহার এ যৌথ ফান্ড কোন জড় সম্পদের মালিক নয়। এ যৌথ ফান্ড হয়ত নগদ অর্থ কিংবা উসূলযোগ্য ঋণের (Debts) মালিক হয়। এ জন্য এ ফান্ডের ইউনিট মুদ্রা (Money) কিংবা উসূলযোগ্য ঋণের প্রতিনিধিত্ব করে। যেরূপ পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ দু'টি জিনিস আদান-প্রদানযোগ্য নয়। যদি এগুলোকে অর্থের বিনিময়ে আদান-প্রদান করতে হয়, তাহলে সমমূল্যে হওয়া আবশ্যক।

ঋণ বিক্রয়

এখানে প্রশ্ন হয় যে, ঋণ বিক্রি শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি অবৈধ। যদি কোন ব্যক্তির অন্যের উপর এমন ঋণ থাকে যা উসূলযোগ্য এবং সে উক্ত ঋণকে ডিসকাউন্ট করে (কম মূল্যে) বিক্রি করতে চায়, যেরূপ

সাধারণত বিনিময় বিলে (Bill of exchange) হয়ে থাকে, তাকে শরীয়তের পরিভাষায় بيع الدين বলে। পূর্ববর্তী ফিক্হবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, ডিসকাউন্ট করে (কম মূল্যে) ঋণ বিক্রি বৈধ নয়। সমকালীন আলিমদের বিরাট অংশের দৃষ্টিভঙ্গিও এরূপ। তবে মালয়েশিয়ার কোন কোন আলিম এ ধরনের বিক্রিকে বৈধ বলে সাব্যস্ত করেছেন। তারা সাধারণত শাফি'য়ী ফিক্হবিদদের একটি উসূলকে রেফারেন্স হিসেবে প্রদান করে থাকেন। যে উসূলে بيع الدين কে বৈধ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা এ মূলতত্ত্বের দিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি যে, শাফি'য়ী ফিক্হবিদগণ بيع الدين এর অনুমতি শুধুমাত্র ঐ ক্ষেত্রে দিয়েছেন যখন তাকে সমান মূল্যে বিক্রি করা হবে।

মূলতত্ত্ব হল, بيع الدين এর নিষিদ্ধতা সুদের নিষিদ্ধতার একটি যৌক্তিক ফলাফল। এমন ঋণ যা অর্থের (Money) আকৃতিতে উসূলযোগ্য হয় তার হুকুমও মুদ্রার (Money) মত। আর যখন মুদ্রার বিনিময়ে তদসদৃশ্য মুদ্রার বিক্রি হবে তাহলে মূল্য সমপরিমাণ হওয়া আবশ্যক। যে কোন দিকে কম-বেশি সুদের সাদৃশ্য হয়ে যাবে এবং শরীয়ত তা কোনভাবেই অনুমোদন করে না।

কোন কোন আলিম এই যুক্তি পেশ করেন যে, ঋণ বিক্রির অনুমতি ততটুকু পর্যন্ত সীমাবদ্ধ যখন ঋণ কোন জিনিস বিক্রি করার কারণে অস্তিত্বে আসে। সে ক্ষেত্রে তাদের বর্ণনা অনুযায়ী ঋণ বিক্রিত জিনিসের প্রতিনিধিত্ব করে এবং ঐ ঋণ বিক্রিকে সে জিনিসের বিক্রিই মনে করা উচিত। কিন্তু এ যুক্তি সম্পূর্ণ অহেতুক। কেননা, দ্রব্য একবার বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর তার মালিকানা ক্রেতার দিকে চলে যায়, সে জিনিস তখন আর বিক্রেতার মালিকানায় থাকে না। বিক্রেতা তখন শুধুমাত্র অর্থের (Money) মালিক হয়, এ কারণে সে যদি ঋণ বিক্রি করে, তাহলে মূলত তা অর্থই বিক্রি করা হয় এবং তাকে কোনভাবেই পণ্য বিক্রি মনে করা যায় না।

এ কারণেই সমকালীন আলিমদের অনেকেই এ দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করেননি। ইসলামী ফিক্হ একাডেমী জেদ্দাহ, যা শরীয়ত বিজ্ঞজনের

সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন, যে সংগঠনে মালয়েশিয়াসহ সকল মুসলিম দেশের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করে। উক্ত সংগঠনও ঋণ বিক্রির নিষিদ্ধতাকে সর্বসম্মতিক্রমে কোন ধরনের বিরোধিতা ব্যতীত গ্রহণ করেছে।

মিশ্রিত ইসলামী ফান্ড

ইসলামী ফান্ডের প্রক্রিয়া আরেকটি হতে পারে, যে প্রক্রিয়ায় মানুষের জমাকৃত অর্থ বিনিয়োগের বিভিন্ন প্রকার যেমন ইকুইটি, লিজ (ইজারা) পণ্যের ব্যবসা ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করা হবে তাকে "মিশ্রিত ইসলামী ফান্ড" (Mixed Islamic Fund) বলা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে ফান্ডের যদি জড়-সম্পদ ৫১% থেকে অধিক এবং তরল-সম্পদ এবং ঋণ ৫০% থেকে কম হয়, তাহলে ফান্ডের ইউনিট ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য হবে, এতদ্ব্যতীত তরল-সম্পদ এবং ঋণ যদি ৫০% থেকে অধিক হয়, তাহলে সমকালীন অধিকাংশ আলিমের মতানুযায়ী সেগুলোর ব্যবসা করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে ক্লোজ এণ্ডেড ফাণ্ড (Close Ended Fund) হওয়া আবশ্যক। (অর্থাৎ এমন ফান্ড যার ইউনিট পুনর্বার ক্রয়ের ব্যাপারে ফান্ডের পক্ষ থেকে অঙ্গীকার থাকবে না)।

সীমাবদ্ধ দায়ের অর্থায়ন পদ্ধতি

সীমাবদ্ধ দায়ের (Limited Liability) চিন্তা-ভাবনা মুসলিম দেশসহ সমগ্র আধুনিক পৃথিবীতে বৃহৎ পরিসরে ব্যবসায়িক এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান হয়ে গিয়েছে। এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য এ পদ্ধতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে এ পদ্ধতি খালেছ ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থায় গ্রহণযোগ্য কি না তা পর্যালোচনা করা।

"সীমাবদ্ধ দায়" আধুনিক আইনগত এবং অর্থনীতির পরিভাষা অনুযায়ী এমন একটি পরিস্থিতি, যে পরিস্থিতে কোন ব্যবসার অংশীদার কিংবা শেয়ার হোল্ডার নিজেকে ঐ অর্থ থেকে অধিক দায়িত্ব বহন করা থেকে নিরাপদ রাখে, যে পরিমাণ অর্থ সে সীমাবদ্ধ দায়যুক্ত কোম্পানী কিংবা অংশীদারিত্বে (Partnership) বিনিয়োগ করেছে। যদি ব্যবসায় লোকসান হয়ে যায়, তাহলে একজন শেয়ার হোল্ডার বেশির চেয়ে বেশি ততটুকু পরিমাণ লোকসান বহন করবে যতটুকু পরিমাণ পুঁজি সে বিনিয়োগ করেছে। কিন্তু এ লোকসান তার ব্যক্তিগত সম্পদ পর্যন্ত পৌঁছবে না। যদি কোম্পানীর সম্পদ তার (ঋণ ইত্যাদির) দায়িত্ব থেকে মুক্তির জন্য যথেষ্ট না হয়, তাহলে ঋণদাতা শেয়ার হোল্ডারদের ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে তাদের উসূলযোগ্য অবশিষ্ট ঋণের দাবি করতে পারবে না।

যদিও কোন কোন দেশে সীমাবদ্ধ দায়ের অর্থায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ শুধুমাত্র অংশীদারিত্বের (Partnership) উপরও করা হয়, কিন্তু অধিক হারে এর প্রয়োগ কোম্পানী এবং কর্পোরেট ব্যবস্থার (অর্থাৎ যেগুলোকে আইনানুগ এক ব্যক্তি মনে করা হয়েছে) উপর হয়ে থাকে। বরং হয়ত একথা বলাও সঠিক হবে যে, সীমাবদ্ধ দায়ের অর্থায়ন পদ্ধতি মূলত কর্পোরেট বডিজ এবং জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর অস্তিত্ব লাভ দ্বারাই প্রকাশ

হয়ে থাকে। এ চিন্তা-ভাবনা পরিচয় করানোর মৌলিক কারণ এটাই ছিল যে, বৃহদায়তনের যৌথ ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের দিকে অধিক হারে মানুষদেরকে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদেরকে এ নিশ্চয়তা প্রদান করা যে, তারা যদি তাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ ঐসব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পুঁজি হিসেবে বিনিয়োগ করে, তাহলে তাদের ব্যক্তিগত সম্পদ আশংকায় থাকবে না। কার্যত আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যে এ পদ্ধতি নিজেকে বৃহৎ পরিমাণে পুঁজি বিনিয়োগকারীদের বৃহৎ পুঁজি বিনিয়োগ করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ শক্তিশালী পদ্ধতি হিসেবে প্রমাণিত করেছে।

সীমাবদ্ধ দায়ের অর্থায়ন পদ্ধতি শেয়ার হোল্ডারদের জন্য অবশ্যই লাভজনক। কিন্তু সাথে সাথে তা ঋণদাতাদের (Creditors) জন্য ক্ষতির কারণও হতে পারে। যদি একটি লিমিটেড কোম্পানীর দায়-দায়িত্ব তার সম্পদ অপেক্ষা বেড়ে যায় এবং কোম্পানী দেউলিয়া হয়ে যায় ফলে তার সমুদয় সম্পদ তরল (Liquidation) হয়ে যায়, তাহলে ঋণদাতাগণ তাদের পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কেননা, তারা কোম্পানীর সম্পদের তারল্যের মূল্যই উসূল করতে পারে এবং তাদের কাছে অবশিষ্ট পাওনা কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারদের থেকে উসূল করার কোন মাধ্যম নেই। এমনকি কোম্পানীর ডাইরেক্টরগণকেও ঋণদাতাদের পাওনা পরিশোধের দায়িত্বশীল সাব্যস্ত করা যাবে না। সীমাবদ্ধ দায়ের অর্থায়ন পদ্ধতির এ প্রসংগটি এমন যা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণার দাবি রাখে।

যদিও আধুনিক ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ দায়ের অর্থায়ন পদ্ধতি নতুন এবং ইসলামী ফিক্‌হের মূল গ্রন্থাবলীতে তার ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না, কিন্তু হাদীস এবং ইসলামী ফিক্‌হের নির্ধারিত মূলনীতি এবং উসূলের আলোকে তার সম্পর্কে শর্‌য়ী দৃষ্টিভঙ্গি জানা যায়। এ উদ্দেশ্যের জন্য প্রয়োজন হল, যারা ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখে তারা তাদের ইজতিহাদকে কাজে লাগাবে। তবে উত্তম হল, শরীয়ত বিজ্ঞজন এ ইজতিহাদ সামষ্টিকভাবে করা, কিন্তু প্রাথমিকভাবে কিছু একক প্রচেষ্টাও হওয়া উচিত, যা সামষ্টিক প্রচেষ্টার জন্য মৌলিক কাজে আসবে।

লেখক শরীয়তের সাধারণ একজন তালেবে ইল্ম হওয়ার সুবাদে দীর্ঘদিন পর্যন্ত এ মাসআলার ব্যাপারে গবেষণায় রত, এ প্রসংগে যা কিছু পেশ করা হচ্ছে তা এ বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত ফায়সালা মনে করা যাবে না। তা শুধু এ বিষয়ে প্রাথমিক চিন্তা-ভাবনা। এ আলোচনার উদ্দেশ্য অধিক গবেষণার জন্য মৌলিক সুযোগ করে দেয়া।

সীমাবদ্ধ দায়ের প্রশ্নের ব্যাপারে বলা যেতে পারে যে, এটা আধুনিক কর্পোরেট বডিজাকে আইনত এক ব্যক্তির হিসেবে ধারণা করা হয় তার সাথে সংযুক্ত। এ ধারণা অনুযায়ী একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানী স্বত্বাগতভাবে একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং ব্যক্তি বিশেষের মর্যাদা রাখে, যা তার শেয়ার হোল্ডারদের ভিন্ন অস্তি থেকে পৃথক। এ পৃথক অস্তিত্ব আইনত একজন আইনত ব্যক্তির মর্যাদা রাখে, যা বাদী এবং বিবাদী হতে পারে, চুক্তি করতে পারে, নিজের নামে সম্পদ রাখতে পারে এবং সকল চুক্তিতে সাধারণ ব্যক্তির আইনগত মর্যাদা রাখে।

এ প্রসংগে মৌলিক জিজ্ঞাসা হল শরীয়তের দৃষ্টিতে شخص قانوني "আইনত এক ব্যক্তি" চিন্তা-ভাবনা গ্রহণযোগ্য কি না? যদি একবার شخص قانوني "আইনত এক ব্যক্তির" এধারণা গ্রহণযোগ্য করে নেয়া যায় এবং এ কথা মেনে নেয়া যায় যে, شخص قانوني "আইনত এক ব্যক্তির" ব্যক্তি বিশেষের মর্যাদায় হওয়া সত্ত্বেও তার নামে হওয়া চুক্তিসমূহের আইনগত কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তার সাথে ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করা হবে। তাহলে আমাদেরকে সীমাবদ্ধ দায়ের অর্থায়ন পদ্ধতিকে ও মেনে নিতে হবে যা পূর্বোক্ত পদ্ধতির একটি যৌক্তিক ফলাফল। তার কারণ সুস্পষ্ট, যদি প্রকৃত লোক অর্থাৎ কোন ব্যক্তি দেউলিয়া হয়ে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার ঋণদাতাগণ তার পরিত্যক্ত সম্পদ ব্যতীত অন্য কোন জিনিসের দাবী করতে পারবে না। যদি তার দায়-দায়িত্ব তার সম্পদ থেকে বেড়ে যায়, তাহলে এ কথা নিশ্চিত যে, ঋণদাতাদেরকে লোকসান বহন করতে হবে এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাদের জন্য (এ টাকা ফিরে পাওয়ার) আর কোন সুযোগ বিদ্যমান থাকে না।

আমরা যদি এখন এ কথা মেনে নেই যে, একটি কোম্পানী আইনত একজন ব্যক্তির ন্যায় তাহলে এ সুবাদে ঐসব দায়-দায়িত্ব এবং যিম্মাদারি রাখে যা একজন স্বভাবজাত ব্যক্তির উপর অর্পিত হয়ে থাকে, তাহলে দেউলিয়া কোম্পানীর উপরও এই উসূল প্রযোজ্য হবে। কোম্পানী যখন দেউলিয়া হয়ে যায় তখন তার সম্পদ তরল (Liquidation) আকৃতিতে রূপান্তরিত করা হয়। আর কোন কোম্পানীর তারল্য (তার সম্পদ বিক্রি করে নগদ আকৃতিতে রূপান্তরিত করা) এক ব্যক্তির মৃত্যুর ন্যায়। কেননা, তারল্যের পর কোম্পানী বেশিদিন বিদ্যমান থাকে না। যখন একজন প্রকৃত লোক দেউলিয়া হয়ে মৃত্যুবরণ করে তখন তার ঋণদাতাগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সুতরাং আইনত এক ব্যক্তির ঋণদাতাগণও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যখন তার তারল্যের দ্বারা তার আইনগত বছর পূর্ণ হয়ে যাবে।

সুতরাং মৌলিক প্রশ্ন এই যে, "আইনত এক ব্যক্তির" চিন্তা-পদ্ধতি শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য কি না?

"আইনত এক ব্যক্তি" যার অস্তিত্ব আধুনিক অর্থ- ব্যবস্থা এবং আইনগত পদ্ধতিতে পাওয়া যায়, এ প্রসংগে যদিও ইসলামী ফিক্হের গ্রন্থাবলীতে কোন আলোচনা করা হয়নি কিন্তু এমন কতগুলো দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে যেগুলো থেকে ইসতিম্বাত-করে "আইনত এক ব্যক্তির" চিন্তা পদ্ধতির হুকুম উদ্ঘাটন করা যেতে পারে।

(১) ওয়াক্ফ

প্রথম দৃষ্টান্ত হল ওয়াক্ফ সম্পর্কে। ওয়াক্ফ একটি ধর্মীয় এবং আইনগত প্রতিষ্ঠান। যে প্রতিষ্ঠানে কোন ব্যক্তি তার সম্পদের কিছু অংশ কোন ধর্মীয় কিংবা কোন কল্যাণমূলক উদ্দেশ্যের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়। সম্পদ যখন ওয়াক্ফ করে দেয় তখন থেকে ঐ সম্পদ ওয়াক্ফকারীর মালিকানায় আর বিদ্যমান থাকে না। যাদের জন্য সম্পদ ওয়াক্ফ করা হয়েছে, তারা সে সম্পদের ভোগ-ব্যবহার কিংবা আয়-ইন্কাম থেকে উপকৃত হতে পারে। কিন্তু তারা ঐ সম্পদের মালিক হয় না। ঐ সম্পদের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় যে, ফিক্‌হবিদগণ ওয়াক্‌ফের সাথে সাতন্ত্রিক আইনগত অস্তিত্ব লাভের আচরণ করেছে এবং তার দিকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পৃক্ত করেছে যা স্বভাবজাত ব্যক্তির হয়ে থাকে। এ কথাটি মুসলিম ফিক্‌হবিদদের ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে বর্ণিত দু'টি মাসআলা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

প্রথম মাসআলা, যদি ওয়াক্‌ফের আয় থেকে কোন সম্পদ ক্রয় করা হয়, তাহলে তা স্বয়ং ওয়াক্‌ফের অংশ হয়ে যাবে না। বরং ফিক্‌হবিদগণ বলেন যে, এ ক্রয়কৃত সম্পদ ওয়াক্‌ফের মালিকানাধীন মনে করা হবে।[১] এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, একজন প্রকৃত লোকের ন্যায় ওয়াক্‌ফও কোন সম্পদের মালিক হতে পারে।

দ্বিতীয় মাসআলা, ফিক্‌হবিদগণ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, যে অর্থ মসজিদকে দান হিসেবে প্রদান করা হয়, তা ওয়াক্‌ফের অংশ নয়, বরং তা মসজিদের মালিকানায় অন্তর্ভুক্ত হবে।[২]

এখানেও মসজিদকে অর্থের মালিক ধরা হয়েছে। এ উসূল কোন কোন মালেকী ফিক্‌হবিদও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। তারা বর্ণনা করেছেন যে, মসজিদ কোন জিনিসের মালিক হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। মসজিদের এ যোগ্যতা হল পরোক্ষভাবে (Constructive), পক্ষান্তরে একজন মানুষের যোগ্যতা হল প্রত্যক্ষভাবে (Physical)।[৩]

আরেকজন মালেকী ফকীহ আহমাদ দারদির মসজিদের নামে অসীয়ত করাকে সঠিক বলে সাব্যস্ত করেছেন। আর দলীল হিসেবে এ কথাই বলেছেন যে, মসজিদ সম্পদের মালিক হতে পারে, শুধুমাত্র এতটুকুই নয়, বরং তিনি এ উসূলকে বিস্তৃত করে মুসাফিরখানা এবং পুলের উপরও প্রযোজ্য করেছেন, তবে শর্ত হল তা ওয়াক্‌ফ হতে হবে।

---

১. আল-ফতওয়া আল হিন্দিয়া, কিতাবুল ওয়াক্‌ফ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা নং-৪১৭।

২. আল-ফতওয়া আল হিন্দিয়া, কিতাবুল ওয়াক্‌ফ, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা নং- ২৪০ ঃ এলাউস সুনান, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা নং- ১৯৮।

৩. الخرشي على الخليل দ্রষ্টব্য, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা নং-৮০।

এসব দৃষ্টান্ত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ফিক্‌হবিদগণ এ কথা সমর্থন করেছেন যে, ওয়াক্‌ফ সম্পদের মালিক হতে পারে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, ওয়াক্‌ফ কোন ব্যক্তি নয়, তদুপরি মালিক হওয়ার ব্যাপারে তার উপর মানুষের হুকুমই প্রয়োগ করা হয়েছে। যখন একবার তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাহলে তার যৌক্তিক ফলাফল এটা হবে যে, সে তা বিক্রি করতে পারবে, ক্রয় করতে পারবে, সে ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতাও হতে পারবে, বাদী এবং বিবাদীও হতে পারবে। এমনিভাবে আইনত এক ব্যক্তির সকল বৈশিষ্ট্য তার সাথে সম্পৃক্ত হবে।

(২) বাইতুল মাল

পূর্ববর্তী ফিক্‌হী গ্রন্থাবলীতে "আইনত এক ব্যক্তির" দ্বিতীয় যে উদাহরণটি পাওয়া যায় তাহল বাইতুল মাল। বাইতুল মাল যেহেতু জনগণের সম্পদ সেহেতু ইসলামী রাজ্যের প্রত্যেক ব্যক্তি কোন না কোনভাবে বাইতুল মাল থেকে উপকৃত হওয়ার অধিকার রাখে। কিন্তু কোন ব্যক্তি তার মালিক হওয়ার দাবী করতে পারবে না। তদুপরি বাইতুল মালেরও কিছু দায়িত্ব এবং যিম্মাদারী থাকে, প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ইমাম ছারাখছী (রহ.) "আল-মাবসূত" গ্রন্থে বলেন, "বাইতুল মালের উপর এমন যিম্মাদারী এবং তার জন্য এমন অধিকারও প্রমাণিত হতে পারে যা অজ্ঞাত।"[১]

অন্যত্র বলেন,"যদি ইসলামী রাজ্যের শাসনকর্তার সৈনিকদের বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়, কিন্তু বাইতুল মালের খাজনা-ট্যাক্সের ফান্ডে অর্থ না থাকে, তাহলে সে বেতন-ভাতা যাকাতের ফান্ড থেকে প্রদান করতে পারবে, কিন্তু যাকাতের ফান্ড থেকে গৃহীত অর্থ খাজনা-ট্যাক্সের ফান্ডের দায়িত্বে ঋণ হিসেবে গণ্য হবে।"[২]

---

১. সারাখসী, আলমাবসূত : খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ৩৩।
২. সারাখসী, আলমাবসূত : খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা নং-১৮।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শুধুমাত্র বাইতুল মালই নয় বরং বাইতুল মালের আভ্যন্তরীণ ফান্ডও একে অপর থেকে ঋণ গ্রহণ এবং প্রদান করতে পারে। এসব ঋণের দায়-দায়িত্ব রাজ্যের শাসনকর্তার উপর বর্তাবে না, বরং বাইতুল মালের সংশ্লিষ্ট ফান্ডের উপর বর্তাবে। এর অর্থ হল, বাইতুল মালের প্রত্যেক ফান্ড স্বতন্ত্রএবং অস্তিত্ব রাখে, এ হিসেবে বাইতুল মাল ঋণ হিসেবে অর্থ গ্রহণ এবং প্রদান করতে পারে। তার উপর ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতার বিধানও প্রয়োগ হবে। যেমনিভাবে "আইনত এক ব্যক্তি" বাদী এবং বিবাদী হতে পারে, তেমনিভাবে বাইতুল মালের এ ফান্ডও বাদী এবং বিবাদী হতে পারে। এর অর্থ হল, ইসলামী ফিক্হবিদগণ বাইতুল মাল সম্পর্কে "আইনত এক ব্যক্তির" পদ্ধতিকে গ্রহণ করে নিয়েছেন।

(৩) যৌথ অংশীদারিত্ব

জয়েন্ট স্টক কোম্পানীতে "আইনত এক ব্যক্তির" পদ্ধতির কাছাকাছি আরেকটি উদাহরণ ফিক্হে শাফে'য়ীতে পাওয়া যায়। ফিক্হে শাফে'য়ীর একটি নির্ধারিত উসূল অনুযায়ী যদি একাধিক ব্যক্তি মিলে তাদের যৌথ-ব্যবসা পরিচালনা করে, যে ব্যবসায় উভয়ের মালিকানাধীন সম্পদ মিশ্রিত হয়ে আছে। যাকাত তাদের যৌথ-সম্পদের উপর সামগ্রিক হিসেবে ওয়াজিব হবে, যদিও তাদের কেউ এককভাবে নেসাব পরিমাণ মালের মালিক নাও হয়। কিন্তু সামগ্রিক সম্পদের সমুদয় মূলধন যদি নেসাব থেকে অধিক হয়, তাহলেও যাকাত পূর্ণ যৌথ মালের উপর ওয়াজিব হবে, যে সম্পদে প্রথমোক্ত ব্যক্তির অংশও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ কারণে যে ব্যক্তির অংশ নেসাব থেকে কম সে সামগ্রিক সম্পদে তার মালিকানা অনুপাতে যাকাত পরিশোধে অংশীদার হবে, অথচ যদি প্রত্যেকের একক এবং ব্যক্তিগতভাবে যাকাতের হিসাব করা হত, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হত না।

এই উসূল যাকে خلطـــة الشيوع "যৌথ অংশীদারিত্ব" বলা হয়, পশুর যাকাতের উপর অধিক শক্তিশালী ভাবে প্রযোজ্য হয়। যার ফলে কখনো কখনো কোন ব্যক্তিকে তার চেয়ে বেশি যাকাত পরিশোধ করতে হয় যদি

তার থেকে এককভাবে যাকাত নেয়া হত এবং কখনো কখনো তার চেয়ে কম যাকাত ওয়াজিব হয়।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"لا يجمع بين مفترق ولايفرق بين مجتمع مخافة الصدقة"

"যাকাতের পরিমাণ হ্রাস করার জন্য পৃথক পৃথক সম্পদ একত্রিত করা যাবে না এবং যে সম্পদ একত্রিত আছে তা পৃথক করা যাবে না।"

যৌথ অংশীদারিত্বের এ উসূল ফিক্হে মালেকী এবং ফিক্হে হাম্বলীতেও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে কিছুটা ব্যবধানের সাথে সমর্থন করা হয়েছে। এ উসূলের গভীরে আইনত এক ব্যক্তির মৌলিক চিন্তা-ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে। এ উসূল হিসেবে যাকাত ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হয় না বরং যৌথ সম্পদের উপর ওয়াজিব হয়। এর অর্থ হল, "জয়েন্ট স্টক" কোম্পানীর সাথে ব্যক্তি বিশেষের আচরণ করা হয়েছে এবং যাকাতের দায়িত্ব সেই অস্তিত্বের দিকেই অর্পণ করা হয়েছে। এটা যদিও পুরোপুরিভাবে "আইনত এক ব্যক্তির" পদ্ধতি নয় কিন্তু অবশ্যই তার একেবারে কাছাকাছি।

(৪) ঋণে বেষ্টনকৃত মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ

চতুর্থ উদাহরণ ঐ সম্পদ যা এমন মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত, যে মৃতব্যক্তির দায়িত্ব তার পরিত্যক্ত সম্পদ অপেক্ষা বেশি। সংক্ষেপে আমরা তাকে "পরিত্যক্ত ঋণী" বলতে পারি।

ফিক্হবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী এ সম্পদ মৃতব্যক্তির মালিকানায়ও নয়। কেননা, সে এখন জীবিত নেই। উত্তরাধিকারীদের মালিকানায়ও নয়। কেননা, পরিত্যক্ত সম্পদে উত্তরাধিকারীগণ অপেক্ষা ঋণদাতাদের প্রাধান্য রয়েছে। তা ঋণদাতাদের মালিকানায়ও নয়। কেননা, এখন পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ করা হয়নি। উত্তরাধিকারীগণ এ পরিত্যক্ত সম্পদ দাবী করার অধিকার রাখে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কার্যত তা তাদের মাঝে বণ্টন না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মালিকানায় যাবে না। যেহেতু তা কারো মালিকানায় নয়, সেহেতু উক্ত সম্পদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে। তাকে

আইনত স্বতন্ত্র এক ব্যক্তিও বলা যেতে পারে। মৃতব্যক্তির উত্তরাধিকারগণ কিংবা তার নমিনী কার্যনির্বাহক হিসেবে উক্ত সম্পদের দেখাশুনা করবেন। কিন্তু তারা উক্ত সম্পদের মালিক হবে না। বণ্টন করে ঋণ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে যদি কিছু ব্যয়ও হয়, এ ব্যয়ও সেই পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে পূর্ণ করা হবে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখা হয়, তাহলে "ঋণে বেষ্টনকৃত মৃতব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ" স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রাখে। যে বিক্রিও করতে পারে, ক্রয়ও করতে পারে, ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতাও হতে পারে, এবং "আইনত এক ব্যক্তির" বৈশিষ্ট অধিকহারে এতেই পাওয়া যায়। শুধু এতটুকুই নয়, বরং ঐ "আইনত এক ব্যক্তির" দায়-দায়িত্ব তার বিদ্যমান সম্পদ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। যদি এ সম্পদ ঋণ পরিশোধে যথেষ্ট না হয়, তাহলে ঋণদাতাগণ অবশিষ্ট ঋণের জন্য উত্তরাধিকারগণসহ কারো থেকে দাবী করতে পারে না এবং তাদের জন্য (ঐ ঋণ ফিরে পাওয়ার) আর কোন ব্যবস্থাই থাকে না।

এ কয়েকটি উদাহরণ যে উদাহরণে ফকীহগণ আইনত এক ব্যক্তিত্বের কথা আলোচনা করেছেন যা "আইনত এক ব্যক্তির" সাদৃশ্য। এসব উদাহরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, "আইনত এক ব্যক্তির" চিন্তা-ভাবনা ইসলামী ফিক্‌হের জন্য সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়। যদি এসব দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে কোম্পানীর ক্ষেত্রে আইনত এক ব্যক্তি ধারনাকে মেনে নেয়া হয়, তাহলে আমার ধারণা হল এতে বড় ধরনের কোন আপত্তি উত্থাপিত হবে না।

যেরূপ পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, কোন কোম্পানীর সীমাবদ্ধ দায়ের প্রশ্ন "আইনত এক ব্যক্তির" ধারনার সাথে গভীর সম্পর্ক রাখে। যদি আইনত এক ব্যক্তির সাথে তার দায়-দায়িত্ব এবং অধিকারের ব্যাপারে প্রকৃত ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করা হয়, তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তি তার মালিকানাধীন সম্পদ পর্যন্তই দায়িত্বশীল হয়। যদি কোন ব্যক্তি দেউলিয়া হয়ে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার অবশিষ্ট দায়িত্বের বোঝা অন্য কোন ব্যক্তির উপর এমনকি আত্মীয়তার বন্ধনে যতই নিকটবর্তী হোক তার উপরও অর্পণ করা

যাবে না। তার সাথে সাদৃশ্যতার ভিত্তিতে কোম্পানীর সীমাবদ্ধ দায়কেও সঠিক বলা যেতে পারে।

গোলামের মালিকের সীমাবদ্ধ দায়

আমি এখানে আরেকটি উদাহরণ পেশ করতে চাই, যা জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর একেবারে কাছাকাছি উদাহরণ। এ উদাহরণের সম্পর্ক আমাদের অতীতকালের সে যুগের সাথে যে যুগে গোলামীর প্রচলন ছিল, গোলামদেরকে তাদের মনিবের মালিকানা মনে করা হত এবং গোলামের ব্যবসা স্বাধীনভাবে করা হত। যদিও আমাদের যুগে গোলামীর প্রতিষ্ঠান একটি অতীতকালের গল্প-কাহিনী। কিন্তু গোলামের ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মাসআলার উপর আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের ফকীহগণ যে আইনগত উসূল বর্ণনা করেছেন, তা এখনো ইসলামী ফিক্‌হের কোন তালেবে ইলমের জন্য উপকারী হতে পারে এবং আমরা আমাদের আধুনিক মাসআলার সমাধানের জন্য সেসব বিধি-বিধানকে ব্যবহার করতে পারি। এ হিসেবে মনে করা যায় যে, এ দৃষ্টান্ত বিবেচনাধীন প্রশ্নের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখে।

সে যুগে গোলাম দু'ধরনের হত। প্রথম প্রকারের গোলাম যাদেরকে তাদের মালিকের পক্ষ হতে কোন ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের অনুমতি দেয়া হত না। এ ধরনের গোলামকে قِن "ক্বিন" বলা হত। এছাড়া আরেক প্রকারের গোলাম ছিল যাদেরকে তাদের মালিকের পক্ষ হতে ব্যবসার অনুমতি প্রদান করা হত। এ ধরণের গোলামকে العبد المأذون "অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম" বলা হত। এ ধরনের গোলামকে প্রাথমিক পুঁজি তার মালিকের পক্ষ হতে সরবরাহ করা হত। কিন্তু এ গোলাম সর্বপ্রকার ব্যবসায়িক চুক্তি করার ব্যাপারে স্বাধীন থাকত। তার ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত পুঁজি সম্পূর্ণভাবে তার মালিকের হত। আয়ও তার মালিকেরই হত এবং গোলাম যা কিছু কামাই করত তার মালিক তার একক এবং বিশেষ সে সবের মালিক হতো। যদি ব্যবসা চলাকালীন এ গোলাম ঋণী হয়ে যেত, তাহলে তা সেই অর্থ এবং মালামাল দ্বারা পরিশোধ করা হত যা গোলামের নিকট বিদ্যমান থাকত।

যদি গোলামের নিকট বিদ্যমান নগদ অর্থ এবং দ্রব্য-পণ্য ঋণ পরিশোধে যথেষ্ট না হত, তাহলে ঋণদাতা উক্ত গোলামকে বিক্রি করে তার মূল্য দ্বারা স্বীয় পাওনা পূরণ করার অধিকার রাখত। কিন্তু যদি গোলাম বিক্রি করেও সে ঋণ পরিশোধ না হত এবং গোলাম ঋণী অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করত, তাহলে ঋণদাতা তার অবশিষ্ট পাওনার জন্য গোলামের মালিকের নিকট দাবী করতে পারত না।

এখানে মূলত সমগ্র ব্যবসার মালিক মনিব। গোলাম শুধুমাত্র ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পাদনের জন্য একজন মাধ্যমস্বরূপ। গোলাম ব্যবসার কোন জিনিসেরই মালিক নয়। তদুপরি মনিবের দায়িত্ব তার বিনিয়োগকৃত পুঁজি এবং গোলামের মূল্য পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। গোলামের মৃত্যুর পর ঋণদাতা মনিবের ব্যক্তিগত অন্যান্য সম্পদের উপর কোন দাবী করতে পারত না।

এগুলো ইসলামী ফিক্‌হে প্রাপ্ত কাছাকাছি উদাহরণ যা কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারদের সীমাবদ্ধ দায়ের খুবই সাদৃশ্য।

এ পাঁচটি দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, "আইনত এক ব্যক্তি" এবং সীমাবদ্ধ দায়ের চিন্তা-ভাবনা ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার পরিপন্থি নয়। কিন্তু এ কথাকে গুরুত্ব দিতে হবে যে, সীমাবদ্ধ দায়ের উক্তপদ্ধতি মানুষদেরকে ধোঁকা দেয়া এবং লাভজনক ব্যবসার ফলে সৃষ্ট স্বভাবগত দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার মাধ্যম যেন না হয়। সুতরাং এ পদ্ধতিকে পাবলিক কোম্পানী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে যারা তাদের শেয়ার সাধারণ মানুষদের জন্য চালু করে। পাবলিক কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারের সংখ্যা এত বেশি হয় যে, তাদেরকে ব্যবসার দৈনিক কর্মকাণ্ড এবং সম্পদ অপেক্ষা অধিক ঋণের দায়িত্বশীল করা যায় না।

যথাসম্ভব প্রাইভেট কোম্পানী এবং অংশীদারিত্বের (Partnerships) সাথে সীমাবদ্ধ দায়ের পদ্ধতির প্রয়োগ না হওয়া উচিত। কেননা, কার্যত শেয়ার হোল্ডার এবং অংশীদারী ব্যবসার দৈনিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সহজেই তথ্য সংগ্রহ করা যায় এবং সে ব্যবসার সকল দায়-দায়িত্ব তাদের উপরও অর্পিত হওয়া উচিত। তবে নিষ্ক্রিয় অংশীদার (Sleeping Partner) কিংবা

প্রাইভেট কোম্পানীর এমন শেয়ার হোল্ডারগণ এর ব্যতিক্রম যারা ব্যবসায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে না এবং অংশীদারদের মাঝে চুক্তি অনুযায়ী তাদের দায়-দায়িত্বকে সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে।

যদি চুক্তির মাঝে নিষ্ক্রিয় অংশীদারের (Sleeping Partner) দায়-দায়িত্ব সীমাবদ্ধ হয়, তাহলে ইসলামী ফিক্‌হ অনুযায়ী এর অর্থ হবে সে সক্রিয় অংশীদারদের (Working Partner) কে ব্যবসার সম্পদ অপেক্ষা অধিক ঋণ গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেনি। এ ক্ষেত্রে যদি ব্যবসার ঋণ একটি নির্দিষ্ট সীমার উর্ধ্বে চলে যায়, তাহলে এর দায়-দায়িত্ব সক্রিয় অংশীদারদের উপর বর্তাবে যারা এ সীমার উর্ধ্বে ঋণ করেছে।

উপরোল্লেখিত আলোচনার সারাংশ হল, শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে সীমাবদ্ধ দায়ের চিন্তা-ভাবনাকে পাবলিক জয়েন্ট স্টক কোম্পানী এবং এমন কর্পোরেট বডিজের জন্য সঠিক বলে সাব্যস্ত করা যেতে পারে যারা তাদের শেয়ার সাধারণ লোকদের জন্য চালু করে। এ চিন্তা-ভাবনাকে কোন ফার্মের নিষ্ক্রিয় অংশীদার (Sleeping Partner) এবং প্রাইভেট কোম্পানীর ঐসব অংশীদারদের উপর প্রয়োগ করা যেতে পারে যারা ব্যবসার ম্যানেজমেন্ট ও ব্যবস্থাপনায় কার্যত অংশগ্রহণ করে না। কিন্তু কোন অংশীদারী কারবারের সক্রিয় অংশীদার এবং প্রাইভেট কোম্পানীর কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণকারী অংশীদারদের দায়-দায়িত্ব সীমাবদ্ধ না হওয়া উচিত।

পরিশেষে আমরা পুনর্বার ঐ কথা উত্থাপন করছি যা প্রারম্ভেই বলেছি যে, সীমাবদ্ধ দায়ের মাসআলা যেহেতু একটি নতুন মাসআলা, যার শরয়ী সমাধানের জন্য যৌথ প্রচেষ্টা হওয়া আবশ্যক। এ কারণে উল্লেখিত আলোচনাকে এ বিষয়ের চূড়ান্ত ফায়সালা মনে না করা উচিত। এটা শুধুমাত্র প্রাথমিক গবেষণার ফলাফল, এ ব্যাপারে আরো অধিক আলোচনা এবং সত্যানুসন্ধানের সুযোগ রয়েছে।

ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম
(একটি বাস্তবসম্মত পর্যালোচনা)

ইসলামী ব্যাংকিং বর্তমান যুগে একটি অনস্বীকার্য বাস্তব সত্য হয়ে গিয়েছে। ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃহদায়তন পুঁজি নিয়ে নতুন নতুন ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। আধুনিক ব্যাংকও ইসলামিক শাখা (Islamic Windows) কিংবা অধীনস্থ ইসলামী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করছে। এমনকি অমুসলিম ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানও এ ময়দানে প্রবেশ করছে এবং অধিকহারে মুসলমানদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, আগত দশকে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার পরিধি কমপক্ষে দ্বিগুণ হয়ে যাবে এবং আশা করা যাচ্ছে যে, ইসলামী ব্যাংকসমূহের লেনদেন পৃথিবীর আর্থিক চুক্তির একটি বড় অংশকে পরিবেষ্টন করে নিবে। কিন্তু ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিধি বিস্তৃত করার পূর্বে নিজেদের বিগত দু'দশকের কার্যক্রম সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ করা উচিত। কেননা প্রত্যেক নিত্য নতুন পদ্ধতির জন্য অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা অর্জন করা উচিত এবং স্বীয় কর্মকাণ্ডের উপর পুনর্বার দৃষ্টিপাত এবং নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতির বাস্তব-সম্মতভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। যে সময় পর্যন্ত আমরা আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং ভালো-মন্দের পর্যালোচনা না করব, সে সময় পর্যন্ত আমরা পূর্ণ সফলতার দিকে অগ্রসর হওয়ার আশা করতে পারি না। এ পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী শরীয়তের আলোকে ইসলামী ব্যাংক এবং ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমাদের পর্যালোচনা করা উচিত এবং এ কথা সুস্পষ্ট করা যে, তারা কি পেয়েছে এবং কি হারিয়েছে।

একবার মালয়েশিয়ায় একটি প্রেস-কনফারেন্স চলাকালীন সময় বক্ষমাণ গ্রন্থের লেখকের নিকট ইসলামী অর্থব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমার উত্তর ছিল বিপরীতমুখী। আমি বলেছিলাম, ইসলামী অর্থব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অনেক বড় ভূমিকা আছেও আবার নেইও। এ অধ্যায়ে সেই উত্তরের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রে তাদের অগ্রণী ভূমিকা রাখার অর্থ হচ্ছে, ইসলামী ব্যাংকের এটা দীপ্তমান সাফল্য যে, তারা এমন আর্থিক প্রতিষ্ঠান গঠন করে শরীয়তের অনুসরণের জন্য একটি বিরাট পথ সুগম করে দিয়েছে। সুদবিহীন অর্থ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হওয়া মুসলমানদের একটি সুন্দর স্বপ্ন ছিল। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকিং শুধুমাত্র একটি কাল্পনিক বিষয় ছিল, যে বিষয়ে রচনা-প্রবন্ধের মাধ্যমে গবেষণা করা হত এবং তার কোন বাস্তবরূপ বিদ্যমান ছিল না। এসব ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানই এ স্বপ্ন এবং কাল্পনিক বিষয়কে বাস্তবায়ন করে জীবন্ত এবং বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তারা এ কাজ এমন এক পরিবেশে করেছে, যে পরিবেশে এ দাবী করা হত যে, কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানই সুদবিহীন চলা সম্ভব নয়।

মূলত এটা ইসলামী ব্যাংকের অত্যন্ত দুঃসাহসী পদক্ষেপ ছিল যে, তারা এ দৃঢ়সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হয়েছে যে, তাদের যাবতীয় চুক্তি ইসলামী শরীয়তসম্মত হবে এবং তাদের সকল কর্মকাণ্ড সুদের সাথে জড়িত হওয়া থেকে পবিত্র থাকবে।

ঐসব ইসলামী ব্যাংকের একটি বড় ভূমিকা এই যে, যেহেতু এ ব্যাংক শরীয়াহ সুপারভাইজারী বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত সেহেতু তারা শরীয়তের বিজ্ঞজনদের সামনে আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেছে, যার ফলে তারা শুধুমাত্র বর্তমান ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কায়-কারবার উপলব্ধিরই সুযোগ পাননি বরং শরীয়তের আলোকে সেগুলো পর্যালোচনা করত শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য তার বিকল্প পদ্ধতি ও পেশ করার সুযোগ পেয়েছে।

এ কথা অবশ্যই বুঝা উচিত যে, আমরা যখন বলি ইসলাম সর্বকালের সর্বাবস্থায় প্রত্যেক সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান পেশ করতে সক্ষম। তার অর্থ এটা নয় যে, কুরআন-হাদীস এবং মুসলিম আলিমদের ইসতিম্বাতকৃত বিধি-বিধানে আমাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের যাবতীয় বিষয়াদি বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। বরং উদ্দেশ্য হল, কুরআন এবং হাদীস বিস্তৃত এবং ব্যাপক মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেগুলোর আলোকে প্রত্যেক যুগের আলিমগণ তাদের যুগের নিত্য-নতুন সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে পারে। শরীয়তের আলোকে এ নিত্য-নতুন সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার জন্য শরীয়ত বিজ্ঞজনদের বিরাট ভূমিকা পালন করতে হয়। তাদেরকে প্রতিটি সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে নির্ধারিত উসূল এবং ইসলামী ফিক্‌হের গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত বিধি-বিধানের আলোকে গবেষণা করতে হয়। এ কাজকে "ইস্‌তিম্বাত" এবং "ইজতিহাদ" বলা হয়। ইজতিহাদ এবং ইস্‌তিম্বাতের এ সুযোগ ইসলামী ফিক্‌হকে ইল্‌ম এবং হিকমতের এমন রত্ন-ভাণ্ডার দিয়েছে, অন্য কোন ধর্ম যার সমকক্ষ পরিলক্ষিত হয় না। এমন একটি সমাজ যে সমাজে শরীয়তের বিধি-বিধান পুরোপুরিভাবে পালিত হচ্ছে, সেখানে ইজতিহাদ এবং ইসতিম্বাতের ধারাবাহিক কর্মকাণ্ড ইসলামী ফিকহী উত্তরাধিকারে নতুন বিধি-বিধান এবং চিন্তা-ভাবনা সংযোজন করতে থাকে। যার ফলে প্রায় সকল সমস্যার সুস্পষ্ট সমাধান ইসলামী ফিক্‌হের গ্রন্থাবলীতে অনুসন্ধান করা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু বিগত কয়েক শতাব্দীতে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধঃপতন তাদেরকে এ কর্মকাণ্ড থেকে যথেষ্টভাবে বিরত রেখেছে। অনেক ইসলামী দেশ সরাসরি অমুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনস্থ ছিল, যারা শক্তি বলে ইসলাম বিরোধী শাসন পদ্ধতি চালু করেছে এবং মুসলমানদেরকে আর্থ-সামাজিক জীবনে শর্‌য়ী হিদায়াত থেকে বঞ্চিত রেখেছে। ইসলামী বিধি-বিধান, ইবাদাত, ধর্মীয় শিক্ষা এবং কোন কোন দেশে বিবাহ-শাদী এমনকি তালাক ও উত্তরাধিকারের বিষয়সমূহও সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদি থেকে শর্‌য়ী শাসনকে একেবারে দৃষ্টির আড়ালে রাখা হয়েছিল।

যেমনিভাবে যে কোন আইনগত ব্যবস্থার উত্থান ও উন্নত হওয়া তা কার্যকর এবং প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল, তেমনিভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে ইসলামী আইন-কানুনের উত্থানকেও সেই অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বাজারে যত রকমের ব্যবসায়িক চুক্তি সেকুলারিজম চিন্তা-ভাবনার ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে, সেগুলোকে শরীয়তের আলোকে পর্যালোচনা করার জন্য খুব কমই শরীয়ত বিজ্ঞজনদের সামনে পেশ করা হয়েছে। এ কথা সত্য যে, এ সময়ও কোন কোন আমলী মুসলমান কোন কোন আমলী প্রশ্নসমূহ শরীয়তের আলিমদের নিকট পেশ করেছে, যেগুলোর সমাধান আলিমগণ ফত্ওয়ার আকৃতিতে বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর একটি পূর্ণ সংক্ষিপ্তসার এখনও পাওয়া যায়। কিন্তু এসব ফত্ওয়ার সম্পর্ক সাধারণত ব্যক্তিগত মাসআলার সাথে ছিল এবং সেগুলো দ্বারা সেসব লোকদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনই পূর্ণ হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংকসমূহের সবচেয়ে বড় খিদমত হল, তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃত ময়দানে আসার কারণে ইসলামী আইন ব্যবস্থা উত্থানের প্রচেষ্টা পুনর্বার চালু হয়েছে। অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক শরীয়াহ সুপারভাইজরি বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। এসব ব্যাংক তাদের দৈনিক উদ্ভূত সমস্যাবলী শরীয়ত বিজ্ঞজনদের সামনে পেশ করে, যারা ইসলামী উসূল এবং বিধি-বিধানের আলোকে তাদের সম্পর্কে বিশেষ আহকাম চালু করে। এ পদ্ধতি দ্বারা শুধু এতটুকুই নয় যে, শরীয়ত বিজ্ঞজন নিত্য-নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করে বরং এসব আলিমগণের ইসতিম্বাতের মাধ্যমে ইসলামী ফিক্হেরও উত্থান হয়। সুতরাং কোন কাজকে যদি শরীয়ত বিজ্ঞজন অনৈসলামিক বলে সাব্যস্ত করে, তাহলে শরীয়তের আলিমগণ এবং ইসলামী ব্যাংকসমূহের ব্যবস্থাপকদের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেগুলোর উপযুক্ত বিকল্প পন্থাও অনুসন্ধান করা হয়। উত্থাপিত সমস্যা সমূহের সমাধান কল্পে শরীয়াহ বোর্ডের গৃহিত প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ দ্বারা এ যাবত দশ খণ্ডের কিতাব প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। ইসলামাইজড করণে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অর্থ ব্যবস্থাকে এটা একটি বড় ভূমিকা যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এসব ইসলামী ব্যাংকসমূহের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হল, তারা নিজেদেরকে আন্তর্জাতিক মার্কেটে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে এবং ইসলামী ব্যাংকিং আধুনিক ব্যাংকিং পদ্ধতি থেকে পৃথক হওয়ার কারণে সারা পৃথিবীতে ধীরে ধীরে পরিচিতি লাভ করছে। এ যাবত আমার উক্তি "অর্থ-ব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিরাট ভূমিকা" সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

অপরদিকে এসব ব্যাংকের কার্যক্রমে বেশ-কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতিও রয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে মার্জিত ভাষায় শালীনতার সাথে পর্যালোচনা হওয়া উচিত।

সর্বপ্রথম কথা হল, ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি একটি অর্থনৈতিক দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত যা শরীয়তের উসূল এবং বিধি-বিধানের গভীরে নিহিত রয়েছে। সুদবিহীন ব্যাংকিং-এর দৃষ্টিতে এ দর্শনের লক্ষ্য হচ্ছে সম্পদ বণ্টনে সর্বপ্রকারের শোষণমুক্ত ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। যেরূপ আমি আমার বিভিন্ন রচনা-প্রবন্ধে বর্ণনা করেছি যে, সুদি লেনদেনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থি ধনীক শ্রেনীর পৃষ্ঠপোষকতা করা। আমীর শিল্পপতিগণ ব্যাংকসমূহ থেকে বিরাট অংকের অর্থ ঋণ গ্রহণ করে সাধারণ আমানতকারীগণের অর্থকে অধিক লাভজনক প্রজেক্টে বিনিয়োগ করে। প্রচুর মুনাফা অর্জনের পর তারা সাধারণ আমানতকারীগণকে ন্যূনতম হারে সুদ প্রদান ব্যতীত স্বীয় মুনাফায় অংশীদার হতে দেয় না। এবং এ ন্যূনতম পরিমাণ সুদও স্বীয় উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যয়ে অন্তর্ভুক্ত করে (সেগুলোর ততটুকু পরিমাণ মূল্য বৃদ্ধি করে) ক্রেতা (জেন সাধারণ) থেকে নিয়ে নেয়। এ কারণে যদি সামষ্টিক দৃষ্টি কোন থেকে (Macro Level) দেখা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, এসব সাধারণ আমানতকারীগণকে তারা কিছুই প্রদান করে না। পক্ষান্তরে যদি প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি হয়ে যায়, যার কারণে তারা দেউলিয়া হয়ে যায় এবং এর ফলে ব্যাংকও দেউলিয়া হয়ে যায়, তাহলে সমুদয় ক্ষতি সাধারণ আমানতকারীগণকে বহন করতে হয়। এ পদ্ধতিতে সম্পদ বণ্টনে সুদ বে-ইন্‌সাফী এবং অসামঞ্জস্যতা সৃষ্টি করে।

ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি এর থেকে ভিন্নরূপ। শরীয়তের আলোকে (Financing) অর্থায়নের আদর্শিক পদ্ধতি হল মুশারাকা। যে পদ্ধতিতে লাভ-লোকসান উভয়ে দু'পক্ষ আনুপাতিক হারে অংশীদার হয়। মুশারাকা সাধারণ আমানতকারীগণকে ব্যবসা থেকে অর্জিত প্রকৃত মুনাফায় অংশীদার হওয়ার সর্বোত্তম সুযোগ করে দেয়। আর এ মুনাফা সাধারণ অবস্থায় সুদের হার অপেক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে বেশি হতে পারে। যেহেতু ততক্ষণ পর্যন্ত মুনাফা নির্ধারণ করা যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট দ্রব্য পরিপূর্ণরূপে বিক্রি না করা হবে। এ কারণে সাধারণ আমানতকারীগণকে (Depositors) পরিশোধকৃত মুনাফার অর্থ উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যে অন্ত র্ভুক্ত করা যায় না। যার ফলে সুদি ব্যবস্থাপনার বিপরীত সাধারণ আমানতকারীগণকে পরিশোধকৃত মুনাফা দ্রব্যের মূল্যে সংযোজন করে ফেরৎ নেয়া যায় না।

ইসলামী ব্যাংকিং-এর এ দর্শনকে কার্যতভাবে ততক্ষণ পর্যন্ত রূপ দেয়া যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক মুশারাকা ব্যবহারের পরিধিকে বিস্ত ৃত না করবে। এ কথা সত্য যে, মুশারাকা ব্যবহারে কিছু কার্যত জটিলতা রয়েছে। বিশেষত বর্তমান পরিবেশে যে পরিবেশে ইসলামী ব্যাংক একাকিভাবে এবং সাধারণত সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সহযোগিতা ব্যতীত কাজ করছে, কিন্তু তদুপরিও এ বাস্তবতা নিজ স্থানে রয়েছে যে, ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্রমান্বয়ে মুশারাকার দিকে অগ্রসর হওয়া এবং তাদের জন্য মুশারাকায় অর্থায়নের পরিধিকে বৃদ্ধি করা উচিত। দুর্ভাগ্যবশত ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইসলামী ব্যাংকিং-এর এ মৌলিক চাহিদাকে দৃষ্টির আড়াল করে রেখেছে এবং মুশারাকার ব্যবহারের দিকে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোন প্রচেষ্টা বিদ্যমান নেই। এমনকি ক্রমান্বয়ে এ পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হওয়া এবং নির্বাচিত নীতিমালার ভীত্তিতে ও এ প্রচেষ্টা নেই। এ অবস্থার ফলাফল কয়েকটি অসংগতিপূর্ণ উপাদানের আকৃতিতে প্রকাশ হয়েছে।

প্রথম কথা, ইসলামী ব্যাংকিং-এর মৌলিক দর্শন দৃষ্টির আড়ালে রেখে তা এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে।

দ্বিতীয় কথা হল মুশারাকা পদ্ধতি ব্যবহার না করে এড়িয়ে যাওয়ার কারণে ইসলামী ব্যাংক মুরাবাহা এবং ইজারা ব্যবহারের উপর বাধ্য হয়ে যাচ্ছে এবং এ ব্যবহারও আধুনিক মানদণ্ড যেমন LIBOR ইত্যাদির স্ট্রাকচার অনুযায়ী হচ্ছে। যার কারণে ইসলামী ব্যাংকের লেন-দেন চূড়ান্ত পর্যায়ে বস্তুগতভাবে সুদি লেনদেন থেকে বৈসাদৃশ্য হয় না। আমি সেসব লোকদের পক্ষপাতিত্ব করি না, যারা প্রচলিত সুদী ব্যাংকের লেনদেন এবং মুরাবাহা ও ইজারার পদ্ধতিতে কোন পার্থক্য অনুভব করে না, কিংবা যারা মুরাবাহা এবং ইজারা সম্পর্কে সে ব্যবসা-ই বিভিন্ন নামে চালু রাখার অভিযোগ করে। কেননা মুরাবাহা এবং ইজারাকে যদি জরুরী শর্তসাপেক্ষে ব্যবহার করা হয়, তাহলে এতে পার্থক্যের অনেক দিক বিদ্যমান আছে যা তাকে সুদি লেনদেন থেকে পৃথক করে দেয়। কিন্তু এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, এ দু'টি পন্থা মূলত শরীয়তে অর্থায়ন পদ্ধতি নয়। শরীয়তের আলিমগণ সেগুলোকে অর্থায়নের জন্য শুধুমাত্র ঐ ক্ষেত্রে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন, যেখানে মুশারাকা কার্যকর সম্ভব নয়, এবং এ অনুমতিও বিশেষ শর্তসাপেক্ষে দিয়েছেন। এ অনুমতিকে সর্বকালীন নিয়ম-নীতি হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়। আর এমন না হওয়া উচিত যে, ব্যাংকের সকল লেনদেন-কার্যক্রম মুরাবাহা এবং ইজারার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

তৃতীয় কথা হল যখন জনসাধারণ এ প্রকৃত তথ্য জানতে পারবে যে, ইসলামী ব্যাংকসমূহে সংঘটিত লেনদেন দ্বারা লব্ধ আয় প্রচলিত সুদী ব্যাংকসমূহের মতই, তাহলে তারা ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয়ের শিকার হবে।

চতুর্থ কথা হল যদি ইসলামী ব্যাংকসমূহের সকল লেনদেন-কার্যক্রম উল্লেখিত পন্থাসমূহের (মুরাবাহা, ইজারার) উপর নির্ভরশীল হয়, তাহলে জনসাধারণের সামনে সেসব ব্যাংকের ব্যাপারে যুক্তি পেশ করা জটিল হয়ে যাবে। বিশেষ করে অমুসলিমদের সামনে যারা এ কথা অনুভব করবে যে, এসব কাগজপত্রের তোড়-জোড় ব্যতীত কিছুই নয়।

অনেক ইসলামী ব্যাংকে এ কথা অনুভূত হয়েছে যে, সেখানে মুরাবাহা এবং ইজারাকেও সেগুলোর শরীয়তের কাংক্ষিত পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যবহার করা হয় না। মুরাবাহার মৌলিক পদ্ধতি এই যে, কোন জিনিস ক্রয় করে তাকে গ্রাহকের নিকট বাকিতে পরিশোধের ভিত্তিতে বিশেষ মুনাফার অনুপাতে বিক্রি করা। **(শরীয়তের দৃষ্টিতে অপরিহার্য হল, উক্ত জিনিস বিক্রির পূর্বে ব্যাংকে মালিকানা এবং কমপক্ষে ব্যাংকের পরোক্ষ কব্জায় আসতে হবে। যতটুকু সময় সে জিনিস ব্যাংকের কব্জা এবং মালিকানায় থাকবে ততটুকু সময় তা ব্যাংকের ঝুঁকিতে (Risk) থাকবে।)** এটা অনুভূত হয়েছে যে, অনেক ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঐ লেনদেন-কার্যক্রম সম্পর্কে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি করে।

কোন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ ধারণা পোষণ করে রেখেছে যে, মুরাবাহা সকল বাস্তবিক উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সুদের স্থলবর্তী। এ কারণেই তারা কোন কোন সময় এমন ক্ষেত্রেও মুরাবাহা চুক্তি করে নেয়, যখন গ্রাহকের (Overhead Expenses) দৈনন্দিন উপরি ব্যয়ের জন্য ফান্ডের প্রয়োজন হয়। যেমন, বেতন-ভাতা পরিশোধ, এমন জিনিস এবং সেবার বিল পরিশোধ যা পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে। স্পষ্টত যে, এ ক্ষেত্রে কোন মুরাবাহা হতে পারে না। কেননা, ব্যাংক কোন জিনিস ক্রয়-ই করছে না।

কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রাহক কোন ব্যাংকের সাথে চুক্তির পূর্বে দ্রব্য ক্রয় করে অর্থাৎ, পণ্য সরবরাহকারীর নিকট ক্রয়ের অর্ডার প্রদান করে (Buy Back) এবং এই প্রক্রিয়াকে মুরাবাহ হিসেবে বিবেচনা করে, যা কিনা আদৌ মুরাবাহ নয় বরং ইসলামী নীতিমালার পরিপন্থি। কেননা, বাইব্যাককে সর্বসম্মতিক্রমে শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

কোন কোন ক্ষেত্রে স্বয়ং গ্রাহককেই ব্যাংকের পক্ষ হতে এ হিসেবে উকিল নিয়োগ করা হয় যে, সে সংশ্লিষ্ট জিনিস ক্রয় করবে এবং তা গ্রহণের পর নিজেই নিজের কাছে বিক্রি করবে। এ পদ্ধতি মুরাবাহা বৈধতার মৌলিক শর্তানুযায়ী নয়। যদি গ্রাহককেই দ্রব্য ক্রয়ের ব্যাপারে উকিল বানাতে হয়, তাহলে তার উকিল এবং ক্রেতা হওয়ার দিক পৃথক

পৃথক হওয়া অপরিহার্য। যার অর্থ হল, গ্রাহক সে দ্রব্য ব্যাংকের পক্ষ হতে ক্রয়ের পর ব্যাংককে এ কথা অবগত করা অপরিহার্য যে, সে তার পক্ষ হতে উক্ত দ্রব্য ক্রয় করে নিয়েছে। অতঃপর ব্যাংক নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইজাব-কবুলের (প্রস্তাব-গ্রহণের) মাধ্যমে সে দ্রব্য গ্রাহকের নিকট বিক্রি করবে। তবে ইজাব-কবুল ফ্যাক্স কিংবা টেলেক্স ইত্যাদির মাধ্যমেও হতে পারে ।

যেরূপ পূর্বে বিবৃত হয়েছে যে, মুরাবাহা ক্রয়-বিক্রয়ের একটি প্রকার, আর শরীয়তের এটা নির্ধারিত উসূল যে, মূল্য ক্রয়-বিক্রয়ের সময় নির্ধারিত হতে হবে। সুতরাং উভয়পক্ষ যখন মূল্য নির্ধারিত করে নিবে, তাহলে পরবর্তীতে এককভাবে তাতে আর কমবেশি করা যাবে না। এটাও পরিলক্ষিত হয়েছে যে, কোন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান মূল্য পরিশোধে বিলম্বের কারণে মুরাবাহার মূল্যে সংযোজন করে নেয় যা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয। কোন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান অনাদায়ের ক্ষেত্রে মুরাবাহার মধ্যে রোল-অভার (Roll-Over) করে নেয়। স্পষ্টত যে, এ কাজও শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। কেননা, যখন একটি জিনিস একবার একজন গ্রাহকের নিকট বিক্রি করা হয়েছে, তাহলে সেই গ্রাহকের নিকট উক্ত দ্রব্য পুনর্বার বিক্রি করা যায় না।

ইজারার লেনদেনেও শরীয়তের কোন কোন চাহিদাকে সাধারণত দৃষ্টির আড়াল করে রাখা হয়। ইজারা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি শর্ত হল, ইজারাদাতা (Lessor) ইজারায় প্রদানকৃত সম্পদের মালিকানার সাথে সম্পৃক্তের কারণে ঝুঁকি বহণ করবে এবং সে ইজারাগ্রহীতাকে (Lessee) উক্ত দ্রব্য ভোগ-ব্যবহারের অধিকার প্রদান করবে যার বিনিময়ে সে ভাড়া (Rent) আদায় করবে। এটা পরিলক্ষিত হয়েছে যে, ইজারার অনেক চুক্তিতে এসব নিয়ম-নীতির বিরোধিতা করা ও পরিপন্থি কাজ করা হয়। এমনকি ইজারায় প্রদানকৃত সম্পদ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ইজারাগ্রহীতা থেকে ভাড়া পরিশোধের দাবী করা হচ্ছে। যার অর্থ হল, ইজারাদাতা মালিকানার ঝুঁকিও (Risk) বহন করছে না এবং

ইজারাগ্রহীতাকে ভোগ-ব্যবহারের অধিকারও ব্যবস্থা করে দিচ্ছে না। এ ধরনের ইজারা শরীয়তের মৌলিক নীতিমালার পরিপন্থি।

ইসলামী ব্যাংকিং ঐসব নিয়ম-নীতির উপর নির্ভরশীল, যা আধুনিক ব্যাংকিং পদ্ধতির নিয়ম-নীতি থেকে ভিন্ন ধরনের। সুতরাং যুক্তিসংগত কথা হল মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে উভয়ের পরিণামও আবশ্যকীয়ভাবে এক ধরনের হবে না। হতে পারে যে, কোন কোন অবস্থায় ইসলামী ব্যাংক বেশি অর্জন করবে এবং এটাও হতে পারে যে, কোন কোন সময় স্বল্প পরিমাণ অর্জন করবে। যদি আমাদের লক্ষ্য এটা হয় যে, আমরা মুনাফার ব্যাপারে আধুনিক ব্যাংকসমূহের সাথে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করব, তাহলে আমাদের জন্য ইসলামী উসূলের উপর নির্ভরশীল পদ্ধতি সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা জটিল হবে। যে যাবৎ ইসলামী ব্যাংকসমূহে বিনিয়োগকারী, তাদের ব্যবস্থাপক এবং গ্রাহকগণ এ বাস্তবতাকে গ্রহণ না করবে এবং বিভিন্ন পরিণতিকে (যেগুলো অপছন্দ হওয়া জরুরী নয়) গ্রহণ না করবে, সে যাবৎ এসব ইসলামী ব্যাংক বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করতে থাকবে এবং সঠিক ইসলামী পদ্ধতি অস্তিত্ব লাভ করবে না।

ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবসায়িক লেনদেনকে সমাজের চারিত্রিক উদ্দেশ্য থেকে পৃথক করা যাবে না। এ কারণে ইসলামী ব্যাংকসমূহ থেকে এ প্রত্যাশা করা যাচ্ছিল যে, তারা নতুন আর্থিক পলিসী গ্রহণ করবে এবং বিনিয়োগের নতুন মাধ্যম উদ্ভাবন করবে যার দ্বারা উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান এবং ছোট-খাট ব্যবসায়ীদেরকে তাদের জীবনোপায় উন্নত করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এ দিকে অনেক কম ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান-ই নজর দিচ্ছে। আধুনিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিপরীত যাদের উদ্দেশ্যই শুধুমাত্র বেশির চেয়ে বেশি মুনাফা অর্জন করা, ইসলামী ব্যাংকসমূহের উচিত, তারা যেন সমাজের প্রয়োজনসমূহ পূরণ করাকেও তাদের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং ঐসব পদ্ধতিকে প্রাধান্য দেয় যা সাধারণ লোকদের জীবনোপায় উন্নত করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। তাদের উচিত তারা যেন হাউজ ফিন্যান্সিং, গাড়ির অর্থায়ন এবং ভূমি অর্থায়নের নিত্য-

নতুন পদ্ধতি ছোট-খাট ব্যবসায়ীদের জন্য উদ্ভাবন করে। এ ময়দান এখনো ইসলামী ব্যাংকসমূহের দৃষ্টি নিবদ্ধের অপেক্ষায় আছে।

ইসলামী ব্যংকিং-এর মিশনকে ততক্ষণ পর্যন্ত অগ্রসর করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাকংসমূহের পারস্পরিক লেনদেন পদ্ধতি ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী গঠন করা না হবে। এ ধরনের কোন পদ্ধতি না পাওয়া যাওয়ার কারণে ইসলামী ব্যাংক তাদের স্বল্প সময়ের তারল্যের (Liquidity) প্রয়োজন পূরণার্থে প্রচলিত সুদী ব্যাংকসমূহের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয় এবং প্রচলিত সুদী ব্যাংকসমূহ এ ধরনের সুযোগ প্রকাশ্য কিংবা গোপনী সুদবিহীন প্রদান করে না। ইসলামী নীতি-আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন এখন কিছুতেই জটিল মনে হয় না। কেননা, ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় দু'শর কাছাকাছি। এসব ব্যাংক মুরাবাহা এবং ইজারার সমন্বয়ে একটি ফান্ড গঠন করতে পারে, যার ইউনিটসমূহ তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় চুক্তির জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। যদি এসব ব্যাংক এ ধরনের ফান্ড গঠন করে নেয়, তাহলে এর দ্বারা অনেক বিষয় ও সমস্যার সমাধান হতে পারে।

আখেরী কথা হল, ইসলামী ব্যাংকসমূহকে তাদের একটি পৃথক কালচার গঠন করা উচিত। স্পষ্টত যে, ইসলাম ব্যাংকিং চুক্তি পর্যন্ত-ই সীমাবদ্ধ নয়। বরং ইসলাম উসূল এবং বিধি-বিধানের এমন একটি সংক্ষিপ্তসার যা মানুষের পূর্ণ জীবনকে পরিবেষ্টন করে নিয়েছে। এ কারণে "ইসলামী" হওয়ার জন্য শুধুমাত্র ইসলামী উসূলের উপর প্রতিষ্ঠিত চুক্তিসমূহ ডিজাইন করে নেয়া-ই যথেষ্ট নয়। বরং এটাও অপরিহার্য যে, প্রতিষ্ঠানের সার্বিক রীতি-নীতি এবং তার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের থেকে ইসলামী স্বকীয়তার নিদর্শন প্রকাশিত হতে হবে, যার ফলে তারা প্রচলিত প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বিশিষ্ট এবং বিখ্যাত হিসেবে দৃষ্টিগোচর হবেন। এর জন্য প্রতিষ্ঠান এবং তার ব্যবস্থাপকদের সার্বিক কার্যক্রমে পরিবর্তন অপরিহার্য।

ইবাদাত- সংক্রান্ত ইসলামী ফারায়েয এবং চারিত্রিক রীতি-নীতি এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের পরিবেশে প্রকাশিত হতে হবে যা নিজেকেই ইসলামী

বলে। এটা এমন একটি ময়দান, যে ময়দানে মধ্যপ্রাচ্যের কোন কোন ইসলামী প্রতিষ্ঠান অগ্রসর হয়েছে, অথচ উচিত ছিল সারা পৃথিবীর ইসলামী ব্যাংকসমূহ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে এই বৈশিষ্ঠ ও গুণে গুণান্বিত হওয়া উচিত। এ ব্যাপারেও শরীয়াহ বোর্ডের দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতে হবে।

যেরূপ পূর্বে সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এ আলোচনার উদ্দেশ্য ইসলামী ব্যাংকসমূহকে নিরুৎসাহী করা কিংবা তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি অনুসন্ধান করা নয়, বরং উদ্দেশ্য শুধুমাত্র তাদেরকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা যে, তারা যেন তাদের কার্যক্রমকে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করে এবং নিজেদের কর্মপদ্ধতির গঠন ও পলিসী নির্ধারণে বাস্তবসম্মত চিন্তা ভাবনা ও বিবেচনা করে।

সমাপ্ত